দুর্বার ভাবনা

বর্ষ : ৩ সংখ্যা : ৫-৬ ☐ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১১

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় শ্রমিক আন্দোলন কি কারখানা বন্ধের কারণ?... ১

বিশেষ নিবন্ধ :

আলোর উৎসেই অন্ধকার... অহল্যা বসুগুপ্ত...৫

স্মরণ : শ্যামলিদি আর নেই... তরুণ বসু...৬

অপুষ্টি, যক্ষ্মা এবং সামাজিক বৈষম্য... বিনায়ক সেন...৭

দরিদ্র মানুষের রোগ ও তার চিকিৎসা: একটি সমীক্ষা...অরণি চট্টোপাধ্যায়...১১

হয়ে ওঠার উপাখ্যান : বেলুড় শ্রমজীবী... তরুণ বসু... ১৪

পরবাসের চিঠি : শ্রমিক দিবসের অন্য ইতিবৃত্ত... সীমন্তী দাশগুপ্ত...১৬

অধিকার আন্দোলন

কেন শ্রমিকের অধিকার?... ভারতী দে... ১৭

খাদ্যের অধিকার...১৯

বিশেষ নিবন্ধ

ফসলরক্ষক মা দুর্গার বাপের বাড়ি ... চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য...২১

সংগ্রহ : গান্ধর্বী-গাথা...দেবজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ...২৪

বিশেষ নিবন্ধ

স্মৃতির সরণী বেয়ে : মেদিনীপুর শহরের সেকাল একাল... বিপ্লব মাজী... ২৫

সুরুলিয়ায় নাচনির পরিসর...সুধাংশু চক্রবর্তী...৩৩

মৃত্যুদণ্ড : একটি সরকারি হত্যা ...কিরীটি রায়...৩৭

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংস্কার এবং প্রেসিডেন্সি... ব্রতীন চট্টোপাধ্যায় ...৩৯

ভারতের সবচেয়ে বেশি বিদ্যালয়-ছুট পশ্চিমবঙ্গে...গৌতম ঘোষ...৪১

সৃজনশীলতায় চেতনাতীতের ভূমিকা... অজয় চক্রবর্তী ...৪৫

প্রফুল্লচন্দ্র ও পরিবেশ...রবীন চক্রবর্তী... ৪৭

পুনরমুদ্রণ : জ্ঞানোন্নতি ও ভারতের অধঃপতন ...প্রফুল্লচন্দ্র রায়...৪৯

বিশেষ নিবন্ধ

ফুকুশিমা ইতিহাসে সবচেয়ে বড় শিল্প বিপর্যয়..৬ প্রদীপ দত্ত ৫১

ধারাবাহিক রচনা :

পর্ব ৮ : বিশ্বমূলের সন্ধানে যুগে যুগে...অজয় চক্রবর্তী...৫৪

পর্ব ১২ : চেনা দেশ অচেনা মানুষ...মহানির্বাণ উপাধ্যায়...৫৮

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : ভেতরের প্রচ্ছদের ছবি গুগলস্ ডট কম-এর সৌজন্যে

মুদ্রণ : রে'জ ডট কম, ৪৪/১, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

DURBAR BHABNA

Declaration No 18/09

Vol. 3 No.5-6 ☐ September-October 2011

Editor : Dr Smarajit Jana

Publisher : Asha Banerjee

Address : 12/5 Nilmani Mitra Street
Kolkata 700 006 WB INDIA

Phone : 033 2543 7560/7451 Fax : 033 2543 7777

e mail : sonagachi @sify.com URL : www.durbar.org

সম্পাদকীয়

শ্রমিক আন্দোলন কি কারখানা বন্ধের কারণ?

আমহার্স্ট থেকে বোস্টন শহরে যাওয়ার রাস্তায় মোটরওয়ে ধরে ঘণ্টা দুয়েক ড্রাইভ করে যে শহরটায় প্রথম পৌঁছানো যায় তার নাম হোলিওকে শহর। হোলিওকে শহরে রয়েছে মেয়েদের বিখ্যাত কলেজ মাউন্ট হোলিওকে। হোলিওকে কলেজ ছাড়িয়ে গাড়ি যখন ছুটে চলবে পুরনো হোলিওকে শহরের পাশ ধরে তখন একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়বে। মোটরওয়ের দু'দিকে চোখ রাখলে দেখা যাবে বহুদিনের অব্যবহৃত অসংখ্য বাড়িঘর সব পড়ে রয়েছে। চোখে পড়বে কারখানার প্রাচীর, শ্রমিকদের কলোনি। ঐসব বাড়িঘরের বেশির ভাগই এখনো প্রায় অবিকৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে তবে কোনোটার হয়তো রং চটা, কোনোটার দরজা-জানালা ভাঙা, কিন্তু বাড়িঘরগুলোর আশেপাশে কোনো জনমনিষ্যি চোখে পড়বে না। একসময় কানেকটিক নদী থেকে খাল কেটে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল হোলিওকের শিল্পনগীর সঙ্গে। সেই সময়ে শিল্পসমৃদ্ধ হোলিওকের উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী যাতে নদীপথে চালান করার যায় সেই উদ্দেশ্যে। এখন সেই চওড়া খালটা নীলজলে টলমল করছে। কিছু বাড়িঘরের আশেপাশে ঝোপজঙ্গল গজিয়ে উঠেছে। কোনো বাড়ির দেওয়ালে হয়তো দুএকটা গাছও গজিয়ে উঠতে দেখা যাবে। কিন্তু যেটা দেখা যাবে না তাহলো মানুষের মুখ। এই অঞ্চলে ঘুরলে মনে হবে আমরা পৌঁছে গেছি কোনো এক ভুতুড়ে শহরে। খালের ধারে পড়ে রয়েছে মরচে পড়া জাহাজ জেটি, ভেঙে পড়া বসার জায়গা কিন্তু খালে কোনো স্টিমার, নৌকা কিছুই নেই। কেউ যেন ফুসমন্তর করে এখান থেকে সমস্ত মানুষজনকে হাওয়া করে দিয়েছে। আর একটা দুটো বাড়ি নয়, অসংখ্য বাড়িঘর চারপাশে এমনি ভাবে ছড়ানো ছেটানো রয়েছে যার থেকে এটা যে এককালে একটা বড় শিল্পনগরী ছিল সেটা বুঝে নিতে অসুবিধা হবে না।

□□ হোলিওকে শিল্পনগরীর মরে যাওয়া কিংবা আমাদের দেশের হাওড়া, বেলুড় অঞ্চলে গড়ে ওঠা শিল্প কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া অথবা ডেট্রয়েট কিংবা দুর্গাপুরের শিল্পনগরী ধ্বংসের মধ্যে কিন্তু একটা সাধারণ সূত্র জড়িয়ে রয়েছে। যদিও দেশ দুটো আলাদা, শহরও আলাদা আলাদা। দুই দেশের শিল্প কারখানার মধ্যেকার বিশেষত্ব এমনকী কারখানার উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ফারাক থাকলেও এক জায়গায় একটা অসম্ভব মিল রয়েছে। সেটা হলো এই ঘটনাগুলো ইতিহাসের একটা সময় জুড়ে ঘটেছে।

খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম ঊনবিংশ শতাব্দীর সাতের দশকে হোলিওকের এই কর্মব্যস্ত শিল্পনগরী পরবর্তী কয়েকবছরের ব্যবধানে পরিত্যক্ত শহরে রূপান্তরিত হয়েছে। এরকম বড় মাপের ভুতুড়ে শিল্পনগরী দিল্লি রোডের ধারে বা হাওড়ায় বা লিলুয়ার চোখে না পড়লেও একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে এখনো ঐ রাস্তার ধারে ভেঙে পড়া কারখানার শেড় বা ছাউনি চোখ এড়িয়ে যাবে না— তুবড়ে পড়া অফিসঘর, ভেঙে পড়া চিমনির মাথা ইত্যাদিও আজও দেখা যায়। পুরোনো দিল্লি রোড এবং জিটি রোডের ধার ধরে একসময় যে শিল্পনগরী গড়ে উঠেছিল, আমরা জানি, সত্তরের দশকে তার অবক্ষয় শুরু হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে যেতে থাকে একের পর এক কারখানা। দুর্গাপুরের শিল্পনগরী ধুঁকে ধুঁকে মরার পর্যায়ে পৌঁছোয় তারও কিছুকাল পরে। সময়টা মোটামুটি ১৯৯০-এর আশেপাশে। আমেরিকার ডেট্রয়েট শহরে, যেখানে (গাড়ি তৈরির কারখানা রয়েছে) ঐ সময়ে কেউ ওখানে ঘুরতে গেলেও ওই একই ধরণের ছবি দেখতে পেতেন। পড়ে থাকা বাড়িঘর, অব্যবহৃত দোকানপাট, লোকজনহীন রাস্তা, খেলার মাঠ ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমেরিকার সঙ্গে আমাদের দেশের একটা তফাৎ হলো, ওদেশে শিল্পনগরী ভেঙে পড়লে আশপাশের অঞ্চলের জমির দাম হু হু করে কমতে থাকে। তখন ঐসব বাড়িঘর কেনার কোনো খদ্দের পাওয়া যায় না। ফলে বাড়িঘর ফেলে দিয়ে শ্রমিকেরা তো বটেই ঐ শিল্পকে ঘিরে একসময় যে জনবসতি গড়ে উঠেছিল সে-সব মানুষজনেরাও এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। পড়ে থাকে শুধু বাড়িঘরগুলো। সেই সব বাড়িঘরের দখলদারী নেওয়া তো দূরের কথা, তার আশেপাশের অঞ্চলেও কেউ বসতি গড়তে আসে না।

হোলিওকে শিল্পনগরীর মরে যাওয়া কিংবা আমাদের দেশের হাওড়া, বেলুড় অঞ্চলে গড়ে ওঠা শিল্প কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া অথবা ডেট্রয়েট কিংবা দুর্গাপুরের শিল্পনগরী ধ্বংসের মধ্যে কিন্তু একটা সাধারণ সূত্র জড়িয়ে রয়েছে। যদিও দেশ দুটো আলাদা, শহরও আলাদা আলাদা। দুই দেশের শিল্প কারখানার মধ্যেকার বিশেষত্ব এমনকী কারখানার উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ফারাক থাকলেও এক জায়গায় একটা অসম্ভব মিল রয়েছে। সেটা হলো এই ঘটনাগুলো ইতিহাসের একটা সময় জুড়ে ঘটেছে।

দুটো দেশের চালচিত্র আলাদা হলেও বিভিন্ন কলকারখানা বন্ধ হওয়ার পেছনের কারণগুলো মোটেই কিন্তু আলাদা নয়। হোলিওকে শিল্পনগরী যে সব কল-কারখানকে নির্ভর করে গড়ে উঠেছিল তা হলো কাগজ, সিন্থেটিক এবং ধাতুদ্রব্য নির্ভর শিল্প কারখানা। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে যে কারিগরিকে নির্ভর করে ঐসব কলকারখানা সারা পৃথিবীজুড়ে গড়ে উঠেছিল কিছুকাল পর সেই কারিগরির জায়গায় নতুন কারিগরি বাজারে আসে এবং পুরোনো কারিগরি-নির্ভর শিল্প পিছু হটতে থাকে। এর পাশাপাশি ঐসব কল-কারখানার বর্জ্য পদার্থের অপসারণ এবং পরিবেশ দূষণ সম্পর্কীয় আইনকানুন ঐ পুরোনো কারিগরি বা শিল্পকে আর এক আক্রমণের মুখে ঠেলে দেয়। ঐসব পণ্য তৈরির কারিগরিতে যে-সব পরিবর্তন সে সময়ে ঘটেছিল তাতে স্বাভাবিক ভাবেই ঐ পুরোনো কলকারাখনা চালিয়ে যাওয়া বা টিঁকিয়ে রেখে নতুন কারিগরি-নির্ভর উৎপাদনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাজারে টিঁকে থাকা সম্ভবপর ছিল না। পুরোনো কারিগরি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থার খরচ-খরচা এবং উৎপাদিত পদার্থের গুণমান নতুন কারিগরি নির্ভর উৎপাদিত পদার্থের উৎপাদনের হার ও গুণমানের সঙ্গে কি করে পাল্লা দেবে? দুর্গাপুরের শিল্পনগরী ছোট হয়ে যাওয়া বা মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ সেই পুরোনো কারিগরির সমস্যা। তা সে স্টিলপ্ল্যান্ট, অ্যালয় প্ল্যান্ট, ফার্টিলাইজার বা কেমিক্যাল কারখানা যারই কথাই ভাবা হোক না কেন। এসবের পেছনে মূল বিষয়টা হলো পুরোনো কারিগরি পাল্টে নতুন কারিগরি আনা বা প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে পারা বা না পারার সমস্যা। কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পেছনে সেটাই হলো মুখ্য কারণ। যদিও পশ্চিমবঙ্গের কারখানা ধ্বংসের পিছনে শ্রমিক অসন্তোষ, জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়নিজমকে দোষারোপ করা হয়। কিন্তু হোলিওকে কিংবা ডেট্রয়েট শহরে শিল্প মরে যাওয়ার পেছনে ট্রেড ইউনিয়নকে কিন্তু দায়ী করা হয় না। মজা হলো, আমাদের দেশে তা সে ডান কিংবা বামপন্থী যে মতালম্বী মানুষই হোন না কেন, তারা প্রশ্নাতীত ভাবে বিশ্বাস করেন যে, ঐ সময়কার রাজনৈতিক অস্থিরতা, শ্রমিক আন্দোলনই নাকি ঐসব কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পেছনের কারণ। শ্রমিক অসন্তোষটা ফল, কারণ নয়। ঠিক সেই একই কারণে সত্তরের দশকের হাওড়া/লিলুয়া কিংবা আশেপাশের অঞ্চলের কল-কারাখানা ধুঁকে ধুঁকে মরে যাওয়ার পেছনের কারণ হিসাবে রাজ্যের অশান্তি ও শ্রমিক অসন্তোষকে দায়ী করা হলেও মুখ্য কারণটা কারিগরি বিষয়ক।

যারা শিল্প-রসায়ন বা ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি কিংবা পেশাগত রোগ বিজ্ঞানের ছাত্র তাদের সবারই জানা আছে যে, কারিগরির উন্নয়ন ও পরিবর্তন এক সাধারণ ও স্বাভাবিক সত্য এবং সাধারণ ভাবে দেখা গেছে গড়ে ১০-১২ বছরের ব্যবধানে প্রায় সব ধরণের ম্যানুফ্যাকচারিং এবং রাসায়নিক শিল্পের কারিগরিতে এক-একটা বড় ধরণের পরিবর্তন ঘটে। আর তখন পুরোনো কারিগরি আঁকড়ে থাকার অর্থ হলো নতুন কারিগরি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারা। বিংশ শতাব্দীতে কারিগরির পরিবর্তনের গতি

যে দ্রুততর হবে তা বলাই বাহুল্য। তাই পণ্য উৎপাদনকে ঘিরে যে শিল্প বিকাশ ঘটে বা ঘটে চলেছে তাতে এই কারিগরির উন্নয়ন ও পরিবর্তন একটি চিরন্তনী প্রক্রিয়া। শিল্প বিকাশ ও ব্যবসা বাণিজ্যের জায়গার এই বিষয়টি সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ— তা সে কাপড়ের কারখানা, লোহার কারখানা, সার তৈরির কারখানা বা সিন্থেটিক পদার্থ নির্ভর পণ্যের (প্লাস্টিক জাতীয়) কারখানার কথাই ভাবা হোক না কেন। আসলে এই নতুন ধরণের কারিগরির বাজারে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এক ধরণের ‘শিল্প ব্যবসায়িক’ সংকট গড়ে ওঠে— এই বিষয়টা বুঝতে না পারলে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা বেড়েই যাবে। এটা ঠিকই, এই আপাত শিল্প সংকটকে ঘিরে দেশের রাজনৈতিক নেতারা ফায়দা তোলার কাজে নেমে পড়েন, সঙ্গে যুক্ত হয় মিডিয়ার কুশীলবেরা। মাঝখানে দোষী সাব্যস্ত হন শ্রমিক সাধারণ এবং এই সুত্র ধরে বিচারের কাঠগড়ায় টেনে আনা হয় শ্রমিক আন্দোলনকে। বিভ্রান্ত হন শ্রমিক শ্রেণি তথা প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলনের কর্মীরা। এ ভাবেই সত্যটা গুলিয়ে যায়। বরং বলা ভালো গুলিয়ে দেওয়া হয়। দুর্গাপুর কিংবা হলদিয়ার ফার্টিলাইজার প্ল্যান্ট সরকারি বদান্যতায় চলে বলে এখনও টিঁকে রয়েছে। তা না হলে এই ধরণের পুরোনো এবং কার্যত মান্ধাতা আমলের কারিগরি নির্ভর সার উৎপাদনের কারখানা পৃথিবীতে সবথেকে পিছিয়ে পড়া দেশেও চালু রাখা সম্ভব নয়। নতুন কারিগরি স্বভাবতই বেশি উৎপাদনশীল এবং নতুন কারিগরিতে উৎপন্ন দ্রব্যের গুণমান পুরোনো কারিগরির থেকে উচ্চমানের হয়ে থাকে। দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট বা অ্যালয় স্টিলে নতুন কারিগরি অনেক দেরিতে হলেও নিয়ে আসা হয়েছে আর এর জন্যই কারখানাটা এখনো টিঁকে রয়েছে। তা না হলে এই স্টিল প্ল্যান্টের কর্মীদের হলদিয়ার সার কারখানার কর্মীদের মতো বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দিতে হতো। হলদিয়ার কারখানাটি চালু রাখলে ক্ষতির পরিমাণ বাড়বে বই কমবে না— এক কিলোগ্রামও সার তৈরি হয় না সেখানে তবু শ্রমিকদের ঘরে বসে মাইনে দিতে হয়। পুরোনো কারিগরি নির্ভর পণ্য উৎপাদন বাজারি প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারে না, না খরচ-খরচার নিরিখে, না গুণমানের বিচারে।

□□ আমাদের দেশে তা সে ডান কিংবা বামপন্থী যে মতালম্বী মানুষই হোন না কেন, তারা প্রশ্নাতীত ভাবে বিশ্বাস করেন যে, ঐ সময়কার রাজনৈতিক অস্থিরতা, শ্রমিক আন্দোলনই নাকি ঐসব কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পেছনের কারণ। শ্রমিক অসন্তোষটা ফল, কারণ নয়। ঠিক সেই একই কারণে সত্তরের দশকের হাওড়া/লিলুয়া কিংবা আশেপাশের অঞ্চলের কল-কারাখানা ধুঁকে ধুঁকে মরে যাওয়ার পেছনের কারণ হিসাবে রাজ্যের অশান্তি ও শ্রমিক অসন্তোষকে দায়ী করা হলেও মুখ্য কারণটা কারিগরি বিষয়ক।

তাই মালিকদের কাছে সে সময় যে সব রাস্তা খোলা থাকে তা হলো— শ্রমিকের মজুরি কমিয়ে বা কিছু শ্রমিক ছাঁটাই করে বাকিদের ওপর চাপ দিয়ে বেশি কাজ করিয়ে উৎপাদনের খরচ কমানো যাতে আরও কিছুদিনের জন্য সে বাজারে টিঁকে থাকতে পারে। দ্বিতীয় যে রাস্তাটা বিশেষত উন্নত বিশ্বের শিল্পপতিরা করে থাকেন তা হলো রাতারাতি সেই পুরোনো কারিগরি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা অন্যদেশে চালান করা। তুলনামূলক ভাবে কম উন্নয়নশীল দেশে যেখানে কম মজুরি দিয়ে উৎপাদন করা যায়, যেখানে পরিবেশ দূষণের জন্য গুণাগার দিতে হয় না। সেখানে এ-ধরণের কারিগরি নির্ভর উৎপাদন কিছুদিনের জন্য হলেও বাজারি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিঁকে থাকতে পারে। আর তৃতীয় রাস্তাটি হলো পুরোনো কারিগরি ফেলে দিয়ে নতুন কারিগরি আমদানি করা। এতে আবার দুটো সমস্যা রয়েছে। প্রথম সমস্যা হলো এতে নতুন করে প্রচুর মূলধন নিয়োগ করতে হয় আর দ্বিতীয় সমস্যাটি নতুন বা উন্নততর কারিগরি উদ্ভাবন ও ব্যবহারের সঙ্গে ওতোপ্রতো ভাবে জড়িত। নতুন কারিগরিতে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে অথচ কম শ্রমিক দিয়ে ঐ কাজ করা যায়। নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ সাধারণ ভাবে শ্রমিক সংকোচন ঘটায়। দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টের নতুন কারিগরি আনার সঙ্গে সঙ্গে ঐ কারখানায় কর্মরত চল্লিশ হাজার শ্রমিক সংখ্যা কমিয়ে দশ হাজারে নামানো হয়েছে। নতুন কারিগরি আনতে বহু মালিক নতুন করে মূলধন লাগু করতে অপারগ হন বা নারাজ থাকেন। দ্বিতীয়ত, শ্রমিক ছাঁটাই হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে মালিক সেই ঝুঁকি নিতে রাজি হন না। তখন তারা পুরোনো কারিগরি বজায় রেখে উৎপাদনের খরচ কমানোর প্রচেষ্টায় যে-সব পদ্ধতি প্রকরণ ব্যবহার করেন যেমন ছাঁটাই বা লে-অফ্ বা মাইনে কমানো বা মাইনে বাড়ানো বন্ধ করা ইত্যাদি। হাওড়া, বেলুড়, লিলুয়ায় পাঁচের দশকে গড়ে ওঠা বিভিন্ন ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প সাতের দশকে ঐ একই ভাবে পুরোনো প্রযুক্তি বজায় রেখে বাজারে টিঁকে থাকতে পারে না। তাই ঐ সময়ে শিল্পপতিরা নানা ভাবে শ্রমিকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে উৎপাদনের খরচ কমানোর প্রচেষ্টা নিয়েছিল। সেই কারণেই শ্রমিক অসন্তোষ দানা বাঁধতে শুরু করে। কোথাও কোথাও সেই আন্দোলন জঙ্গি আকার ধারণ করে। তাই শ্রমিক অসন্তোষকে কারখানা বন্ধ হওয়ার পেছনের কারণ হিসেবে দাঁড় করানো যায় না। শ্রমিক অসন্তোষের ফল কারখানা বন্ধের কারণ নয়। কারিগরির উন্নয়ন এবং মালিকের মানসিকতার যৌথ সমন্বয়ে কারখানা বন্ধ হওয়ার রাস্তায় হেঁটে চলে বলেই শ্রমিক অসন্তোষ, বিক্ষোভ, ঘেরাও ইত্যাদি ঘটে থাকে। এগুলিও কারখানা বন্ধের কারণ নয়। ঠিক একই ভাবে স্ট্রাইক বা বন্ধ ডাকাকে কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ হিসাবে

□□ আপাত শিল্প সংকটকে ঘিরে দেশের রাজনৈতিক নেতারা ফায়দা তোলার কাজে নেমে পড়েন, সঙ্গে যুক্ত হয় মিডিয়ার কুশীলবেরা। মাঝখানে দোষী সাব্যস্ত হন শ্রমিক সাধারণ এবং এই সুত্র ধরে বিচারের কাঠগড়ায় টেনে আনা হয় শ্রমিক আন্দোলনকে। বিভ্রান্ত হন শ্রমিক শ্রেণি তথা প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলনের কর্মীরা। এ ভাবেই সত্যটা গুলিয়ে যায়।

□□ স্ট্রাইক বা বন্ধ ডাকাকে কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা ভুল। সাতের দশকে কলকাতা হাওড়ার শিল্প কারখানা বন্ধ হওয়ার মূল কারণ হল পুরোনো কারিগরি ছেঁটে ফেলে নতুন কারিগরি আনার ক্ষেত্রে মালিকের পক্ষে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। অন্যদিকে সরকারের তরফে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা এবং শ্রমিক স্বার্থরক্ষার জন্য বিধি ব্যবস্থা তৈরি না করা। আমেরিকায় শিল্পনগরী বন্ধ হয়ে গেলে শ্রমিক অসন্তোষ হয় না। এ রাজ্যে হয় বলে এর পেছনে শ্রমিকরাই মুখ্যত দায়ী, এই ধারণাটাই অযৌক্তিক।

চিহ্নিত করা ভুল। সাতের দশকে কলকাতা হাওড়ার শিল্প কারখানা বন্ধ হওয়ার মূল কারণ হলো পুরনো কারিগরি ছেঁটে ফেলে নতুন কারিগরি আনার ক্ষেত্রে মালিকের পক্ষে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। অন্যদিকে সরকারের তরফে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা এবং শ্রমিক স্বার্থরক্ষার জন্য বিধি ব্যবস্থা তৈরি না করা। আমেরিকায় শিল্পনগরী বন্ধ হয়ে গেলে শ্রমিক অসন্তোষ হয় না। এ রাজ্যে হয় বলে এর পেছনে শ্রমিকরাই মুখ্যত দায়ী, এই ধারণাটাই অযৌক্তিক। এটা এই রাজ্যের বিশেষত শিক্ষিত জনসমাজের শ্রমিক বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। অনেকে বুঝেও চতুরতা করে শ্রমিক আন্দোলনের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। এবং নানান কুযুক্তি গড়ে তুলে পরোক্ষ ভাবে সরকার তথা পুঁজিপতিদের তোল্লাই দেওয়ার রাস্তা তৈরি করে। ১৯৭০-৮০-র দশকে অজস্র কলকারখানা মহারাষ্ট্র, গুজরাটে বন্ধ হয়ে গেলে একই যুক্তির অবতারণা ঘটানো হয়। বলা হয় মুম্বাইয়ের ট্রেড ইউনিয়নিজম নাকি সে রাজ্যের বস্ত্র শিল্পের নাভিশ্বাস তুলেছিল। এ ধারণাটা সর্বৈব মিথ্যে। মুখ্য কারণটা হলো বয়ন শিল্পে উন্নত কারিগরির উদ্ভাবনের ফলে সারা পৃথিবী জুড়েই ঐসময় পুরোনো কারিগরি নির্ভর বয়ন শিল্পের টিঁকে

□□ ১৯৭০-৮০'র দশকে অজস্র কলকারখানা মহারাষ্ট্র, গুজরাটে বন্ধ হয়ে গেলে একই যুক্তির অবতারণা ঘটানো হয়। বলা হয় মুম্বাইয়ের ট্রেড ইউনিয়নিজম নাকি সে রাজ্যের বস্ত্র শিল্পের নাভিশ্বাস তুলেছিল। এ ধারণাটা সর্বৈব মিথ্যে।

থাকা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। ঐ কারণেই পৃথিবীর দেশে দেশে এই বিশেষ কারিগরি নির্ভর বয়ন শিল্পের মৃত্যুঘণ্টা বেজে উঠেছিল সেদিন। সেই একই কারণে ম্যাঞ্চেস্টার সহ ইউরোপের আরও বহু শিল্প নগরীর হাল-হকিকতের সঙ্গে মুম্বাইয়ের বয়ন শিল্পেরও পতন ঘটে। ম্যাঞ্চেস্টারের বা লিভারপুলের শিল্পনগরী মরে যাওয়ার জন্য ট্রেড ইউনিয়নকে দোষারোপ করা হয়নি অথচ একই ফলের জন্যে দোষারোপ করা হলো মহারাষ্ট্র বিশেষত মুম্বাইয়ের ট্রেড ইউনিয়গুলিকে।

কারিগরির এই বিবর্তন ও উন্নয়ন ক্রমান্বয়ে ঘটে চলেছে ম্যানুফ্যাকচারিং, ধাতু ও রসায়নিক শিল্পসহ সমস্ত ধরণের শিল্পে। হোলিওকে আমেরিকার পুঁজিপতিরা সেদিন কাগজ বা সিন্থেটিক এবং রাসায়নিক শিল্প রাতারাতি চালান করে দিয়েছিল দক্ষিণ আমেরিকার মেক্সিকো, ভেনেজুয়েলায়। ভারতীয় শিল্পপতিদের সেদিন হয়তো সে সুযোগ ছিল না বা তারা সেভাবে ভেবে উঠতে পারেন নি। তবে বর্তমানে এদেশে ঐ একই ধাঁচে পুরোনো কারিগরি অন্যত্র রপ্তানি করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাবে যদি গুজরাতের উদাহরণ তুলে আনা হয়।

সুরাত থেকে আঙ্কোলেশ্বর হয়ে দমন অব্দি গাড়ি চালিয়ে গেলে রাস্তার দু'ধারে শ'য়ে শ'য়ে শিল্প কারখানা চোখে পড়বে। সুরাত শহরের অধিকাংশ হোটেলে এখন রাত কাটাতে গেলে কানে তুলো গুঁজে রাখতে হয় কারণ সারা শহরের অলিতে-গলিতে যে সব পাওয়ারলুম বসানো হয়েছে তার একটানা খটাখট্ শব্দ থেকে বাঁচতে গেলে কানে তুলো গোঁজা ছাড়া উপায় নেই। সমস্ত ধরণের দূষণযুক্ত এবং তুলনামূলক ভাবে পশ্চাদপদ কারিগরির ব্যবহারকে ভিত্তি করে যে বিশাল শিল্প নগরী গড়ে উঠেছে ঐ রাজ্যে এবং তার জন্য সুকৌশলে যে ধরণের 'দিনমজুরি নির্ভর' শ্রমিক মালিক সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়েছে তাতে মালিকেরা বেশ কিছুদিন উৎপাদনের খরচ-খরচা কমিয়ে রেখে বাজারে টিকে থাকবে, আর যেহেতু পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি এদেশে আলাপ আলোচনার বিষয় নয় এবং এসবের জন্য মালিককে গুনাগার দিতে হয় না, তাই আরো কয়েকবছর ঐ রাজ্যে মনে হয় শিল্প বিকাশের চর্চা বহাল থাকবে। গুজরাত সরকার বেশ কিছু শ্রমিককে এই বাজারে চাকরি জুটিয়ে দেওয়ার কাজটা, বিশেষত যে দেশে বেকারির হার আকাশ ছোঁয়া, সাফল্যের সঙ্গে করতে পেরেছে।

এই একই নিয়ম নীতিতে নির্ভর করে আমেরিকা, ইউরোপের শিল্পপতিরা বাংলাদেশে কিংবা আফ্রিকার দেশগুলিতে বস্ত্রশিল্প কিংবা অ্যাসবেসটস শিল্পের প্রসার ঘটিয়েছে গত দুটো দশক জুড়ে। প্রায় সেই ধারাকে অনুসরণ করেই আজ শিল্প গড়ে উঠেছে গুজরাতে। সুরাত থেকে দমন প্রায় চারশো মাইল জুড়ে রাস্তা ধরে ড্রাইভ করতে গিয়ে অধিকাংশ সময় কিন্তু গাড়ির দরজার কাঁচ তুলে রাখতে হয়েছে কারণ বিভিন্ন রাসায়নিকের তীব্র গন্ধে প্রায় বমি এসে যাচ্ছিল। এতো গেল একদিকের কথা অন্যদিকে আজ এরাজ্যে যখন শিল্প প্রসারের জন্য প্রায় সব রাজনৈতিক দলের নেতারা উঠে পড়ে লেগেছেন তখন এই বিষয়গুলো মাথায় রাখা ভীষণ জরুরি। শ্রমিকদের দোষারোপ করার রাজনীতিকে সঙ্গী করে শ্রমিকের অধিকারগুলোকে জলাঞ্জলি দিয়ে আগামীদিনে এরাজ্যে নতুন করে কল কারখানা গড়ে তোলা যে হবে না তা কে বলতে পারে? বিশেষত গত চার দশকে যেভাবে শ্রমিক সাধারণকে ''যত দোষ নন্দ ঘোষ'' হিসাবে খাড়া করা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে বাম কিংবা ডান কারোরই কিন্তু স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই বা নির্দিষ্ট কোনো অবস্থান নেই। তা না হলে বামপন্থীরাই বা কি করে বিশ্বাস করেন যে, সত্তরের কিংবা তার পরের দশকে এরাজ্যে বহু করাখানা বন্ধ হওয়ার পেছনের মুখ্য কারণ শ্রমিক আন্দোলন। জার্মানির প্রচার সচিব গোয়েবেলস হয়তো ঠিকই বলেছিলেন যে 'একটা মিথ্যাকে হাজারবার প্রচার করলে সেটা সত্যি হয়ে যায়।'

□ **স্মরজিৎ জানা**

আলোর উৎসেই অন্ধকার

আরণ্যক বসু

মেসি, মানে আর্জেন্টিনার বিশ্বখ্যাত ফুটবলার লিওনেল মেসি এলেন, দেখলেন না, জয় করলেন। জয় করলেন কলকাতার মন-প্রাণ। সংবাদমাধ্যমে বিশেষত টেলিভিশনে মেসি-মেসি-মেসিক্কার। মেসি দেখলেন না, কারণ রাস্তায় বেরোলেন না। আর্জেন্টিনা দলের বাকি ফুটবলাররা অবশ্য বেরোলেন— কলকাতা ঘুরলেন। দারিদ্র্য দেখলেন। তারপর তাদের প্রতিক্রিয়া : দেশে ফিরে কলকাতার দারিদ্র্য নিয়ে কিছু ভাববেন। ভাববেন এবং চেষ্টা করবেন কিছু করার। খবরটা *আনন্দবাজার পত্রিকা*-য় বেরিয়েছে, মেসিরা চলে যাওয়ার পরদিন মানে ৬ সেপ্টেম্বর ২০১১-য়। এসব কথা ভালো না মন্দ সে-সব পরের বিচার। আপাতত আমাদের ভাবনার বিষয় এই দারিদ্র্য, মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন, আর বিশ্বায়িত ভারতের অর্থনীতিতে কার কেমন হাল-হকিকৎ। এখানে বলে নেওয়া ভালো যে, গণমাধ্যমের কাটাছেঁড়া করা বিষয়ের মধ্যে যে এসব আসে তা আদৌ নয়, আর তারা যে সব সময় ভালো মন্দের ধার ধারে, তাও নয়—তবে...

এ-বছর, মানে এই ২০১১-য় দুটি দশক পূর্ণ হলো ভারতে মুক্তায়ন, বেসরকারিকরণ ও বিশ্বায়নের ঘোষিত অর্থনীতির যাত্রার! ১৯৯১ সালে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী (বর্তমান প্রধানমন্ত্রী) শ্রী মনমোহন সিং-এর বাজেট ঘোষণা দিয়ে এর শুরু হয়েছিল। এই বিশ বছর পূর্তি উৎসব (!) যে কোথাও বিশেষ ভাবে উদ্‌যাপিত হয়েছে তা নয়। তবে কয়েকটি জাতীয় সংবাদপত্রে গুটিকয় লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। বিদ্যে-বুদ্ধি তত্ত্ব-তথ্য বোঝাই ভারী ভারী সেই সব প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছিল : 'সবচেয়ে বৃহৎ আর সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান প্রভাব' হলো পাঁচটি ক্ষেত্রে : বিমান চলাচল, মোবাইল টেলিফোন, কেব্‌ল টেলিভিশন, আউটসোর্সিং আর মোটরগাড়ি। দু-একটা সংবাদপত্রে আবার আরও গাল-ভরা শব্দবন্ধ ব্যবহার করা হয়েছিল : 'উদীয়মান অর্থনীতি' (emerging economy)। এই উদীয়মান অর্থনীতির ফলে দু-দশকের মধ্যেই মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনে ভারত বিশ্বে ১২তম স্থান থেকে ১০ম স্থানে, এবং ক্রয়ক্ষমতায় নবম স্থান থেকে চতুর্থ স্থানে পৌঁছেছে। কিন্তু কোথাও কেউ ভুল করেও উল্লেখ করেনি যে, জনপ্রতি হিসেবে ও মানব উন্নয়ন সূচকে ভারত এখন ক্রমতালিকায় বিশ্বের সব থেকে নীচের দিকে একটি দেশ।

সাম্প্রতিক অতীতে, কলকাতায় লিওনেল মেসি, সচিন তেন্ডুলকারের শততম শতরান, ইংলন্ডে ভারতের গো-হারা কিংবা এই ধরণের বিষয়ে যত শব্দ খরচ করা হয়েছে, এবং, বলা ভালো, যত ফুটেজ নষ্ট হয়েছে, তার শতকরা ১ ভাগও শব্দ বা ফুটেজ খরচ হয়নি মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গত ১২ বছরে ২,০০,০০০ কৃষকের আত্মহত্যা (নাকি হত্যা!) (বিশ্বের ইতিহাসে বোধ হয় এইরকম অভূতপূর্ব ঘটনা আর দ্বিতীয়টি পাওয়া যাবে না) লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষ বিশেষত বনবাসী, আদিবাসী, সাধারণ কৃষিজীবীদের উচ্ছেদ হওয়া, প্রান্তবাসীদের আরও প্রান্তের দিকে ঠেলে দেওয়া কিংবা অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের দিনের পর দিন বঞ্চনা অথবা বেকারত্বের মতো গুরুতর বিষয়গুলি সম্পর্কে। আর একেবারেই উল্লেখ করা হয় না বা হয়নি নিওলিবারাল অর্থনীতির হাত ধরাধরি করে চলা নোংরামি, পক্ষপাতমূলক আচরণ কিংবা ভয়ঙ্করতম অপরাধ ইত্যাদির কথা। এসবের চূড়ান্ত কুৎসিত রূপ দেখা গেছে আজ নয়, সেই ১৯৯০-এর দশক থেকেই— শেয়ার বাজারে ঘটানো হর্ষদ মেহতা-র কেলেঙ্কারি (scam), এনরন স্ক্যাণ্ডাল, কুখ্যাত টেলিকম কেলেঙ্কারি এবং একুশ শতকের প্রথম দশকে সরকারি ক্ষেত্রগুলির বেসরকারিকরণ (বিদেশ সঞ্চার নিগম লিমিটেড, সেন্টুর হোটেল, মডার্ন বেকারি এবং বালকো [ভারত অ্যালুমিনিয়ম কোম্পানি]) বা আরও সাম্প্রতিকতম কালে ২জি স্পেকট্রাম, ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন (ইসরো) বা কৃষ্ণা-গোদাবরী গ্যাস কেলেঙ্কারি।

একটা প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক ভাবেই এখানে এসে পড়ে। সাম্প্রতিক কালের গৃহীত নীতির ফলে মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনে এই বৃদ্ধি কি কোনো সামাজিক সমতার ক্ষেত্র তৈরিতে সাহায্য করেছে? এক কথায় এর উত্তর, অবশ্যই না। বরং যথেষ্ট পরিমাণ অসমতার সৃষ্টি করেছে। ধরা যাক, প্রথমত, কৃষির কথা। এদেশের প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। মোট জাতীয় উৎপাদনে এই কৃষির অংশ মাত্র ২০ শতাংশ। তার ওপর আবার পরিবেশগত সংকটে ও আর্থিক সংকটে তার দুরবস্থা একেবারে চরমসীমায় পৌঁছেছে। দ্বিতীয়ত, শিল্পের প্রসার এতই ধীরগতির যে কৃষিতে উদ্বৃত্ত শ্রম শক্তিকে শিল্প কোনো ভাবেই আত্মসাৎ করতে পারছে না।

অন্যদিকে, মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধিতে

মূলত লাভবান হচ্ছে উপরতলার ১০ থেকে ১৫ শতাংশ মানুষ। বাকিরা ক্রমশই নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে অর্থাৎ বেশির ভাগ মানুষের আয় কমছে, বাড়ছে বেকারিত্ব। সবচেয়ে আশাবাদী সরকারি হিসেব অনুযায়ী (তেন্ডুলকর কমিটির রিপোর্ট) গ্রামীণ দারিদ্র্যাবস্থা ১৯৯৩-৯৪-এর ৫০.১ শতাংশ থেকে ২০০৪-০৫-এ কমে দাঁড়িয়েছে ৪১.৮ শতাংশে। ঐ একই সময়ে শহরের দারিদ্র্য ৩২.৬ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ২৫.৭ শতাংশ। যদিও খ্যাতনামা অনেক অর্থনীতিবিদ্ই এর পদ্ধতি, প্রকরণ ও তথ্যাদি নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন তবুও আমরা যদি এই তথ্যকে সঠিক বলে ধরে নিই তাহলে বলতে পারি শতকরা হিসেবে দারিদ্র্য কমছে। আর দারিদ্র্য কমার পরও তাহলে (স্বাধীনতার ৬৪ বছর অতিক্রান্ত কথাটা মনে রাখতে হবে) ৪০ কোটি ভারতবাসীকে এখনও ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হয় পশুবৃত্তি অবলম্বন করে? শরীর মনের নিবৃত্তি ঘটাতে হয় প্রয়োজনীয় ক্যালোরি-র তুলনায় অনেকটা কম গ্রহণ করেই। যার নিট ফল অপুষ্টি এবং অর্ধাহার। তারপর অনাহার ও ধীরে ধীরে শেষ লক্ষ্য মৃত্যুর দিকে যাত্রা। যে দুটি দশককে ধরা হচ্ছে অর্থনীতির উন্নয়নের বা মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের চূড়ান্ত বৃদ্ধি বলে সেই সময়ে এই পরিমাণ মানুষের দারিদ্র-দারিদ্র্য-সীমার নীচে বাস করাটা কোনো সুস্থতার,সভ্যতার লক্ষণ কি?

শেষ এখানেই নয়। আরও আছে। সারা ভারতের অর্ধেক শিশু অপুষ্টির শিকার, আর ৪০ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দেহ-ভর সূচক অস্বাভাবিক রকম কম। এই ধরণের শোষিত ক্ষীণশক্তির মানুষের পক্ষে সক্ষমতার সঙ্গে উৎপাদনের উপকরণ হয়ে ওঠার মতো চরম রসিকতা বোধ হয় আর কিছু নেই। আর এর উল্টোদিকে ধনীরা আরো আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছে তাদের সুযোগ-সুবিধা-ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলার লক্ষ্যে। কর ছাড় থেকে শুরু করে প্রান্তবাসী মানুষকে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা যার অন্যতম উদাহরণ। এসব শুনে খেতে পাওয়া মানুষরা বলবে 'শুনতে শুনতে ক্লিশে হয়ে গেছে কথাগুলো'। সরকারে থাকা শাসকদল গলা ফাটিয়ে বলবে : উন্নতি হচ্ছে। বিরোধীরা তথ্য-তত্ত্ব দিয়ে বোঝাবেন, কিস্যু হচ্ছে না।

আর ওই ৪০ কোটি হতদরিদ্র ভারতবাসী? তারা বরং আউড়ে চলুক 'হে ভারত, ভুলিও না তোমার ''অহিংস আদর্শ''।' □

স্ম র ণ

শ্যামলীদি আর নেই

তরুণ বসু

১৯৮০-র দশকের শুরুতে পশ্চিমবঙ্গে পরমাণু বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত। কাগজে-কলমে লেখালেখি (মূলত *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী* পত্রিকায়) হয়তো আর একটু আগে থেকে, ১৯৭৯ নাগাদ শুরু হয়েছিল। অন্যদিকে রাস্তায় নেমে সভা-সমিতি, বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্লাবে গিয়ে আঞ্চলিক ভাবে এই আন্দোলনের ভিত্তিভূমি তৈরির কাজে অংশ নিয়েছিলেন যাঁরা তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ড. স্মরজিৎ জানা, ড. মনন গাঙ্গুলি এবং এরকমই কিছু মানুষজন। ছিলেন *উৎস মানুষ* পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গেরা। আরও একজন সেই সময় থেকে পরমাণু-বিরোধী আন্দোলনে সোচ্চার হয়েছিলেন– শ্যামলী খাস্তগির। আমাদের সকলের চির-পরিচিত শ্যামলীদি।

শান্তিনিকেতনবাসী শ্যামলীদি পরমাণু বিরোধী অনুষ্ঠানে নিজের হাতে আঁকা পোস্টার ইত্যাদি নিয়ে চলে আসতেন খবর পেলেই, তা সে কেউ ডাকুক আর না-ডাকুক— এবং একক উদ্যোগে, নিজের খরচে। ১৯৮০-র দশকের গোড়াতে কলকাতায় বহু বিজ্ঞান সংগঠন মিলে ঘটা করেই পালন করা হতো ৬ ও ৯ আগস্ট হিরোশিমা-নাগাসাকি দিবস। অনেকেরই মনে থাকবে হয়তো, শ্যামলীদি নিয়মিত এই দুটি দিন কলকাতায় উপস্থিত থেকে মিছিলে ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন। ১৯৮৪ সালের ৯ আগস্ট, হিরোশিমা-নাগাসাকি দিবসে, বর্ষণমুখর বিকেলে, শহিদ মিনারের পাদদেশে সভা ও পোস্টার প্রদর্শনী। যতদূর মনে পড়ে, সেদিন ওই অনুষ্ঠানে লোকজন প্রায় কেউই ছিলেন না। *উৎস মানুষ* পত্রিকার তরফ থেকে আমি, বন্ধু *(পটে*-র) সন্দীপন এবং আর দু-একজন ছাড়া শ্যামলীদি তাঁর নিজের হাতে আঁকা পোস্টার নিয়ে বসে আছেন। নানা বিষয়ে সেদিন কথা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। যাই হোক বৃষ্টি এবং লোকজন না-আসায় সেদিন আর প্রদর্শনীও হলো না। আমরা ফিরব আর শ্যামলীদিও ফিরবেন শান্তিনিকেতনে— ট্রেনেরও দেরি ছিল তাই তাঁর সঙ্গে শহিদ মিনার থেকে হাঁটতে হাঁটতে শিয়ালদহ স্টেশন। সেই শুরু। তারপর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলো এই ১৫ আগস্ট ২০১১-য়। সেদিন শ্যামলীদি চলে গেলেন— চিরতরে।

দুর্বার ভাবনা পত্রিকায় তাঁর শেষ লেখাটা শ্যামলীদি লিখেছিলেন বিনায়ক সেন-এর মুক্তির দাবিতে। আর শুধু এই লেখাটাই পৌঁছতে তিনি শান্তিনিকেতন থেকে অসুস্থ শরীরে কলকাতায় এসেছিলেন।

অপরিচয়ের শাসন তাকে কখনও কাউকে আশ্রয় দানের হাত থেকে বিরত করতে পারেনি। তাঁর শান্তিনিকেতনের বড়িতে যে-কোনো সময় যে-কেউ আশ্রয় পেতেন। আতিথেয়তায় কখনও ত্রুটি দেখা যায়নি। জীবনের শেষদিকে একটু আর্থিক দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল তাঁর, কিন্তু কখনও কাউকে বুঝতে দিতেন না সে-কথা। মনে আছে, ২০০৬ সালে, কার্বন বাণিজ্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ইংল্যান্ডের ল্যারি লোম্যান এবং ইতালীয় ফোটোগ্রাফার তাম্রা গিলবার্টসন-কে নিয়ে শান্তিনিকেতনে গেছি পরিবেশ সংক্রান্ত কিছু কাজ নিয়ে। জানিয়ে রেখেছিলাম শ্যামলীদিকে, যাচ্ছি। অতিথি দুজন হোটেলে থাকবেন আর আমরা ওঁর বাড়িতে। পৌঁছে দেখলাম, সবারই জন্যে উনি ব্যবস্থা করেছেন, ওঁর বাড়িতেই। এবং ওঁদেরকে কিছুতেই হোটেলে থাকতে দেবেন না তিনি। পরদিন অসুস্থ শরীরে সারাদিন ঘুরলেনও আমাদের সঙ্গে— পরিবেশ-দূষণ সংক্রান্ত নানা তথ্য-তত্ত্ব দিলেন। এ-বছরের গেড়ায়ও পরমাণু বিরোধিতা নিয়ে, জাদুগোড়া নিয়ে কথা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। যাদুগোড়ার ইউরেনিয়াম দূষণ নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। সে-কাজের ফসল তার বই *জাদুগোড়ার দূষণ*। আদিবাসীদের সঙ্গে থেকে তাদের অবস্থা সরেজমিনে তদন্ত করেই তিনি এই রচনায় হাত দেন। প্রতি বছর শান্তিনিকেতনের পৌষমেলায় তিনি নিয়মিত প্রদর্শনী করেছেন। নিজে সারাদিন উপস্থিত থেকেছেন— প্রতিটি লোককে বুঝিয়েছেন, তাদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

মানবতায় বিশ্বাসী শ্যামলিদির জীবন আমাদের আর একটু মানবিক হতে শেখাক— শুধু আত্মসর্বস্বতা নয়— পরসর্বস্বতারও একটু স্থান আমাদের জীবনে-মননে-চিন্তনে জায়গা পাক। □

অপুষ্টি, যক্ষ্মা এবং সামাজিক বৈষম্য

বিনায়ক সেন

সামাজিক অবিচার বিপুলসংখ্যক মানুষকে হত্যা করছে, এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তার কমিশন অন সোশাল ডিটারমিন্যান্টস অফ হেলথ-এর রিপোর্টের মাধ্যমে সমতা ও স্বাস্থ্যের অধিকারের বিষয়টিকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছে। ভারতীয় পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তার নিদানপত্রটিকে আমরা কীভাবে দেখতে পারি?

ভারত হলো পৃথিবীর সব থেকে অসম দেশগুলির একটি, এবং তার আয়তনটা হিসেবে রাখলে দেখতে পাচ্ছি, এই গ্রহের বিপুল সংখ্যক মানুষের দুঃখকষ্টের অনেকাংশের জন্য অবশ্যই আমরাই দায়ী। স্বাস্থ্যকর্মী হওয়ার সুবাদে আমাদের কাছে এমন তথ্য আছে যা ডান্ডেবার, তেন্ডুলকর কিংবা অর্জুন সেনগুপ্তদের ছাড়িয়ে যায়, এবং এটা আমরা মানুষের শরীর থেকেই পড়ে নিতে পারি। ভারতে আমাদের পাঁচ বছরের কমবয়সী বাচ্চাদের মধ্যে ৪৭ শতাংশই বয়সের তুলনায় ওজনের দিক থেকে অপুষ্টিতে ভুগছে, এটাও আমরা জেনে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। গত ছ'বছরে সারা পৃথিবীতে অপুষ্টিজনিত কারণে যত শিশু মারা গেছে, তাদের সংখ্যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ছ'টি বছরে নিহত প্রাপ্তবয়স্কদের সংখ্যার চেয়ে বেশি। কিন্তু তাও না হয় ছেড়ে দিলাম। আমি এরপর আপনাদের সামনে যে পরিসংখ্যান পেশ করব তা হলো : আমাদের নবজাত শিশুদের ২৬ শতাংশের জন্মসময়ের ওজন যা হওয়া উচিত তার থেকে কম। মনে রাখতে হবে যে, এই ২৬ শতাংশ কিন্তু জনসংখ্যার মধ্যে এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে নেই, বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাদের বেশি করে পাওয়া যায়, যার কারণ হলো মূলত আসাম্য ও সামাজিক অবিচারের চাপ। এবং তারপর তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের ক্ষেত্রে বার্কারের অনুমান—যা দুর্ভাগ্যবশত এখন আর শুধু অনুমান নয়—মিলিয়ে নিয়ে দেখুন, রাতে ঘুমোতে পারেন কিনা।

এবার প্রাপ্তবয়স্কদের কথায় আসা যাক। শৈশবের অপুষ্টি হলো এক জটিল শারীররোগবৃত্তীয় বিষয়, খাদ্যের অভাব যার মধ্যে কেবল একটি কারণ। প্রাপ্তবয়স্কদের অপুষ্টি অনেক সরল—তার মানে হলো যে আপনি যথেষ্ট খেতে পাচ্ছেন না। ন্যাশনাল নিউট্রিশন মনিটরিং ব্যুরো বলছে যে, ভারতের ৩৭ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের ও ৩৯ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক নারীর দেহভর সূচক ১৮.৫-এর নীচে, যার মানে হলো তারা দীর্ঘকালীন অপুষ্টিতে ভুগছে। এই পরিসংখ্যানগুলোকে আলাদা আলাদা করে দেখলে আমরা দেখতে পাবো যে, এর মধ্যে রয়েছে তপশিলি জাতিদের ৫০ শতাংশ এবং তপশিলি উপজাতিদের ৬০ শতাংশেরও বেশি মানুষ। ওড়িশার প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার ৪০ শতাংশেরও বেশি মানুষের দেহভর সূচক ১৮.৫-এর নীচে। মহারাষ্ট্রে, যাকে মাথাপিছু মোট জাতীয় উৎপাদনের নিরিখে তুলনামূলক ভাবে একটি 'উন্নততর' রাজ্য বলে ধরা হয়, ৩৩ শতাংশের দেহভর সূচক ১৮.৫ এর নীচে। এখন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই অনুপাতগুলিকে শ্রেণিবিভাগ করে বলছে যে যদি কোনো জনগোষ্ঠীর ৪০ শতাংশের বেশি মানুষের দেহভর সূচক ১৮.৫ এর নীচে থাকে, তবে তার অবস্থা সংকটজনক বা দুর্ভিক্ষগ্রস্ত বলতে হবে।

তাহলে এখন আমাদের জনসংখ্যার মধ্যে কিছু চোখে পড়ার মতো অংশ রয়েছে যারা বছরের পর বছর দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতিতে দিন কাটাচ্ছে—আমি বলি দুর্ভিক্ষ এদের নিত্যসঙ্গী। এও যেন যথেষ্ট নয়। আমাদর একজন প্রবীণ অর্থনীতিবিদ, উৎসা পট্টনায়ক বলেছেন যে, ১৯৯৩ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে মাথাপিছু বার্ষিক খাদ্যশস্য ভোগের পরিমাণ ১৭৮ কেজি থেকে ১৫৬ কেজি— অর্থাৎ ২২ কেজি কমে গেছে। এটা যেহেতু গড় পরিসংখ্যান, এবং বড়লোকরা আসলে তাদের ভোগের পরিমাণ বাড়িয়েছে, তাই নীচের তলায় এই কমে যাওয়ার পরিমাণটা আরও বেশি।

তাহলে, আমরা এখন একটা দুর্ভিক্ষের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, এবং তা ক্রমেই আরও খারাপ হচ্ছে। আমার বাঙালি কবি বন্ধু গাজি এম আনসার যেমন বলেছেন,

> 'এখানে সন্ধ্যা নামে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে
> বাঘের থাবার মতো
> মোল্লাদের উঠোনে ধান কানায় কানায় ঠাসা
> দুর্ভিক্ষ শুধু আমাদের পাড়াগুলোয়...'

এই 'পাড়াগুলোতেই', অর্থাৎ জনসংখ্যার এই অংশগুলির ওপরেই রাষ্ট্রের নজর পড়ছে, যা সার্বভৌম অধিকারের নীতি অনুসারে দেশজুড়ে প্রাকৃতিক সম্পদের দখল নেওয়া ও প্রাথমিক পুঁজিসঞ্চয়ের এক প্রক্রিয়ার রক্ষক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এর মধ্যে আছে, প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ডেভিড হার্ভের ভাষায়, 'জমিকে পণ্য করে তোলা ও ব্যক্তিগত মালিকানায় নিয়ে আসা এবং কৃষিজীবী জনগোষ্ঠীগুলিকে জোর করে উৎখাত করা; বিভিন্ন

ভারতের সংবিধান সমতার বিষয়ে খুবই স্পষ্ট কথা বলে। ষাট বছর আগে রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশক নীতি বলে দিয়েছে যে, রাষ্ট্রের সমস্ত কাজকর্ম অসাম্য দূর করা এবং সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চালিত হতে হবে। কিন্তু তবুও, ভারতীয় রাষ্ট্র কেবল তার অসামরিক প্রশাসনকেই নয়, সমস্ত আধাসামরিক বাহিনী ও সামরিক বাহিনীর অর্ধেককে এমন একটা অসম ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য নিয়োজিত করেছে, যার অধীনে জনসংখ্যার বিরাট অংশ স্থায়ী দুর্ভিক্ষের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

ধরণের সম্পত্তির অধিকারকে (সাধারণ, গোষ্ঠীগত, রাষ্ট্রীয় ইত্যাদি) একান্ত ভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারে রূপান্তরিত করা; সাধারণ ভূমির ওপর মানুষের অধিকারকে খর্ব করা; শ্রমশক্তিকে পণ্যে পরিণত করা; এবং উৎপাদন ও ভোগের বিকল্প (দেশজ) পদ্ধতিগুলিকে খর্ব করা, প্রাকৃতিক সম্পদসহ সমস্ত সম্পদকে কুক্ষিগত করা,' ইত্যাদি ইত্যাদি। এই রাষ্ট্রভিত্তিক ব্যবস্থায় গিনি কোয়েফিশিয়েন্ট, যা দিয়ে অর্থনীতিতে বৈষম্য মাপা হয়, ১০ শতাংশ বেড়ে গেছে। এবং ১৯৯৪ থেকে ২০০৪-০৫-এর মধ্যে বৈষম্য আসলে এর থেকেও বেশি বেড়েছে, ঠিক যে সময় উৎসা পট্টনায়ক খাদ্যশস্য ভোগের পরিমাণ কমে যাওয়ার কথা বলেছেন।

এখন, ভারতের সংবিধান সমতার বিষয়ে খুবই স্পষ্ট কথা বলে। ষাট বছর আগে রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশক নীতি বলে দিয়েছে যে, রাষ্ট্রের সমস্ত কাজকর্ম অসাম্য দূর করা এবং সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চালিত হতে হবে। কিন্তু তবুও, ভারতীয় রাষ্ট্র কেবল তার অসামরিক প্রশাসনকেই নয়, সমস্ত আধা-সামরিক বাহিনী ও সামরিক বাহিনীর অর্ধেককে এমন একটা অসম ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য নিয়োজিত করেছে, যার অধীনে জনসংখ্যার বিরাট অংশ স্থায়ী দুর্ভিক্ষের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। যে জনগোষ্ঠীগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তারা যে এতদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পেরেছে তার কারণ জমি, জল, জঙ্গলের মতো সাধারণ মালিকানাধীন সম্পদগুলির ওপর তাদের অধিকার ছিল— যা ছিল আসলে এক বিশেষ সামাজিক ও বাস্তুতান্ত্রিক আশ্রয়স্থল। এখন যে সর্বব্যাপী উন্নয়নযজ্ঞ চলছে, তাতে তারা জীবনধারণের জন্য তাদের ওই সামান্য সম্বলটুকুও হারাবে। গণহত্যার অপরাধ নিবারণের জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের কনভেনশন পরিষ্কার ভাবে বলছে, সরাসরি হত্যার সঙ্গে 'কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠীর জীবনধারণ বিপন্ন করে তুলতে পারে এমন শারীরিক ও মানসিক ভাবে ক্ষতিকারক পরিস্থিতি সৃষ্টি করাও' গণহত্যার আওতায় পড়ে। গণহত্যার কথা বলতে গিয়ে চমস্কি এক সাম্প্রতিক লেখায় প্রাচীন গ্রিক ইতিহাসবিদ থুকিদিদেসকে উদ্ধৃত করে বলেছেন, 'এই পৃথিবীতে অধিকারের প্রশ্ন কেবল তাদের মধ্যেই উঠতে পারে, যারা ক্ষমতায় সমান-সমান। সবল সব সময়েই যা খুশি তাই করে যায় এবং দুর্বল কষ্টভোগ করে।' এটাই হলো বর্তমান আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার— এবং, আমাদের বলতেই হচ্ছে, জাতীয় ব্যবস্থারও মূল নীতি।

তার ফলে, এবং যেহেতু ভারতীয় রাষ্ট্র ৬০ বছর ধরে তার নিজের সংবিধানে থাকা সমতা-রক্ষার নির্দেশকে সাফল্যের সঙ্গে অগ্রাহ্য করে চলেছে, আমাদের এটা ভেবে অবাক হতে হয় যে, তারা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার স্বাস্থ্যের সামাজিক নির্ধারক সংক্রান্ত কমিশনের এই প্রাজ্ঞ পরামর্শকে কীভাবে নেবে : এক প্রজন্মের মধ্যে বৈষম্য কমিয়ে আনো, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মান উন্নত কর, ক্ষমতা, অর্থ ও সম্পদ বণ্টনের বৈষম্যের মোকাবিলা কর, সমস্যার পরিমাপ কর ও তাকে বোঝার চেষ্টা কর, এবং কাজকর্মের প্রভাবকে যাচাই কর। আমিই প্রথম বা একমাত্র ব্যক্তি নই, যার মনে এই সন্দেহ জেগেছে। এই কমিশন চলাকালীন ২০০৬ সালে *ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ হেলথ সায়েন্সেস*-এ ড. ডি ব্যানার্জি লিখেছিলেন :

> স্বাস্থ্যের সামাজিক নির্ধারক সংক্রান্ত কমিশন (সিএসডিএইচ) হলো সামাজিক নির্ধারকগুলিকে প্রভাবিত করতে পারে এমন কর্মসূচির মাধ্যমে স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বৈষম্যকে কমিয়ে আনার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাম্প্রতিকতম প্রচেষ্টা। সিএসডিএইচ লক্ষ্য করে নি যে, এ বিষয়ে অনেক কাজ ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে, আগেকার কাজগুলি কেন প্রত্যাশিত ফল দিতে পারেনি তা বিশ্লেষণ করার যথেষ্ট চেষ্টা করেনি, এবং মনে হয় না যে, এমন কোনো দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পেরেছে যা এবারে বেশি সাফল্য নিশ্চিত করতে পারবে। সিএসডিএইচ চায় আগেকার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ম্যাক্রো-ইকনমিক্স ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কমিশনের কাজের পরিপূরক কাজ করতে, যা আশানুরূপ প্রভাব ফেলেনি, এবং এটা পরিষ্কার নয় যে কীভাবে আগেকার কাজের পরিপূরণ করবে, যার মধ্যে বড় ত্রুটি রয়ে গেছে।
>
> মনে হয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই ধরণের কর্মসূচি এবং সেগুলির চূড়ান্ত ব্যর্থতার জন্য তার প্রধান অর্থ সাহায্যকারীদের কাছেই মূলত দায়বদ্ধ, দুনিয়ার গরিব মানুষদের কাছে নয়। ব্যাপক জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা না থাকার ফলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কাজকর্মের গণতান্ত্রিক চরিত্র নিয়েই একটা বড় সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এখনই এ-ব্যাপারে কিছু করা দরকার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে সেই পথে ফিরিয়ে আনতে হবে যাতে তা তার সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী এবং তার দেওয়া স্বাস্থ্যের সেই বিখ্যাত সংজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কাজ করতে পারে, যার কথা তার প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল হাল্‌ফডান মালার সম্প্রতি আবার বলেছেন। একে হতে হবে যারা এই সংস্থাকে তাদের সংকীর্ণ শ্রেণিস্বার্থে ব্যবহার করছে, তাদের হাত থেকে পৃথিবীর অবহেলিত মানুষদের অধিকারকে ছিনিয়ে আনার এক রাজনৈতিক সংগ্রাম।

আমি দুটো উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চাই কীভাবে আমাদের এই ব্যবস্থাটা স্বাস্থ্যের সামাজিক নির্ধারকগুলি সম্পর্কে সম্ভাব্য কর্মসূচিকে কীভাবে দেখেছে, এবং তার পর এই কমিশনের সুপারিশগুলিকে ঝাড়াই বাছাই করার দিকে এগোব।

তাহলে, আমরা যাকে স্বাস্থ্যের সামাজিক নির্ধারক সম্পর্কিত কর্মসূচি বলতে চাই, সে ব্যাপারে রাষ্ট্র কী করছে?

ভারতের বৃহত্তম মানবাধিকার সংগঠন, পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ বা পিইউসিএল-এর একজন বহুদিনকার সদস্য হিসাবে, আমি খাদ্যের অধিকার আন্দোলনে পিইউসিএল-এর অংশগ্রহণ নিয়ে গর্বিত, যা হলো ভারতের সমস্ত নাগরিকদের ভর্তুকি দেওয়া দামে

ন্যুনতম পরিমাণ খাদ্যশস্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার জন্য একটি আন্দোলন। এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১০ বছরেরও বেশি আগে, সুপ্রিম কোর্টে পিইউসিএল-এর একটি জনস্বার্থ মামলার মাধ্যমে। মামলাটা এখনও চলছে, কিন্তু এর মধ্যে সময় সময় আদালত যে বিভিন্ন অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ দিয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে আমাদের গণবন্টন ব্যবস্থার বর্তমান কাঠামোর অনেকটাই দাঁড়িয়ে আছে। বলাই বাহুল্য, খাদ্যের অধিকার আন্দোলন গণবন্টন ব্যবস্থার যে আরও উন্নতি দরকার সে বিষয়ে পুরোমাত্রায় সচেতন, এবং এ-বছর অগাস্ট মাসে রাউরকেল্লায় খাদ্যের অধিকার কনভেনশনে যে-সব দাবি তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে আছে একটি সর্বজনীন গণবন্টন ব্যবস্থা (এখনকার মতো লক্ষ্যনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নয়), এবং এই কর্মসূচির আওতায় প্রত্যেক সুবিধা প্রাপকের প্রাপ্য রেশনের পরিমাণ যথেষ্ট বাড়ানো এবং আরও নানারকম সামগ্রীকে এর ভেতর নিয়ে আসা। সম্প্রতি শ্রীমতি সোনিয়া গান্ধীর সভানেতৃত্বে জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদের সভায় প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ জঁ দ্রেজ এবং এই কর্মসূচিতে সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত কমিশনার হর্ষ মান্দার ও অন্যান্যরা এই সুপারিশগুলি উত্থাপন করেন।

গভীর হতাশার সঙ্গে আমরা দেখলাম, জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ তার এক সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে খাদ্যের অধিকার আন্দোলনের দাবিগুলি নাকচ করে দিয়েছে এই যুক্তিতে যে, তা মেটাবার মতো যথেষ্ট রসদ নেই। এখন এই দাবিগুলির সমর্থনে এক দীর্ঘকালীন গণআন্দোলনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। ... ... আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, খাদ্যের অধিকার আন্দোলনের দাবিগুলির সমর্থনে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য উদ্যোগ নিন।

আমি দ্বিতীয় যে উদাহরণটা দিতে চাই তার বিষয় হলো যক্ষ্মা— বরং বলা ভালো যক্ষ্মা ও অপুষ্টির সম্পর্ক। যে দেশে প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার ৩৩ শতাংশের দেহভর সূচক ১৮.৫ এর কম, এবং যেখানে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক-ষষ্ঠাংশ মানুষের বাস সেখানে এক-তৃতীয়াংশই যক্ষ্মা রোগী, তাহলে এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে অপুষ্টি ও যক্ষ্মার দ্বিমুখী সম্পর্ক নিয়ে চুলচেরা গবেষণা হবে। কিন্তু তা হলো না। সারা পৃথিবীর মধ্যে যক্ষ্মার দরুণ রোগগ্রস্ততা, মৃত্যুর সম্ভাবনা এবং ওষুধ প্রতিরোধ গড়ে ওঠার ঘটনার সিংহভাগই ঘটে ভারতে। প্রায় ৪৫ লক্ষ ভারতীয় যক্ষ্মায় ভুগছেন বলে অনুমান। বছরে ৮৭,০০০ মানুষ ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মায় আক্রান্ত হন এবং ৩,৭০,০০০ মানুষের মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখা দেয়।

□□ গণহত্যার অপরাধ নিবারণের জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের কনভেনশন পরিষ্কার ভাবে বলছে, সরাসরি হত্যার সঙ্গে 'কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠীর জীবনধারণ বিপন্ন করে তুলতে পারে এমন শারীরিক ও মানসিক ভাবে ক্ষতিকারক পরিস্থিতি সৃষ্টি করাও' গণহত্যার আওতায় পড়ে। ...চমস্কি এক সাম্প্রতিক লেখায় প্রাচীন গ্রিক ইতিহাসবিদ থুকিদিদেসকে উদ্ধৃত করে বলেছেন, 'এই পৃথিবীতে অধিকারের প্রশ্ন কেবল তাদের মধ্যেই উঠতে পারে, যারা ক্ষমতায় সমান-সমান। সবল সবসময়েই যা খুশি তাই করে যায় এবং দুর্বল কষ্টভোগ করে।' এটাই হলো বর্তমান আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার—এবং, আমাদের বলতেই হচ্ছে, জাতীয় ব্যবস্থারও মূল নীতি।

কিন্তু তবুও, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে একটি সাম্প্রতিক পর্যালোচনায়, যা যক্ষ্মা এবং দেহভর সূচকের মধ্যে সুনির্দিষ্ট লগ-লিনিয়ার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করেছে, ভারত থেকে একটি গবেষণাও অন্তর্ভুক্ত করতে পারেনি। একই ভাবে, সক্রিয় যক্ষ্মার জন্য চিকিৎসাধীন লোকেদের ক্ষেত্রে পুষ্টি পরিপূরক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংক্রান্ত বক্রেন-এর এক পর্যালোচনায়ও কোনো ভারতীয় গবেষণাকে তার আওতায় আনেন নি। কিন্তু আমি এমন দুটি গবেষণার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যা এই পর্যালোচনাগুলির একটিতেও স্থান পায়নি— প্রথমটি গর্বের এবং দ্বিতীয়টি লজ্জার সঙ্গে।

প্রথম গবেষণাটি করেছেন আমার জনস্বাস্থ্য সহযোগ-এর সহকর্মীরা—এটি একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যা মধ্যভারতের ৫৩টি অরণ্য-সংলগ্ন গ্রামে এক জনস্বাস্থ্য প্রকল্প চালায়। তাঁরা ফুসফুসে যক্ষ্মাগ্রস্ত ১৭৫ জন রোগীর পুষ্টিগত পরিস্থিতি সম্পর্কে এক সমীক্ষা করেছেন, যা ভারতে এই ধরণের সবচেয়ে বড় গবেষণা এবং এখনও পর্যন্ত যা কোথাও প্রকাশিত হয়নি। তারা বলছেন যে, গ্রামীণ মধ্য ভারতে ফুসফুসে সক্রিয় যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগীদের মধ্যে প্রধান পুষ্টি-উপাদানের অভাব, অর্থাৎ অনাহার, এক প্রায় সর্বজনীন ঘটনা। তাদের পাঁচ শতাংশেরও কম মানুষের ওজন ঠিকঠাক মাত্রার মধ্যে রয়েছে। কিছু জনগোষ্ঠীর, যেমন তপশিলি উপজাতিদের এবং মেয়েদের অবস্থা আরও খারাপ, তাদের অপুষ্টির মাত্রা আরও ভয়াবহ। বেশির ভাগ রোগীদের মধ্যেই দীর্ঘকালীন অপুষ্টির কারণে বয়সের তুলনায় কম উচ্চতা (বামনত্ব) দেখা যাচ্ছে। তাঁরা সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, 'এই প্রতিবেদন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় অপুষ্টি ও যক্ষ্মা, এই দুই মহামারীর মধ্যে কী নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এর ফল হলো একদিকে ব্যাপক ভাবে রোগ ছড়িয়ে পড়া, অন্যদিকে বিপুল অপচয়, যে দুটি পৃথক বা যৌথভাবে মৃত্যুহার বাড়িয়ে তুলতে পারে। গরিব যক্ষ্মারোগীদের পুষ্টির চাহিদা মেটানো বৈজ্ঞানিক, নৈতিক ও মানসিক দিক দিয়ে আশু প্রয়োজন।'

যাইহোক, ১৯৬২ সালে তৈরি করা জাতীয় যক্ষ্মা নিবারণ কর্মসূচির মৌলিক ভিত্তি এই 'আশু প্রয়োজন'-এর বিশেষ ভাবে বিরোধিতা করেছে। এই মৌলিক ভিত্তি বর্তমান কর্মসূচিতে অটুট আছে। কী প্রমাণের ওপর দাঁড়িয়ে এই বিরোধিতা করা হয়েছিল?

এখানে আমি দ্বিতীয় গবেষণাটির কথায় চলে আসছি, যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬১ সালে *বুলেটিন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন*-এ। সক্রিয় যক্ষ্মা রোগের জন্য চিকিৎসাধীন মানুষদের ওপর পুষ্টি-পরিপূরকের প্রভাব নিয়ে বাক্রেন-এর সাম্প্রতিক সমীক্ষা এই গবেষণাপত্রটিকে বাদ দিয়েছে এই যুক্তিতে যে, '[নিরীক্ষিত] গোষ্ঠীগুলিকে খাদ্যগ্রহণের বিভিন্নতা অনুসারে [পরিসংখ্যানের রীতি অনুযায়ী] এলোমেলো ভাবে সাজানো হয়নি।' এই গবেষণাটি করা হয়েছিল গুইনডির ম্যাড্রাস কেমোথেরাপি সেন্টারে। আমি এই গবেষণালব্ধ তথ্যের একটা নির্যাস আপনাদের সামনে হাজির করতে চাই।

ফুসফুসে যক্ষ্মাগ্রস্ত ১৫৭ জন রোগীকে নিয়ে একটি গবেষণা চালানো হয়, যাদের এক বছরের জন্য আইসোনিয়াজিড লীস পিএএস দিয়ে বাড়িতে ও

স্যানাটোরিয়ামে একই ভাবে নিয়ন্ত্রিত তুলনামূলক চিকিৎসা করা হয়। এই রোগীরা এসেছিল সমাজের দরিদ্র অংশ থেকে, যারা থাকত মাদ্রাজ শহরের এক ঘিঞ্জি এলাকায়। চিকিৎসার আগে ও চিকিৎসা চলাকালীন বাড়িতে ও স্যানাটোরিয়ামে থাকা রোগীদের খাদ্য তুলনা করে দেখা হয়, এবং যক্ষ্মা রোগের জীবাণু প্রমাণিত হওয়ায় খাদ্যের ভূমিকা যাচাই করা হয়। চিকিৎসা শুরু হওয়ার আগে দুই শ্রেণির রোগীদেরই খাদ্য ছিল একই রকম নিম্নমানের।

চিকিৎসার প্রথম মাসগুলিতে দুই শ্রেণির রোগীদেরই খাদ্যগ্রহণ বেড়ে যায়। যদিও, স্যানাটোরিয়ামের রোগীরা সারা বছর স্পষ্টতই মোট ক্যালোরি, স্নেহজাতীয় পদার্থ, মোট প্রোটিন ও পশুজাত প্রোটিন, ফসফরাস ও একাধিক ভিটামিনের দিক থেকে উন্নতমানের খাদ্য পায়।

বাড়িতে থাকা রোগীরা চিকিৎসা চলাকালীন স্যানাটোরিয়ামের রোগীদের থেকে বেশি কায়িক শ্রম করে, যা তাদের খাদ্যের দিক থেকে পিছিয়ে পড়া অবস্থাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। বারো মাসে তাদের ওজন বাড়ে গড়ে ১০.৮ পাউন্ড, যেখানে স্যানাটোরিয়ামের রোগীদের ওজন বাড়ে ১৯.৮ পাউন্ড। স্যানাটোরিয়ামের রোগীদের এই বেশি ওজন বাড়ার অর্থ অবশ্য এটা নয় যে, তাদের চিকিৎসার ভালো ফল হয়েছে। এক্স-রে রিপোর্ট এবং সংক্রমণগত পরিস্থিতির উন্নতির মাপকাঠিতে, চিকিৎসায় সাড়া দেওয়ার সঙ্গে বাড়ি বা স্যানাটোরিয়ামের রোগীদের খাদ্যের মানের সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, খাদ্যসংক্রান্ত যে সমস্ত বিষয় দেখা হয়েছে তার মধ্যে কোনোটিই এক বছর ধরে জীবানুনাশক ওষুধের একটি কার্যকর মিশ্রণ দ্বারা চিকিৎসা করা হচ্ছে, এমন যক্ষ্মা রোগীদের রোগ প্রশমনের পর্যায়ে পৌঁছোবার পেছনে কোনো প্রভাব ফেলতে পেরেছে বলে মনে হয় না। সুতরাং বাড়িতে রোগীদের চিকিৎসার প্রারম্ভিক সাফল্য পাওয়া সম্ভব হয়েছে, যদি তাদের খাদ্যের মান নীচের দিকে হয়, তাও।

এরকম একটা দুর্বল গবেষণা যে গুরুত্বপূর্ণ একটা কর্মসূচির গঠন নির্ধারণে এত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে, তাতেই বোঝা যায় এই ধরণের বিষয়ে রাজনীতি কীভাবে প্রমাণের থেকে বড় হয়ে দাঁড়ায়।

তাই আমার মনে হয় যে, আমি আপনাদের বোঝাতে পেরেছি, সমতা ও ন্যায়বিচারের জন্য জনগণের দাবি থেকে সেগুলিকে শাসনভঙ্গির অন্তর্ভুক্ত করার সহজ উত্তরণের কোনো ধারণা যদি আমাদের থেকে থাকে, তবে তা দিবাস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। সমতা ও ন্যায়বিচারের মতো সব ধারণার থেকে অনেক বেশি অনমনীয়, কঠোর বিচার-বিবেচনা দিয়ে ঠিক হয় শাসনভঙ্গি।

তাহলে আমরা কি এই সিদ্ধান্তে আসব যে, স্বাস্থ্যের সামাজিক নির্ধারক সংক্রান্ত কমিশন অর্থহীন? আমরা কি তার গোটাটাই ছুড়ে ফেলে দেব?

আমি বলব যে, এই প্রশ্নের উত্তরটা খুঁজতে হবে, আমাদের অনেকেই যে গণ-আন্দোলনের জগৎ থেকে উঠে এসেছি, তার মধ্যে। ... ডেভিড লেগ আন্দোলনের শ্রেণিবিভাগ নিয়ে যে আলোচনা করেছেন তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। শাসনভঙ্গিতে যদি কোনো পরিবর্তন আমরা আনতে পারি তবে তা হবে কেবল একটা উপরি পাওনা। আমাদের আসল চেষ্টাটা হবে স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য পরিষেবার সত্যিকারের সামাজিক নির্ধারকগুলি সম্পর্কে জনচেতনা জাগ্রত করা। আমরা যদি নজরটা সেদিকে সরাতে পারি, তবে পরিবর্তনের পরিবেশও আরও ভালোভাবে তৈরি হবে।

নয়া-উদারনীতিবাদ, যা এই তত্ত্বের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে যে, অর্থনৈতিক বৃদ্ধি সব সমস্যার সমাধান করতে পারে, তা আজ ছড়ি ঘোরালেও তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। সমাজের ওপর বাজারের রাজ চালানোর তত্ত্ব ও প্রয়োগের হাতিয়ার এই নয়া উদারনীতিবাদের প্রভুত্ব গুরুতর আঘাত পেয়েছে। স্বাস্থ্যের জন্য এবং স্বাস্থ্যগত অসাম্যের মোকাবিলার জন্য শ্রেণি-সক্রিয়তা ও শ্রেণি-রাজনীতি অত্যন্ত জরুরি, কারণ প্রগতিশীল সামাজিক ও শ্রেণি আন্দোলন ও দলগুলিই হলো সেই চালিকাশক্তি, যা মানুষের অবস্থাকে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারে।

উল্লেখ সূত্র :

- ডি ব্যানার্জি, 'সিরিয়াস ক্রাইসিস ইন দা প্র্যাকটিস অফ ইন্টারন্যাশনাল হেলথ বাই দ্য ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন : দা কমিশন অন সোশাল ডিটারমিন্যান্টস অফ হেলথ', *ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ হেলথ সায়েন্সেস*, ২০০৬, ৩৬ : ৪, ৬৩৭-৫০।
- ১৯ ডিসেম্বর ২০১০, থার্ড ন্যাশনাল বায়োএথিকস কনফারেন্স-এ দেওয়া কীনোট ভাষণের ভিত্তিতে লিখিত।

এখন **দুর্বার ভাবনা** পাওয়া যাচ্ছে

- শিলিগুড়িতে বুকস
- কুচবিহারে পার্থ লাহিড়ী, এইচ এন রোড
- নবদ্বীপের পোড়ামাতলায় সুজয়া প্রকাশনী
- পশ্চিম মেদিনীপুরে ভূর্জপত্র (বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি রোড)
- শান্তিনিকেতনে সুবর্ণরেখা

কলকাতায়

হাওড়া স্টেশন (কলকাতা বাসস্ট্যান্ড, হাওড়া বাসস্ট্যান্ড)

শিয়ালদহ স্টেশন (শানসাইন বুকস্টল, রামকৃষ্ণ পুস্তকালয় ও অন্যত্র)

কলেজ স্ট্রিট (পাতিরাম, বুকমার্ক, মণীষা গ্রন্থালয়, বইচিত্র ও অন্যত্র)

রাসবিহারী মোড়, ফুলবাগান (বেলেঘাটা), হাতিবাগান,

শ্যামবাজার (পাঁচমাথার মোড়)

ঢাকুরিয়া (দক্ষিণাপণের বিপরীতে বই কল্প [দোতলায়])

বিধাননগর (উল্টোডাঙা) স্টেশন ও অন্যত্র

যারা পত্রিকার এজেন্সি নিতে চান সরাসরি আমাদের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

অথবা ফোন করুন ০৮৪২০ ০৬৬৫৯৪ অথবা ০৩৩ ২৫৪৩ ৭৫৬০

দরিদ্র মানুষের রোগ ও তার চিকিৎসা: একটি সমীক্ষা প্রতিবেদন

অরণি চট্টোপাধ্যায়

ভারতের মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের মাত্র ৪ শতাংশ স্বাস্থ্যখাতে খরচ হয়। তার মধ্যে সরকারের (কেন্দ্রীয়, রাজ্য, স্থানীয় সরকার) ১ শতাংশ আর বাকি ৩ শতাংশ আসে বেসরকারি ও অন্যান্য সূত্র থেকে। কোনো পরিবারের স্বাস্থ্যের পেছনে যা খরচ হয় তার শতকরা ২০ শতাংশ আসে সরকারের কাছ থেকে আর ৭০ শতাংশ পরিবারের নিজেকে জোগাড় করতে হয়, যার বেশির ভাগটাই জোগাড় হয় ধার দেনা বা নিজেদের সম্পত্তি বেচে। সংখ্যালঘু সংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের স্বাস্থ্যখাতে যে খরচ হয় তার বেশির ভাগটাই ফেরৎ পায় মালিকের কাছ থেকে। তবে যে কোনো একটি সাধারণ পরিবারের বাজেট বহির্ভূত খরচের ধাক্কা সামলাতে গেলে চাপটা পড়ে মূলত তার পরিবারের ওপরেই। অনেকেই তাই এই চাপে পড়ে স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়টিকেই হয় সম্পূর্ণ ছেঁটে ফেলে নয়তো কোনো গুরুত্বই দেয় না। তার পরও যারা চিকিৎসার কারণে সাধ্যাতীত অর্থাৎ আয়ের তুলনায় অনেক বেশি খরচ করতে বাধ্য হয় তাদের পড়তে হয় এক ভয়াবহ দুর্দশার মধ্যে।

রোগ-চিকিৎসার প্রকোপের ফলে জীবনযাত্রার মানে যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় বিশেষত অত্যন্ত দরিদ্র শ্রেণির মানুষ জনের মধ্যে, সাম্প্রতিক কালে সে ব্যাপারে বহু ধরণের গবেষণা হয়েছে। স্বাস্থ্যখাতে খরচের প্রতিক্রিয়াকে স্বীকার করে নিয়ে এবং এই অবস্থা মোকাবিলার জন্য যে প্রথম পদক্ষেপটি সরকারের তরফ থেকে নেওয়া হয়েছে তাহলো রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যবিমা যোজনা। ২০০৭-এর অক্টোবরে চালু হওয়া এই স্কিমটির কাজ শুরু হয়েছে এপ্রিল ২০০৮-এ। এই স্কিমে বলা হয়েছিল, পরের পাঁচ বছরে অসংগঠিত ক্ষেত্রে যুক্ত দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা সমস্ত পরিবারকে সর্বোচ্চ ৩০,০০০ টাকা স্বাস্থ্যবিমার আওতায় আনা হয়েছে। তার জন্যে কোনো অর্থ তাদের ব্যয় করতে হবে না। তাদের দেওয়া হবে একটি স্মার্ট কার্ড। সমস্ত দেশের ৬০০টি জেলার মোটামুটি ৬ কোটি দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করা শ্রমিক পরিবারের মধ্যে এই পরিষেবা দফায় দফায় ছড়িয়ে দেওয়া হবে। ৩১ মে ২০১১ পর্যন্ত ২৫টি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলে ২.৩৪ কোটি স্মার্ট কার্ড বিলি করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনার শুরুর উদ্যোগে এখনও পর্যন্ত এইটুকুই সাফল্য।

অন্যান্য বেশির ভাগ বিমা স্কিমের মতোই এই কর্মসূচিতে ঘোষিত পরিষেবা হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা পাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। যদিও হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসার খরচ অনেক বেশি হাসপাতালে ভর্তি না হয়ে চিকিৎসার তুলনায় এবং এতে সাধারণ ভাবে স্বাস্থ্যের সমস্যা আরো বড় আকার ধারণ করে। অস্বাস্থ্য সম্পর্কে ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভের সাম্প্রতিকতম সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে যে, বেশির ভাগ লোকজন চিকিৎসার ক্ষেত্রে বেসরকারি পরিষেবাকেই অনেক বেশি পছন্দ করে, যেহেতু একজন বাইরের রোগী হিসেবে, সরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসা পাওয়ার জন্যে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। ভারতের শহুরে অস্থায়ী কর্মজীবী পরিবারের মধ্যে (প্রস্তাবিত রাষ্ট্রীয় বিমা যোজনা স্কিমে যাদেরকে অন্যতম সুবিধাভোগী হিসেবে ধরা হয়েছে) ৬৫ শতাংশই হাসপাতালে না গেলেও চলে এমন রোগের ক্ষেত্রে বেসরকারি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়।

স্বাস্থ্যরক্ষার খাতে হঠাৎ খরচ করতে হলে প্রায়শই যে কোনো পরিবারের অন্যান্য খরচের ওপর বড় ধরণের প্রভাব পড়ে। একটি পরিবারের কেউ যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন সেই পরিবারের লোকেরা কতকগুলি বাড়তি খরচের সম্মুখীন হয় (যেমন চিকিৎসার খরচ, রোগীকে নিয়ে যাওয়া নিয়ে আসার খরচ, রোগীর সহায়তাকারী রাখার খরচ ইত্যাদি) যা ওই পরিবারকে মেটাতে হয় তার ওই একই আয়ের মধ্যে থেকে। ফলে অন্যান্য খরচগুলি তাকে কাটছাঁট করতে হয়। আর যখন সাধ্যাতীত খরচ করতে হয় অর্থাৎ ধার দেনা বা পারিবারিক সম্পদ বেচে দিয়ে তখন ওই পরিবারের জীবনযাত্রার মান ক্রমেই নীচের দিকে নামাতে থাকে। ফলে কখনও কখনও প্রবল দারিদ্র্যের কবলেও পড়তে হয়।

ভারতে করা বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে, স্বাস্থ্যরক্ষার খাতে গড় খরচ অবশ্যম্ভাবী ভাবে বেড়েছে কোনো পরিবারের মাসিক জনপ্রতি আয় বা ভোগ্য খরচের সঙ্গে সঙ্গে। অবশ্য ধনীদের ক্ষেত্রে পরিবারের সামগ্রিক সম্পদের তুলনায় চিকিৎসাখাতে খরচের অংশ অনেক কম। অসুস্থতাজনিত দুর্দশার প্রাদুর্ভাব নিয়ে ভারতে বহু গবেষণা হয়েছে। রাজস্থানের ৩৫টি গ্রাম নিয়ে করা এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, এখানকার মানুষের ৮৫ শতাংশেরই দারিদ্র্যের কবলে পড়ার অন্যতম কারণ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার খরচ। এই গ্রামে বাস করা মোট পরিবারগুলির অর্ধেক থেকে দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ

দারিদ্র্যের কবলে পড়েছে রুগ্ন-স্বাস্থ্য এবং সেই স্বাস্থ্যের কারণে ব্যয়িত অর্থের জন্য।

রাজস্থানেই করা আরও একটি বিস্তারিত সমীক্ষা থেকে জানা যায়, রোগ সংক্রান্ত দুর্বিপাক থেকে উদ্ধার পেতে এমনকি নিম্নমানের বা কখনও কখনও ক্ষতিকর চিকিৎসা পরিষেবাও দরিদ্র মানুষ কিনতে বাধ্য হয়। ১৯৯৯-২০০০ সালে ৩ কোটি ৭০ লক্ষেরও বেশি মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে চলে গেছে শুধুমাত্র এই আয়ের তুলনায় অনেক বেশি খরচ করে চিকিৎসা পরিষেবা কেনার জন্যে। আর যারা আগেই দারিদ্রসীমার নীচে ছিলেন তারা? তারা আরও দারিদ্র্য— এককথায় বলা যায় ভিখারিতে পর্যবসিত হয়েছেন।

ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে অর্গানাইজেশনের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে, তুলনায় সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় দেখানো হয়েছে, ২০০৪ সালে চিকিৎসার জন্য সাধ্যের বাইরে বেরিয়ে খরচ করার (অর্থাৎ ধার এবং তারপর তা মেটাতে আবার ধার, বিভিন্ন জনের কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে জোগাড় করা অনুদান, সম্পত্তি-ঘটিবাটি বিক্রি ইত্যাদি) কারণে ৬ কোটি ৩২ লক্ষ ব্যক্তি বা ১ কোটি ১৯ লক্ষ পরিবার আরো গভীর দারিদ্র্যের কবলে পড়েছে।

এই চালচিত্রের ওপর দাঁড়িয়ে, ২০০৮-এর মে-জুন মাসে দক্ষিণ দিল্লির ১৫০টি বস্তিবাসী পরিবারের মধ্যে একটি সমীক্ষা চালানো হয়। সমীক্ষা তাদেরই ওপর করা হয়েছে যারা মনে করে বলতে পারেন, বিগত বছরগুলির মধ্যে কোনো একটি রোগের কারণে তারা চিকিৎসিত হয়েছেন।

দিল্লির বসন্তবিহারের কুলি ক্যাম্পের অ-নোটিফায়েড ঝুগ্গি-ঝোপড়ি বস্তি গড়ে উঠেছিল দিল্লি ডেভলপমেন্ট অথরিটির জমিতে। বস্তিতে প্রায় ৩৫০টি পরিবার বাস করে যারা বেশির ভাগ এসেছে উত্তর প্রদেশ, রাজস্থানের মতো প্রতিবেশী রাজ্য থেকে। বাণিজ্যিক এলাকার বর্জ্য তরল ও বস্তির ব্যবহৃত জল বহনকারী এক বড় নোংরা নালার ধার ঘেঁসে এই বস্তির অবস্থান। গোটা বস্তিতে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ করে মাত্র দুটো কল। সেই কলে আবার জল আসার সময়ের কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে আছে এই অঞ্চলে জলের ট্যাংকারে জোগান দেওয়া জল। এই জলের গাড়ি বস্তির কাছাকাছি যেখানে এসে দাঁড়ায় সেটাও যথেষ্ট দূরে এবং আসেও খুবই অসময়ে, বিশেষত তখন বাড়িতে কোনো পুরুষ মানুষ থাকে না, তারা থাকে কর্মক্ষেত্রে, আর মেয়েদের পক্ষে প্রায়শই সেই জল সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ে কারণ জেরি-ক্যান ভর্তি জল অত দূর থেকে বয়ে আনা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

বেশির ভাগ ঝুগ্গির আয়তন মোটামুটি দৈর্ঘ্যে ৬ ফুট আর প্রস্থে ৬ ফুট এবং কাঁচা। কোনো পায়খানা বা স্নানের ঘর নেই। এখানকার মানুষ সাধারণ ভাবে পাশের বনকেই পায়খানা হিসেবে ব্যবহার করে। কমিউনিটি টয়লেটে যা বানানো হয়েছিল তা কখনওই কাজ করে না পর্যাপ্ত জলের অভাবে। ঝোপড়ির নোংরা জল বেরোনোর নালা অবশ্যই কাঁচা আর খোলা। একমাত্র আশার কথা, এখানে বিদ্যুৎ আছে প্রায় সব ঘরেই তবে মিটারের অতিরিক্ত অর্থ ওঠার একটা অভিযোগ এখানকার বেশির ভাগ মানুষের কাছে প্রায়শই শোনা যায়। কাছাকাছি বেসরকারি হাসপাতাল, ডাক্তার বা ওষুধের দোকানের দূরত্ব দেড় কিলোমিটার। তুলনায় সরকারি হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র এখান থেকে অনেকটাই দূরে অবস্থিত।

বসন্ত কুঞ্জর কাছে দিল্লির বিপদসংকুল 'রিজ এরিয়া'র ধ্বংসাবশেষের পাশেই অবস্থিত কুসুমপুর পাহাড়ি হলো অনেকগুলি বস্তির সমাহার। অজপাড়াগাঁর মতো তার চেহারা-চরিত্র। জনসংখ্যা ২০,০০০ এর বেশি। অধিবসতিরা অনেক বেশি বৈচিত্র্যশালী বিশেষত কুলি ক্যাম্পের থেকে, যেহেতু তারা এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রাপ্তির ব্যাপারেও যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান যেমন জল সরবরাহ। এছাড়াও রাজনৈতিক কারণ, অর্থনৈতিক অবস্থা বা স্থায়ী বসবাসের ক্ষেত্র হিসেবে আরও বড় একটি পার্থক্য গড়ে দিয়েছে বিশেষত কুলি ক্যাম্পের থেকে। এখানে একটা পাকা সড়ক আছে যা দিয়ে জলের ট্যাঙ্কার সহ অন্যান্য মোটর গাড়ি ইত্যাদি যাতায়াত করতে পারে। তবে এখানকার বাড়িগুলিও কাঁচা ধরণের এবং কোনো পায়খানা বা স্নানঘর নেই। বস্তির মধ্যের সব নালাও কাঁচা ও ঢাকনাহীন। তবুও এই বস্তিটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অন্তত বিভিন্ন পরিষেবা যেমন ওষুধের দোকান, মুদির দোকান, স্টেশনারি দোকান, সোনার দোকান, চায়ের দোকান ইত্যাদির কথা ধরলে। এক অদ্ভুত ধরনের চিকিৎসা পরিষেবাও এখানে বর্তমান। বস্তির মধ্যে কতগুলো ডাক্তারখানা আছে। সেগুলো চালায় কিছু বাঙালি ডাক্তার। তারা পাশ করা বা রেজিস্টার্ড ডাক্তার নয়। তারা হাতুড়ে, ফলে তাদের নগদ-মূল্যও অন্যান্য পাশ-করা বা রেজিস্টার্ড ডাক্তারের তুলনায় অনেকটাই কম। অতিসম্প্রতি কিছু অ-সরকারি সংস্থা (এনজিও) এখানে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের একটা ব্যবস্থা করেছে।

দক্ষিণ দিল্লির দুটি বৃহৎ বড় জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস এবং সফরদরজং হসপিটাল। এখানে শুধু সারা ভারতের নয় এমনকি বিদেশ থেকেও রোগী আসে। ঘটনা এই যে, এই বস্তি থেকে এই দুটি হাসপাতালের দূরত্ব ৭-১০ কিলোমিটারের মধ্যে। তাহলেও এই হাসপাতালে খুব প্রয়োজন হলেও এখানকার কেউ বা কোনো রোগী যায় না। কারণটা সহজেই অনুমেয়, কোনো দরিদ্র বস্তিবাসীর পক্ষে জরুরিকালীন সময়েও এই হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া দুরাশার নামান্তর।

সমীক্ষার জন্যে দুটি বস্তিতেই যে সমস্ত পরিবারকে বাছা হয়েছিল তারা গড়ে মোটামুটি ১৮ বছর এখানে বসবাসে করছে। এবং প্রায় শতকরা ৯৫ ভাগ বাসিন্দাই বিভিন্ন গ্রামীণ অঞ্চল বিশেষত পাশাপাশি রাজ্যগুলি থেকে এখানে এসে বসবাস করছে। যাদের মধ্যে এই সমীক্ষা চালানো হয় তাদের মধ্যে ৩ শতাংশ শিশু (১ বছর বা তার কম বয়সী) ৬০ শতাংশের বয়স ১৬-৫৯ বছর এবং ৪.৫ শতাংশ ৬০ বছরেরও বেশি বয়সী। এছাড়া ৪৮ শতাংশ নারী। এই মোট ৪৮ শতাংশের মধ্যে ৪৯ শতাংশই বিবাহিত ৪ শতাংশ বিধবা অথবা স্বামী-বিচ্ছিন্না। প্রায় ৩০ শতাংশ নিরক্ষর। সাক্ষরদের মধ্যে বেশির ভাগই খুব বেশি দূর হলে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনার পর ছেড়ে দিয়েছে। আর্থিক অবস্থা বেশির ভাগেরই যথেষ্ট খারাপ। তবে বেশির ভাগ বাচ্চারাই স্কুলে যায়।

৮৭১ জন সমীক্ষাকৃত ব্যক্তির মধ্যে প্রায় ৩৫ শতাংশ (৩০৩ জন) তখনও কর্মরত, ৫৮ শতাংশ দিনমজুরির কাজ করে। মাত্র ১৪ শতাংশ মাস মাহিনার চাকুরে। আর বাকি ২৮ শতাংশ স্ব-নিযুক্ত প্রকল্পে যুক্ত। নমুনা পরিবারগুলির গড় মাসিক আয় ৪১০০ টাকা। ৩৮ শতাংশ মানুষ 'সরকারি ভাবেই দরিদ্র', তবে এই সব পরিবারের অবস্থা সচক্ষে দেখে এবং জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে খোঁজখবর করে জানা গেছে, 'সরকারি ভাবে দরিদ্র'-র গণনা এবং গণনার পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তোলার পক্ষে যথেষ্ট।

সাধারণ ভাবে এদের মধ্যে জ্বর, গ্যাসট্রো-

ইনটেস্টাইনাল রোগ এবং শ্বাসকষ্টজনিত রোগে (যার মধ্যে অ্যাজমার রোগীই বেশি) মোটামুটি ৬০ ভাগই নিয়মিতই ভোগে। নারীদের মধ্যে বেশির ভাগেরই রক্তাল্পতা ও সাধারণ দুর্বলতাই প্রধান। বেশির ভাগ বাসিন্দাই চিকিৎসার ব্যাপারে বেসরকারি ব্যবস্থাকেই কাজে লাগায়। প্রায় ৭৩ শতাংশ ক্ষেত্রে, সমীক্ষা করা মানুষরা রোগ নিরাময়ের জন্যে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়। সব থেকে ভয়াবহ ব্যাপার হলো এই যে, প্রায় ১৫ শতাংশ রোগীর ক্ষেত্রে দেখা গেছে, তারা যায় মূলত হাতুড়ে চিকিৎসকদের কাছ, যাদের না আছে যোগ্যতা, না কোনো ডাক্তারি সংক্রান্ত জ্ঞান। আর এই হাতুড়েদের 'বেঙ্গলি ডাক্তার' হিসেবেই সমধিক পরিচিত। এদের 'দাবাখানা' প্রায় সময়ই ভর্তি থাকে তাদের নগদমূল্য কম এবং স্থানীয় অঞ্চলে বসে বলেই। এইসব হাতুড়েদের যোগ্যতা যে কম সে-কথা জানা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রেই মরণাপন্ন রোগীর চিকিৎসার জন্যেও এখানকার মানুষজন এদের দ্বারস্থ হয়, যেহেতু তারা ডিগ্রিধারী বেশি ফিসওলা চিকিৎসকের চেয়ে অনেক কম পয়সায় রোগীর চিকিৎসা করে।

আরও একটা তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ এই সমীক্ষায় পাওয়া গেছে — মাত্র ১২ শতাংশ রোগী সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্যে গেছে। এই ধরণের রোগীর সঙ্গে সমীক্ষাকারীরা সরাসরি কথা বলে জেনেছেন, এর কারণ বহুবিধ। যেমন এই হাতুড়ে ডাক্তারদের কাছে গেলে সেই ব্যক্তির শ্রমদিবসটি নষ্ট হয় না; রোগী সরাসরি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে পারে; এছাড়া সরকারি হাসপাতালে গেলে সেখানকার কর্মচারীদের ঘুষ দিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে হয় না। স্থানীয় ডাক্তারের কাছে গেলে ওষুধপত্র বা যাতায়াতের খরচও লাগে না ইত্যাদি ইত্যাদি।

সমীক্ষায় যে ফলাফল পাওয়া গেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রায় ৩৯ শতাংশ পরিবার স্বাস্থ্যরক্ষার বা চিকিৎসার জন্যে যে পরিমাণ খরচ করতে সক্ষম তার চেয়ে ১৫ শতাংশ বেশি অর্থ খরচ করতে বাধ্য হয়। যেসব পরিবারের প্রধান রোজগেরে দিনমজুরি করে তাদের উপর এই অর্থনৈতিক ধাক্কাটা একটা বড় মাত্রা পায়। এখানে হজম সংক্রান্ত সমস্যা ও ফুসফুসঘটিত রোগ সমস্যাই অনেক বেশি। এর পরেই আছে অস্থিসংক্রান্ত সমস্যা। সাধারণ রোগ প্রায়ই ক্ষেত্রেই যা দেখা গেছে তাহলো সাধারণ জ্বর, এবং চক্ষু-কর্ণ সংক্রান্ত সমস্যা। যার জন্যে গড়ে খরচ হয় ২৫২.০০ টাকা। ঘটনা হলো এই যে, হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার ফলে এই খরচ দাঁড়ায় ৮০.০০ টাকা। আর এর থেকেই বোঝা যায় কেন এই শহুরে দরিদ্র মানুষেরা চিকিৎসার জন্যে হাতুড়ে ডাক্তারের দ্বারস্থ হয়। সরকারি চিকিৎসাখানায় বা রেজিস্ট্রিকৃত চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার খরচ আসলে হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার খরচের তুলনায় অনেকটাই বেশি।

এরপর আছে দুর্ঘটনা সংক্রান্ত চিকিৎসার খরচ—সাধ্যাতীত খরচের দৌড়ে যা তালিকার প্রথমের দিকেই আছে। এই ধরণের অসুস্থতায় সাধারণত একটি পরিবারের মাসে যে খরচ হয় তা তার আয়ের ১৯.২ শতাংশই খেয়ে নেয়। স্ত্রী-রোগ ও হজম সংক্রান্ত রোগের পরেই এর স্থান। এটা তাই আশ্চর্য নয় যে, জন্ম দানের আগে ও পরে বিভিন্ন ধরণের খরচ-সাপেক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে ওরা কেন এড়িয়ে যায় বা ওষুধ ব্যবহারে অনেক দেরি করে। পরিবারের একজন সদস্যের যক্ষ্মা, শ্বাসকষ্টজনিত রোগ (যার মধ্যে আছে অ্যাজমা) হজমসংক্রান্ত গোলমাল ও অন্যান্য সমস্যা থাকলে— তার চিকিৎসায় পরিবারের আয়ের প্রায় ১০ শতাংশই খরচ হয়ে যায়। এছাড়াও তালিকার বাইরে থাকা রোগের যেমন দুর্ঘটনায় আহত হওয়ার ফলেও যে যথেষ্ট বেশি খরচ করতে হয়, সে কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এটাও এখানে উল্লেখ করা জরুরি যে, দুর্ঘটনায় আহত হলে তার তাৎক্ষণিক চিকিৎসার প্রয়োজন হয় এবং সে কারণে এই সব ক্ষেত্রে চিকিৎসার খরচ অত্যন্ত বেশি এবং তার কোনো নির্দিষ্ট সীমা থাকে না। এমনকি খুবই সাধারণ ও আপাত নিরীহ অসুস্থতা যেমন সাধারণ ডায়েরিয়াও যে সাধারণ শহুরে দরিদ্র মানুষের পক্ষে অত্যন্ত খরচ-সাপেক্ষ হয়ে ওঠে তারও বহু বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে।

সমীক্ষায় চিকিৎসার কারণে সাধ্যাতীত বা পকেট বহির্ভূত খরচের মাত্রায় ব্যাপক বৈষম্য লক্ষ্য করা গেছে। রেজিস্টার্ড ডাক্তারের কাছে যারা চিকিৎসার জন্যে গেছে তাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে যে পারিবারিক খরচ তা অনেকটাই বেশি, এমনকি যারা সরকারি হাসপাতাল বা সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার জন্যে গেছে তারও দ্বিগুণ প্রায়। কিন্তু যারা বস্তির আশপাশের হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্যে গেছে, তাদের সাধ্যাতীত বা পকেট বহির্ভূত খরচ তুলনায় অনেক কম। আর্থিক দায়ের এই সম্ভাবনার দিক থেকেই দেখা যাচ্ছে, কেন দরিদ্র শহুরে মানুষরা আয়ের তুলনায় অনেক বেশি ব্যয় করতে হলেই নিম্নমানের চিকিৎসার দিকে ঝোঁকে— এমনকি তার পরবর্তী জীবনেও শারীরগত দিকটিকে অনেক বেশি ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করবে এ-কথা জেনেও।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :
এই রচনার সমস্ত তথ্যাদি নেওয়া হয়েছে *ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি* (অগাস্ট ১৩, ২০১১)-র শমীক চৌধুরী-র প্রবন্ধ 'ফিনানসিয়াল বার্ডেন অফ ট্রানসিয়েন্ট মরবিডিটি: আ কেস স্টাডি অফ স্লামস ইন দিল্লি'।

দুর্বার প্রকাশনী-র সংকলন গ্রন্থ

ভাঙে যেন

লেখক সূচি :
অম্লান দত্ত, শিবনারায়ণ রায়, প্রদীপ বক্সি, মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়, দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবাশিস বসু, মালা সিং, সাধনা মুখার্জী, ভারতী দে, মৃণালকান্তি দত্ত, স্মরজিৎ জানা ও অন্যান্যরা

যোগাযোগ :
দুর্বার প্রকাশনী
৪৪ বলরাম দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৬ ফোন : ০৩৩ ২৫৪৩ ৭৫৬০/৭৪৫১

হয়ে ওঠার উপাখ্যান : বেলুড় শ্রমজীবী হাসপাতাল

তরুণ বসু

প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি কিংবা প্রচারের ঢক্কানিনাদের বাইরে থেকে যারা নিরলস চিন্তা আর পরিশ্রম দিয়ে সাধারণ মানুষের উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছেন আমাদের মধ্যে অনেকেই সে সবের খবর রাখি না। এ রাজ্যে এমন বেশি কিছু সংগঠন দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের উন্নয়নকে লক্ষ্য রেখে নতুন পথের সন্ধানে পাড়ি দিয়েছিলেন একমাত্র তাদের অনেকেই নানান বাধা আর সমস্যাকে অতিক্রম করে ধীরে ধীরে হলেও অনেক মানুষের জীবনে আশার সঞ্চার করেছেন এইসব সংগঠন যারা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জীবনজীবিকা কিংবা পরিবেশ পরিবর্তনের লড়াইকে সামনে এগিয়ে দিয়েছেন, কিংবা উন্নয়নের রাস্তায় নতুন মাত্রা যোগ করেছেন আমরা ধারাবাহিকভাবে তাদের কথা ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই আমাদের পাতায় তুলে আনব। —স ম্পা দ ক

এখন যারা বার্ধক্যের দিকে যাচ্ছেন তাদেরও অনেকেরই মনে থাকতে পারে সত্তরের দশকের শেষ লগ্নে অথবা আশির দশকের গোড়ায় পশ্চিমবঙ্গে ভয়াবহ বিদ্যুৎ ছাঁটাই-এর কথা। এবং প্রায় সেই লগ্ন থেকেই একের পর এক শিল্প কারখানার বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনাও ঘটে চলছিল। ১৯৭৮ সালে ইন্দো-জাপান স্টিলস নামের কারখানাটিও এই ভাবে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর শ্রমিকরা দেখলেন সাধারণ মানুষের মধ্যে তার কোনো বিশেষ প্রতিক্রিয়া নেই। অথচ এই শ্রমিকরাই '৭৮-এর আগের দিনগুলোতে অর্থাৎ কারখানা বন্ধ হওয়ার আগে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে নানা সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেছেন। এসব তারা করতেন স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে যোগাযোগের সেতু, পাশে দাঁড়ানো কিংবা ভ্রাতৃত্ব বোধের জায়গা থেকেই। তবু কেন মানুষ শ্রমিকদের ওই দুর্দিনেও সে ভাবে তাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন না এই বিষয়টা নিয়ে তারা তখনই ভাবতে শুরু করেছিলেন। এরপর কারখানা আবার চালু হলো। শ্রমিকরাও নতুন পথের সন্ধান করতে লাগলেন।

অন্যদিকে, ১৯৮২-৮৪ সালে আপাত সংযোগহীন আর একটি ঘটনাও পাশপাশি ঘটছিল— জুনিয়র ডক্টরস মুভমেন্ট। এই আন্দোলনে জুনিয়র ডাক্তারদের একটা প্রধান দাবি ছিল : সব হাসপাতালে ২৪ ঘণ্টা এক্স-রে, ইসিজি, প্যাথলজিক্যাল টেস্ট ইত্যাদি চালু রাখতে হবে; ২৪ ঘণ্টা ওষুধ সরবরাহ করতে হবে যাতে জরুরি প্রয়োজনে চিকিৎসা করা যায়। এই আন্দোলনেও যথারীতি তৎকালীন শাসক দলের ভূমিকা ছিল বিরোধীর।

পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে শ্রমিকরা বুঝেছিলেন শুধু সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নয়, আরও অন্য কিছু দরকার। বিপুল দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব, চিকিৎসার প্রতিকূলতা ইত্যাদি যে দেশের বিরাট সংখ্যক মানুষের নিত্যসঙ্গী তাদের কাছে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের পরেই যার চাহিদা অত্যন্ত বেশি সে হলো চিকিৎসা-স্বাস্থ্য। জুনিয়র ডাক্তার আন্দালনে যুক্ত বহু মানবিক বোধসম্পন্ন সদ্য যুবক ডাক্তাররা জানতেন অনেকেরই কাছে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছোয় না। বুঝতেন, বহু দরিদ্র মানুষের হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা পরিষেবা নেওয়া, আর চাঁদে পৌঁছনো প্রায় সমান। তাই তাঁরাও চাইছিলেন, ওই সব মানুষদের জন্যে একটু চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে। দুই ভিন্ন মেরুর এই সমজাতীয় চাওয়াকে একত্রিত করার এক সূত্রহীন যোগাযোগ মিলিয়ে দিল ইন্দো-জাপান স্টিল ওয়ার্কারদের সঙ্গে জুনিয়র ডাক্তারদের সংগঠন পিপলস হেলথ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনকে। এক কথায় বললে, এই সময়ে এই যোগাযোগের ফল আমরা পাব শ্রমজীবী হাসপাতালের মতো এক বৃহৎ কর্মকাণ্ডকে।

শুরুতে ছিল 'শ্রমজীবী স্বাস্থ্য প্রকল্প'--- আউটডোর চিকিৎসা কেন্দ্র। স্থান বেলুড় খামারপাড়া জাগৃতি হিন্দী বিদ্যামন্দির। এই আউটডোর চিকিৎসা ছাড়াও শ্রমিকরা সে-সময় এলাকার জঞ্জাল সাফাই, পানাপুকুর পরিস্কার, রক্তদান শিবির, স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা ইত্যাদিও নিয়মিত ভাবে করে চলেছিলেন।

দশ বছর পর, ১ মার্চ ১৯৯৪, পাকাপাকি ভাবে গড়ে উঠল শ্রমজীবী হাসপাতাল। ইন্দো-জাপান স্টিলস মালিকের গ্রান্ড স্মিথি কারখানার একটি পরিত্যক্ত দোতলা বাড়িতে।

'গ্রান্ড স্মিথি দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় হানাবাড়ির চেহারা নিয়েছে। দরজা জানলা ভেঙে পড়েছে, দেওয়ালে বট অশত্থরা ঝুরি মেলেছে। মেঝেতে মাটি জমে তার ওপর আগাছা জন্মেছে। তার সঙ্গে রয়েছে ফাইলপত্তর, ভাঙাচোরা জিনিসের পাহাড় প্রমাণ জঙ্গল। শ্রমিকরা রাতারাতি সমস্ত কিছু পরিষ্কার করে মালিকের অনুমতি নিয়ে একতলায় চালু করে দেন সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ বহির্বিভাগ। ১৯৯৪-এর জুন মাসে হাওড়ার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের অনুমোদন মেলে এবং চার বেডের অন্তর্বিভাগ চালু হয়। মাত্র চল্লিশ হাজার টাকা পুঁজি করে একটা হাসপাতা গড়ার

সাহস দেখাল ইন্দো-জাপান স্টিলস এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের শ্রমিকরা। কিনে আনা হলো এগারোশো কেজি 'স্ক্র্যাপ' অর্থাৎ ভাঙা লোহা-লক্কড়, লোহার শিট, পাইপ ইত্যাদি। বন্ধু ডাক্তারদের সঙ্গে শ্রমিকরা গেলেন হাসপাতালে— অপারেশান টেবিল, ওটি ল্যাম্প দেখতে। ফিরে এসে বানিয়ে ফেললেন ওটি টেবিল, ওটি ল্যাম্প-স্ট্যান্ড। মোটর গাড়ির হেডলাইট দিয়ে বানানো হলো ওটি ল্যাম্প এবং গিয়ারের নীচের অংশটি কেটে বানানো হলো ল্যাম্পের রিভলভিং সিস্টেম। আবার যাওয়া হলো হাসপাতালে, ফিরে এসে বানানো হলো বিশেষ ধরণের ওটি টেবল।' ('এক আশ্চর্য হাসপাতালের গল্প', সব্যসাচী মিত্র, *শ্রমজীবী স্বাস্থ্য*, নভেম্বর ২০০৯।)

যারা দেখেছেন *থ্রি ইডিয়টস* সিনেমাটি, তাদের মনে থাকতে পারে জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালের চেহারা দেওয়ার এরকমই একটা ঘটনা ছিল। আর আমাদের এই কাহিনী— এক হাসপাতাল বানানোর।

বহু বছর যাবৎ 'বিপ্লবের হাতিয়ার' শ্রমিকদের মদ খেয়ে বউ-ছেলে-মেয়ে ঠ্যাঙানো আর শ্রমিক ইউনিয়ন সম্পর্কে মজুরি বৃদ্ধি বা হরতালের মতো তথাকথিত নেতিবাচক কিছু ধারণার বাইরে আমরা বেরতে পারিনি। আর ঠিক এই ধারণাটার উপর সমূলে কুঠারাঘাত করেছে ইন্দো-জাপান স্টিল-এর শ্রমিকরা, তাদের শ্রমিক ইউনিয়ন। যদিও সে ইউনিয়ন কোনো রাজনৈতিক দলের ছত্রচ্ছায়ায় লালিত ছিল না। শ্রমিকদের জেদ এবং গড়ার মানসিকতার তীব্রতায়, ১৯৯৬ সালে কারখানা বন্ধ হয়ে গেলেও হাসপাতাল বন্ধ হয়নি; বরং ১৯৯৭ পরবর্তী এই হাসপাতাল, স্বাস্থ্য-চিকিৎসায় এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করতে সক্ষম হয়েছিল। এমনকি পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য মানচিত্রেও উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিতে তার কোনো অসুবিধে হয় নি।

আজ এই ২০১১-য় শ্রমজীবী হাসপাতাল অবশ্যই চিকিৎসা পরিষেবা সরবরাহকারীদের মধ্যে অন্যতম একটি নাম, বিশেষত যে-দরিদ্র মানুষরা হাসপাতালে পৌঁছতে পারেন বা পৌছলেও প্রয়োজনীয় চিকিৎসাটুকু আদায় করতে পারেন না।

১৯৯৪ সালে মাত্র ৪টি বেড নিয়ে শুরুর হাসপাতালে আজ শতাধিক বেড। শ্রমজীবী হাসপাতালের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে ২০০5 সালে গড়ে তোলা 'হৃদয় ছুঁয়ে' প্রকল্প। মাত্র ২৫,০০০ টাকায় বাইপাস সার্জারি। যারা সেই অর্থটুকুও ব্যয় করতে পারেন না তারাও এই পরিষেবা পান— অবশ্যই বিনামূল্যে।

এ দেশে বহু বহু ধরণের কর্মযজ্ঞের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে। সরকারি উদ্যোগ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অল্প দৌড়ের পর মুখ থুবড়ে পড়ে আর বেসরকারি উদ্যোগগুলি লাভালাভের ঠিকানা খুঁজে নিয়ে ধনীর 'ড্রইং রুমে' হারিয়ে যায়। সেদিক থেকে শ্রমজীবী হাসপাতাল এক ব্যতিক্রমী উদাহরণ।

শ্রমজীবী হাসপাতালের কর্মকাণ্ডে শুধু শ্রমিকরা নয় আজ আরও বহু বহু মানুষ যুক্ত হয়েছেন। বহু মানুষ এগিয়ে এসেছেন, প্রয়োজনে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়েছেন কোনো লাভালাভের উদ্দেশ্য মাথায় না রেখে। আর এই মানব সম্পদই হয়ে উঠেছে এই হাসপাতালের সবচেয়ে বড় সম্পদ। তাই ১৯৯৭-এ যখন ইন্দো-জাপান স্টিলস-এর মালিক চক্রান্ত করে একে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করে তখন এর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন সমাজের বৃহত্তর অংশের মানুষ— আইনজীবী, মানবাধিকার কর্মী, সাংস্কৃতিক কর্মী, লেখক, সাংবাদিক সহ নানা ধরণের পেশাজীবী।

শ্রমজীবী হাসপাতালের নিয়মিত কর্মসূচির মধ্যে আছে স্বাস্থ্য এবং সামাজিক সচেতনতা সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদি; স্বাস্থ্য, চক্ষু, শিশু পরিচর্যা, পরিবার নিয়ন্ত্রণ, ক্যান্সার সচেতনতা, থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা, রক্তদান শিবির, রিভাইজড্ ন্যাশনাল টি.বি. কন্ট্রোল প্রোগ্রাম (RNTCP), ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ফর কন্ট্রোল অফ ব্লাইন্ডনেস (NPCB) ইত্যাদি। শ্রমজীবী স্বাস্থ্য প্রকল্প শুধু চিকিৎসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে চায়নি—বরং তারা সুস্বাস্থ্যের জন্যে যে চাই সুস্থ সমাজ, সুস্থ পরিবেশ তার লক্ষ্যেও নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। বিভিন্ন ধরণের মেলা, বিজ্ঞান এবং কু-সংস্কার বিরোধী নানান অনুষ্ঠান, লোক সাংস্কৃতি চর্চা ইত্যাদি নানা কর্মসূচি তারা পালন করেন নিয়মিতই।

মোবাইল হেলথ ইউনিটের সাহায্যে আজ দুর্গম গ্রামেও স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে পেরেছে শ্রমজীবী স্বাস্থ্য প্রকল্প। সরবেরিয়ায় সুন্দরবন শ্রমজীবী হাসপাতাল গড়ে তুলছে এলাকার মানুষকে সঙ্গে নিয়ে। জাতপাত-ধর্ম-আচার-বিচারের উর্দ্ধে উঠে সমষ্টি জীবনের এক অনন্য দৃষ্টান্ত ২৪ বেডের এই এই অতি প্রয়োজনীয় চিকিৎসা কেন্দ্র, এই অঞ্চলের মানুষের গর্ব।

□□ বহু বছর যাবৎ ... শ্রমিক ইউনিয়ন সম্পর্কে মজুরি বৃদ্ধি বা হরতালের মতো তথাকথিত নেতিবাচক কিছু ধারণার বাইরে আমরা বেরতে পারিনি। আর ঠিক এই ধারণাটার উপর সমূলে কুঠারাঘাত করেছে ইন্দো-জাপান স্টিল-এর শ্রমিকরা, তাদের শ্রমিক ইউনিয়ন।

শ্রমজীবী স্বাস্থ্য প্রকল্প পরিকল্পনা নিয়েছে আগামী দিনে রূপায়ণের জন্যে একগুচ্ছ প্রকল্প যার মধ্যে আছে একটি পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। যার বেড সংখ্যা হবে প্রায় ৫০০ এবং মেডিসিন, সার্জারি, ই.এন.টি, অর্থোপেডিক, বাইনোকলজি, পেডিয়াট্রিক ডার্মাটোলজি, গ্যাস্ট্রো-এন্টেরোলজি, নেফ্রোলজি, ইউরোলজি, নিউরোলজি, অঙ্কোলজি ইত্যাদি যাবতীয় বিভাগ এবং ডায়ালিসিস ইউনিট, ব্লাড ব্যাঙ্ক ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিভাগ ও আধুনিকতম ডায়গনিস্টিক সুযোগ-সুবিধার বন্দোবস্ত থাকবে সেখানে।

এই হাসপাতাল গড়ার প্রাথমিক এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ প্রয়োজনীয় জমি জোগাড়, যা ইতিমধ্যেই বাস্তবায়িত হয়ে গেছে। হুগলি জেলার (শ্রীরামপুর স্টেশনের কাছে) পিয়ারাপুর পঞ্চায়েতের বেলুমিল্কি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হবে এই হাসপাতাল।

কোনো সরকারি বা বিদেশী ফান্ডের অনুদান শ্রমজীবীর নেই বরং যা আছে তা হলো বহু বহু মানুষজনের উদার দান। শ্রমজীবী স্বাস্থ্য প্রকল্প বিশ্বাস করে ' তোমা সবাকার ঘরে ঘরে/ আমার ভাণ্ডার আছে ভরে।' তাই এখনও শ্রমজীবী হাসপাতাল সম্পূর্ণ নির্ভরশীল মানুষের উপর, সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের ওপর।

সুস্থ ও সবল জীবনের লক্ষ্যে এই শ্রমজীবী মানুষেরা শত বিপত্তি-বাধার মধ্যেও যা কাজ করেছেন তা এক অনুকরণীয় উদাহরণ হয়ে থাকবে শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয় গোটা ভারতে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :
দেবাশিস ভট্টাচার্য, শ্রমজীবী হাসপাতাল।

শ্রমিক দিবসের অন্য ইতিবৃত্ত

সীমন্তী দাশগুপ্ত

গত সপ্তাহে এখানে লেবার ডে (Labor Day) অর্থাৎ শ্রমিক দিবসের অনুষ্ঠান হলো। শনি-রবি ছুটি থাকে অনেকের তার সঙ্গে সোমবার যোগ করে লম্বা সপ্তাহন্ত পাওয়া গেল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লেবার ডে সেপ্টেম্বরের প্রথম সোমবার পালন করা হয় প্রত্যেক বছর। এই দিনটিতে প্রধানত কর্মীদের আর্থিক ও সামাজিক অনুদানের কথা ভাবা হয়। ১৮৮২ সালে এই দিনটির কথা সর্বপ্রথম প্রস্তাব করেন পিটার জে মেক্‌রাইম (Peter J. Mecrime)। তিনি আমেরিকান ফেডারেশন অফ লেবার-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কানাডায় বাৎসরিক শ্রমিক উৎসব দেখে তিনি অনুপ্রাণিত হয়ে এইরকম একটি উৎসবের কথা ভাবেন মার্কিনীদের জন্যেও। সর্বপ্রথম, ১৮৮৭-তে ওরেগন রাজ্যে এই দিনটিকে ছুটি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তারপর ১৮৯৪-এর মধ্যে এটিকে জাতীয় ছুটি হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

তবে এই দিনটিকে জাতীয় ছুটি হিসেবে ঘোষণা করার পেছনে যে কারণটা আছে, সেটা খুব সুখকর নয়। ১৮৯৪-এ দেশব্যাপী শ্রমিক সংগঠন (Labor Unions) ও রেল কোম্পানির মধ্যে বিরোধ বাধে। এর শুরু ইলিনয় রাজ্যের পুলম্যান নামের একটি শহরে। সে-সময়এই শহরের ‘পুলম্যান প্যালেস কার কোম্পানি’-র প্রায় তিন হাজার শ্রমিক-কর্মচারী কাজ বন্ধ করে দেন। এই বন্ধের কারণ ছিল বেতন কমানো। আর এই বন্ধের জন্য শিকাগো-র পশ্চিমে রেল চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে এই বিরোধিতার কারণে মার্কিন সেনাবাহিনী এবং ভি এস মার্শাল-এর হাতে বেশ কয়েকজন কর্মী প্রাণ হারান। তখন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি গ্রোভার উমেল্যান্ড, আরও বড় ধরণের বিরোধিতার ভয়ে, ধর্মঘটের সমাপ্তি ঘটার ছ-দিনের মধ্যে শ্রমিক দিবসটিকে রাষ্ট্রীয় ছুটি হিসেবে ঘোষণা করেন। সেপ্টেম্বর মাসের এই দিনটিকে নির্দিষ্ট করে CLU of New York। তবে এই দিনটি নির্দিষ্ট করার পেছনে মার্কিনী কুটনীতিবিদ্‌দের তরফে আরেকটা অলিখিত যুক্তি আছে। অনেকেরই হয়তো মনে হতে পারে, শ্রমিক দিবস হিসেবে মে ডে-র কি হলো? সারা বিশ্বেই তো মে ডে অর্থাৎ পয়লা মে-কেই শ্রমিক দিবস হিসেবে জানে। আমরাও সেরকমই জানি। কিন্তু এখানে মে ডে-র বদলে লেবার ডে, তাও আবার সেপ্টেম্বর মাসে! আসলে মে ডে-র সঙ্গে জড়িয়ে আছে মার্কসবাদ, কমিউনিজম ইত্যাদি যা মার্কিন রাজ্যে শুধু অবাঞ্ছনীয়ই নয়, অবাস্তবও বটে। ধনতান্ত্রিক দেশ হিসেবেই যেহেতু আমেরিকা নামের দেশটির পরিচিতি এবং ধনবাদী নীতিই এর ভিত্তি, ফলত এখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ মূলত জিনিস-পত্রের মাধ্যমে, এবং অনেকটাই পয়সার হিসেবের ওপরও নির্ভরশীল। সুতরাং মার্কসবাদ বা কমিউনিজিম ইত্যাদির গন্ধ আছে এরকম সব সম্পর্ক শাসকরা ভেঙে ফেলতে চায় আর তার প্রকৃতিও বেশ ভয়াবহ। লেবার ডে-কে মে ডে-র থেকে আলাদা করে ফেলাটা তাই এদেশের শাসককুলের কাছে বেশ জরুরি ছিল। এই পার্থক্যটা বেশ নির্দিষ্টই এবং শ্রমিক বলতে আমরা যা বুঝে এসেছি তার থেকে অনেকটাই ভিন্ন। Labor Union-এর দরুণ এখানকার অনেক শ্রমিকই বেশ স্বচ্ছল। তাদের বাড়ি-গাড়ি কোনো কিছুরই প্রায় অভাব নেই। তবে গত দু'দশকে আউটসোর্সিং-এর দরুণ কারখানার কাজ সংখ্যায় অনেক কমে এসেছে। এখন রাষ্ট্রপতি ওবামাও তাই কর্মসংস্থান বা কর্মসৃষ্টি নিয়ে খুবই তৎপর।

‘শ্রমিক’, এই কথাটার মধ্যেও একটা লিঙ্গ বৈষম্যের আভাস পাওয়া যায়। যদি সংগঠনের ইতিহাস দিয়ে দেখা যায়, তাহলে পরিষ্কার দেখা যাবে যে, পুরুষদের সংগঠনগুলো তুলনামূলক ভাবে ছিল কারখানাভিত্তিক কাজের সঙ্গে জড়িত, যেমন রেল রোড নির্মাণ ইত্যাদি। অন্যদিকে মেয়েদের কাজ ছিল ভিন্ন। শুধু মহিলা শ্রমিক কর্মীদের নিয়ে প্রথম সংগঠন গঠিত হয় ১৮২৫ সালে —The United Tailoresses of New York. Tailor অর্থাৎ দর্জির কাজ বাড়ির ভেতর মহলের সঙ্গেই বেশি যুক্ত, কারখানায় নয়। এর মানে এই নয় যে, মেয়েরা কারখানায় কাজ করত না। নিশ্চয়ই করত কিন্তু তারা সংগঠিত হয়ে নিজেদের অধিকারের জন্য লড়াই করবে সেটা ভাবা বেশ কঠিন ছিল সে-সময়। যে সব সংগঠন আগে ছিল, যেমন ১৭৬৫-তে গঠিত Daughters of liberty, ছিল মূলত পুরুষদের সংগঠন Sons of liberty-র প্রতিচ্ছবি মাত্র। বর্তমানে, ১৯৭৪-এ গঠিত Coalition of labour Union (Women), সবচেয়ে বেশি সক্রিয়।

□□ এখানে মে ডে-র বদলে লেবার ডে, তাও আবার সেপ্টেম্বর মাসে। মে ডে-র সাথে জড়িয়ে আছে মার্কসবাদ, কমিউনিজম ইত্যাদি যা মার্কিন রাজ্যে শুধু অবাঞ্ছনীয়ই নয়, অবাস্তবও বটে।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা এখানে বলে নেওয়া দরকার--- ১৯৭৮-এর ‘প্রেগন্যান্সি ডিস্ক্রিমিনেশন অ্যাক্ট’। এর সাহায্যে অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের কাজ না দেওয়া কিংবা কাজ থেকে বিতাড়িত করা ইত্যাদি বন্ধ হয়েছে। কিন্তু বাস্তবটা অনেক অন্যরকম। অনেক অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদেরই দেখেছি, ব্যাপারটা যতদিন পারেন লুকিয়ে রাখেন, পাছে কাজের জায়গায় অসুবিধা হয় তাই।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আরেকটা লেখার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। কিছুদিন আগে বেতনের লিঙ্গ বৈষম্য নিয়ে এই কলামেই লিখেছিলাম, আজও একই কাজের জন্য পুরুষের তুলনায় মেয়েরা এই দেশে তিরিশ শতাংশ কম বেতন পেয়ে থাকে। এ হেন অবস্থায় শ্রম ও শ্রমিক নিয়ে ভাবনাটা আরও গভীরতার দাবি রাখে বৈকি! □

কেন শ্রমিকের অধিকার ?

ভারতী দে

আমরা সকলেই জানি ও বিশ্বাস করি যে আমরাও শ্রমিক। আমরা গতর খাটিয়ে যৌন পরিষেবা দিয়ে থাকি। কাস্টমারকে যৌন আনন্দ দেওয়ার বিনিময়ে, মূল্য হিসাবে আমরা রোজগারের টাকা পাই যা দিয়ে আমাদের সংসার চালাই। তাই অন্যান্য বহু পেশার মতো যৌনপেশাও একটা পেশা। সমাজের গুরুত্বপূর্ণ একটা চাহিদা মেটাতেই এই পেশার সৃষ্টি। পৃথিবীর আদিমতম পেশাগুলোর মধ্যে এটা অন্যতম। অথচ এই পেশায় নিযুক্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের শ্রমের আজ কোনো মর্যাদা নেই। যে কারণে আমরা ব্রাত্য এই সমাজের কাছে। অপমান লাঞ্ছনা আর ঘৃণা আমাদের নিত্যসঙ্গী। দেশের আর পাঁচজনের মতো নূন্যতম প্রাপ্য অধিকার দূরে থাক রাষ্ট্র ও তার পুলিশ বাহিনী উল্টে শোষণ ও অত্যাচার চালায় আমাদের ওপর।

পেশার ভিতরে ও বাইরে এই অত্যাচারের শেষ নেই। আর এসবই বহাল তবিয়তে চলতে পারছে তার কারণ এই পেশার কোনো আইনানুগ স্বীকৃতি নেই। অথচ যৌনপেশা চুরি ডাকাতি খুনের মতো কোনো সমাজবিরোধী কাজ নয়। সমাজের প্রয়োজনের কারণে এ পেশার জন্ম তাই সমাজই আমাদের তৈরী করেছে। স্বাধীনতার ৬৩ টা বছর পার হয়ে গেলেও আমাদের মতো প্রান্তিক মানুষদের জীবনে এতটুকু পরিবর্তন এবং উন্নয়ন ঘটে নি। সমবেত কণ্ঠে তাই আজ আমারা আওয়াজ তুলছি আমাদের নায্য অধিকারের দাবীকে প্রতিষ্ঠা করতে আমাদের আদায় করতে হবে শ্রমিকের মর্যাদা। শ্রমিকের অধিকার। সেই অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আপনার মতো মানুষের সাহায্য ও সহমর্মিতা ভীষণ জরুরী। আপনি নিজেও একটু ভেবে দেখুন কেন ইটপা আইন যৌনকর্মীদের জীবন ও জীবিকার বিরুদ্ধে। এই আইন বাতিল হলে যৌনকর্মীরা নিজের শরীরের ওপর তার নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হবে। সম্ভব হবে নিজের শরীর ও স্বাস্থ্য বজায় রাখা। কেন এবং কিভাবে তা আমরা ব্যাখ্যা করছি।

১. এইচআইভি-র সংক্রমণ কমবে।

একথা হয়তো অনেকেই জানেন যে মালকিনদের চোখ রাঙানি ও গুণ্ডাদের ভয়ে যৌনকর্মীরা কন্ডোম ছাড়া কাজ করতে বাধ্য হন। ফলে এইচ আই ভি সংক্রমনের সম্ভাবনা বাড়ে। যদি শ্রমিকের অধিকার পাওয়া যায় তাহলে আমরা শুধু সংগঠিত হব না। পাশাপাশি ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তুলতে পারব। প্রতিবাদ করার সাহস মিলবে। সবচেয়ে বড় কথা এইডসের মতো মারণ রোগের ভয় কমবে। এছাড়াও আছে গুণ্ডাদের অত্যাচার ও পাড়ার দাদাদের মস্তানি সঙ্গে পুলিশি দৌরাত্ম। তারা আমাদের শরীরটা তাদের ক্ষমতার জোরে বিনা পয়সায় পেতে চায়। শারীরিক অত্যাচার থেকে শুরু করে যৌন নিপীড়ন সবকিছুই তারা প্রায় তাদের জায়গা থেকে নিজেদের 'উপরি পাওনা' হিসাবে দেখে থাকে। এ ব্যাপারে পাড়ার দাদা ও নেতাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। তাই প্রথম প্রয়োজন আইনি স্বীকৃতি। প্রয়োজন চালু আইনটির অবসান, যে আইনের চোখে আমরা দোষী ও অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত। সুরক্ষিত যৌনতার জন্য প্রয়োজন এই আইনের বিলুপ্তি। এতে শুধু যৌনকর্মীরাই নন তাদের কাছে যে সব কাস্টমার আসেন তারাও উপকৃত হবেন। তাদেরকেও এইডসের মতো মারণ রোগের শিকার হতে হবে না। ফলে এই রোগ তার থেকে পরিবারে ছড়ানো বন্ধ হবে। এতে সমাজ বাঁচবে, পরিবার বাঁচবে, দেশ বাঁচবে।

২. শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে সারা দেশে প্রতিটি যৌনকর্মীপল্লীতে ডাক্তার ও উকিলদের ধাঁচে স্বশাসিত বোর্ড গঠন করা যাবে এবং তার স্বীকৃতি কায়েম করা যাবে।

এই বোর্ডের সুবিধা হল নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যৌনকর্মীরাই পেশার মধ্যে যৌক্তিক ও কার্যকারী নিয়মনীতি চালু করতে পারবে এবং স্বীকৃত পেশা হিসাবে যৌনপেশায় শ্রমিক স্বার্থ রক্ষাকারী বিধি ব্যবস্থা লাগু করা সহজতর হবে। কোনো কম বয়স্ক মহিলা যেমন এই পেশায় প্রবেশ করতে পারবে না তেমনি ভাবে অনিচ্ছুক সাবালিকাদের পেশায় জোর করে ঢোকানো বন্ধ হবে। যৌনকর্মীর ওপর কোনো বাবু বা মালকিন অত্যাচার করলে তা ঘরের ব্যাপার বলে কেউ চুপচাপ বসে থাকবে না। যৌনকর্মীরা ১০০ শতাংশ ক্ষেত্রে কন্ডোম ব্যবহারে কাস্টমারদের বাধ্য করাতে পারবেন। অন্যদিকে এলাকায় পুলিশের রেইড বন্ধ হবে। যখন তখন যৌনকর্মীদের ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষজনদের দ্বারা গঠিত স্বশাসিত বোর্ডের মাধ্যমে নাবালিকাদের এবং অনিচ্ছুক সাবালিকাদের এই পেশায় ঢোকা বন্ধ করার যে কাজটা দুর্বার গত দশ বছর ধরে কিছু কিছু এলাকায় করতে সমর্থ হয়েছে তা সারা রাজ্যে ও সারা দেশে আরো সুস্থভাবে প্রসারিত করা যাবে।

৩. এলাকার পুলিশ রেইড বন্ধ হবে।

আগে ধরে নেওয়া হত যৌনকর্মীরা খারাপ। তার ওপর ইমমরাল ট্রাফিক প্রিভেনশন অ্যাক্ট-এর ৮-এর ধারায় কোনো না কোনো ছুতোয় যৌনকর্মীদের এলাকা থেকে রেইড করে থানায় ধরে নিয়ে যাওয়া হত। দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি গড়ে ওঠার ফলে সেই অত্যাচার কিছুটা বন্ধ হলেও এখন এর শিকার হয়েছেন কাস্টমারেরা। অজুহাত হিসেবে বলা হচ্ছে, তারা খারাপ কাজ করতে

আসে বলেই তাদেরকে ধরাটা পুলিশের কর্তব্য। এতে আখেরে যৌনকর্মীদের ক্ষতি হয় সবচেয়ে বেশি। উদাহরণ হিসাবে ধরা যাক, সোনাগাছিতে ন'হাজার যৌনকর্মী কাজ করেন। এখানে প্রতিদিন গড়ে যদি প্রতিটি মেয়ের কাছে তিনজন করে কাস্টমার আসে তাহলে সোনাগাছিতে প্রতিদিনের প্রায় সাতাশ হাজার কাস্টমার আসে। পুলিশ রেইড হবার ফলে কাস্টমার আসা কমতে থাকলে যৌনকর্মীরা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু করে দিতে বাধ্য হবে। কাস্টমারেরা সুযোগ বুঝে কোপ মারবে। তারা অসুরক্ষিত যৌনকাজ করার জন্য চাপ দেবে। তখন যৌনকর্মীরা নিজেদের কথা, নিজের সন্তানদের সর্বোপরি নিজের ঘর ভাড়া যোগাড় করার কথা ভেবে অসুরক্ষিত যৌনকাজ করতে বাধ্য হবে এবং কম পয়সার যৌনপরিসেবা বিক্রি করতে বাধ্য হবেন। শ্রমিকের অধিকার পেলে যৌনকর্মীদের সঙ্গে সঙ্গে কাস্টমারদের ধরে নিয়ে যাওয়া বন্ধ হবে, এবং যৌনকর্মীর দরাদরির ক্ষমতা বাড়বে। ফলে নিজের এবং তার পরিবারের জীবন যাত্রার উন্নয়ন ঘটবে।

৪. মালকিন ও গুণ্ডাদের অত্যাচার বন্ধ করা যাবে।

যৌনকর্মীদের আয়ের একটা বড় ভাগ চলে যায় এদের হাতে। অবাধ্য হলে এবং প্রতিবাদ করলে জোটে অকথ্য শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার। যৌনকর্মীরা পেশার স্বীকৃতি পেলে বাড়ির মালিক, মালকিন, গুণ্ডাদের অত্যাচার শুধু বন্ধ হবে না। শ্রমিকের অধিকার পেলে অন্যান্য শ্রমিকের মতো তারাও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা যেমন স্বাস্থ্য পরিষেবা, রোগের কারনে অসুস্থ হলে ক্ষতিপুরনের ব্যবস্থা ইত্যাদি পেতে পারবেন। তৈরী হবে অন্যান্য অসংগঠিত শ্রমিকদের মতো পেনশন, জীবন বীমার মতো সামাজিক সুরক্ষার সুযোগ সুবিধা।

৫. এছাড়াও যৌনকর্মীদের জীবনে নাগরিক অধিকার এবং একজন ব্যাক্তি মানুষ হিসাবে স্বাভাবিক স্বাধীনতার সুযোগ মিলবে।

আমাদের আয়ে আমাদের পরিবারের অধিকার সুনিশ্চিত করা যাবে। সমাজের কল্যানে, আপনার আমার কল্যানের কারণে তাই আসুন আমরা সবাই মিলে এই আইনের বিরুদ্ধে সরব হই। সমাজের প্রান্তে ঠেলে রাখা যৌনকর্মীদের নাগরিক সন্মান অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইতে সঙ্গী হোন।

৬. ঘর ভাড়ার রসিদ পাওয়া যাবে।

ঘর ভাড়ার রসিদ পাওয়া যে কোনো ভাড়াটের একটি মৌলিক অধিকার। ইমমরাল ট্র্যাফিক প্রিভেনশন অ্যাক্টের ৩.১ ধারার জন্য কোনো যৌনকর্মীই ঘর ভাড়ার রসিদ পান না। কারণ, এই আইনে পরিষ্কার বলা আছে, কোনো মহিলা যদি যৌন পরিষেবা নিজের ঘর ছাড়া অন্য কারোর ঘর ভাড়া নেন তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে এবং বাড়ির মালিককে অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। যিনি ঘর ভাড়া দিচ্ছেন, তার সাত বছর পর্যন্ত জেল ও জরিমানা উভয়ই হতে পারে। ফলে যৌনকর্মী ও বাড়িওয়ালারা আইনের ভয়ে কেউ বিল দিতে বা নিতে পারেন না। এই সুযোগটা পুরোপুরি কাজে লাগায় বাড়িওয়ালারা। যে কোন তুচ্ছ কারনে যৌনকর্মীকে ঘর থেকে তুলে দিতে তাদের কোন সমস্যাই হয় না। এই আইনের ফলে যৌনকর্মী তার নায্য অধিকার হারিয়ে ফেলেন, নিজের অস্তিত্ত্ব প্রমাণ করতে এই সামান্য রসিদের কাগজটাও পেতে পারেন না। ফলে তার পক্ষে ব্যাঙ্কে এ্যাকাউন্ট খোলা, রেশন কার্ড যোগাড় করা কোনোটাই সম্ভব হয় না।

৭. যৌনকর্মীরা যৌন নিগ্রহ তথা ধর্ষনের হাত থেকে রক্ষা পাবেন

বিনা কন্ডোমে যৌনকাজ করা কিংবা যৌনকর্মীর সাথে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌনকাজ করাটা সমাজের এক শ্রেণীর মানুষ বিশেষ করে পুলিশ ও পাড়ার দাদাদের 'হক' হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। শ্রমিকের অধিকার পেলে কেউ তার ওপর জোর খাটালে সে থানায় গিয়ে ধর্ষণের কারনে এফআইআর করতে পারবে।

৮. পাড়া উচ্ছেদ বন্ধ হবে

যে কোনো এলাকা উচ্ছেদ মানবতা বিরোধী হলেও যৌনকর্মীদের এলাকা উচ্ছেদ করা কোনো সমস্যাই নয়। এর মূল কারণ হল আইটিপিএ আইনটি ব্যবহার করে কোর্ট যখন তখন সমন জারি করতে পারে। যে কোনো প্রয়োজনে যৌনকর্মীদের পাড়া উচ্ছেদ করাটা এখন একটা প্রচলিত ধারা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। এই পল্লীগুলোর ওপর রয়েছে প্রমোটারদের শ্যেন দৃষ্টি। তারা নানা কায়দায় কখনো বা লোভ দেখিয়ে, কখনো বা পাড়ার আশেপাশের লোকেদের ক্ষেপিয়ে কোর্টে এসে যুক্তি সাজান যে এইখানে পাড়াটা আছে বলে পাড়ার মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে না, ছেলেমেয়েদের স্কুলে পড়ার অসুবিধা হচ্ছে। যৌনকর্মীরা চলে গেলে পাড়াটা পরিষ্কার হবে ইত্যাদি ইত্যাদি কথার ওপর ভর করে তারা পাড়া উচ্ছেদের সমন চান এবং পেয়েও যান। এইসবে কাজ না হলে কখনো স্রেফ বল প্রয়োগ করে যৌনকর্মীদের পাড়া থেকে উচ্ছেদ করে দেন এইসব প্রমোটাররা। যৌনকর্মীরা ঘর হারিয়ে তখন উদ্বাস্তুতে পরিণত হন। শ্রমিকের অধিকার পেলে এই পাড়া উচ্ছেদ বন্ধ হবে।

৯. এই আইন রদ হলে যৌনকর্মীরা যখন খুশি নিজের পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় যেতে পারবেন এবং যেখানে খুশি বসবাস করতে পারবেন।

আমাদের সমাজে যে কোনো মানুষ যে কোনো সময়ে চাইলে নিজের পেশা বদলাতে পারেন বা পেশা না করবার ইচ্ছা থাকলে নিজের পেশা বা চাকরী ছেড়ে দেশে বা গ্রামে ফিরে যেতে পারেন। কিন্তু যৌনকর্মী পেশায় নামার পর, একবার তার গায়ে যৌনকর্মীর ছাপ্পা পড়লে, অন্য পেশা গ্রহণ করতে বা দেশে বা গ্রামে ফিরে যেতে পারেন না। সেখানে তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন পাড়ার লোকজন, সরকার এবং প্রশাসন তাদের পরোক্ষে সাপোর্ট করে এবং যৌনকর্মীদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেন।

এছাড়াও ব্ল্যাকমেইল বা একঘরে হবার সম্ভাবনা থাকে। আমরা মনে করছি, যৌনকর্মীরা শ্রমিকের অধিকার পেলে সমাজ ধীরে ধীরে তাদেরকে শ্রমিক হিসাবে মেনে নেবেন। কিছুদিন পর তাঁরাও আমাদের সমাজে অস্পৃশ্য, হয়ে থাকবেন না। সত্যি কথা বলতে কি শ্রমিকের অধিকার পেলে যৌনপেশা ও যৌনকর্মীরা কলঙ্কমুক্ত হওয়ার জন্য কোমর বেঁধে লড়াই করতে পারবেন। যৌনকর্মী ও তার সন্তান উভয়েই মানুষের অধিকার নিয়ে সসম্মানে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারবেন। এবং এরজন্য প্রয়োজনীয় লড়াই গড়ে তুলতেও সক্ষম হবেন। তাই আমরা চাই এদেশের নাগরিক হিসাবে আপনারা আমাদের ন্যায় এবং মর্যাদা রক্ষার লড়াইতে সামিল হোন। □

খাদ্যের অধিকার

প্রায় সকলের অগোচরে অচিরেই পাশ হতে চলেছে 'জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা বিল ২০১১' যার মূল উদ্দেশ্য খাদ্য ও পুষ্টি সুরক্ষা করা, যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য ন্যায্য মূল্যে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে। বাস্তবে বিলটি তার মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত। তাই প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ও তার মন্ত্রিসভার উদ্দেশ্যে লেখা খোলা চিঠি। রাইট টু ফুড ক্যাম্পেন, নিউদিল্লি, ন্যাশনাল ক্যাম্পেন ফর পিপলস রাইট টু ইনফরমেশন, ন্যাশনাল ফেডারেশন ফর ইন্ডিয়ান উওমেন, নিউ ট্রেড ইউনিয়ন ইনিশিয়েটিভ, ব্রেস্ট ফিডিং প্রোমোশন নেটওয়ার্ক অফ ইন্ডিয়া, ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স অফ পিপলস মুভমেন্টস, হিউম্যান রাইটস ল নেটওয়ার্ক, পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ, ও আরও বহু বহু সংগঠনের পক্ষ থেকে চিঠিটি লেখা হয়েছে। মূল ইংরেজি থেকে অনূদিত। অনুবাদক : **পারমিতা চৌধুরী** ।

ক্ষমতাশালী মন্ত্রীদের একটি দল, সাম্প্রতিককালে খাদ্য ও ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর প্রণীত জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা বিল ২০১১ অনুমোদন করেছে এবং সরকার দাবি করছে যে, বিলটি এখন ক্যাবিনেটে পেশ করা যাবে। বাস্তবে এই বিলটি খাদ্যের অধিকারকে সুরক্ষিত করার প্রচেষ্টাকে ব্যঙ্গ করছে। এমনকি এটি বর্তমানে বরাদ্দ সুযোগ-সুবিধাগুলিকেও যা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী প্রাপ্য তাও সীমিত করে দিচ্ছে। ইউপিএ ক্ষমতায় আসার পরে প্রতিটি মানুষের আশা ছিল যে, খাদ্যের অধিকার সুরক্ষিত করতে তারা বিভিন্ন ধরণের প্রকল্পে বাজেট বরাদ্দ বাড়াবে যার ফলে সামগ্রিক ভাবে ভারতের জনসাধারণের পুষ্টির চেহারার উন্নতি ঘটবে। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে এই খসড়া বিলটি সরকারের দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতায় গণ্ডি কেটে দিয়েছে এবং জনসাধারণের সুযোগ-সুবিধাও সীমিত করে দিয়েছে। বিলটিতে শুধুমাত্র চাল, গম ও রান্না করা খাদ্য সরবরাহের মাধ্যমে খাদ্যসুরক্ষা প্রদানের কথা বলা হয়েছে কিন্তু ডাল, মিলেট জাতীয় শস্য ও তেল সরবরাহ সম্পর্কে নীরব। ২০১০ সালের খসড়া বিলটিতে পুষ্টির সুরক্ষা সম্পর্কে খাদ্যশস্যের উৎপাদন, রক্ষণাবেক্ষণ (এমনকি স্থানীয়স্তরে) গুদামজাতকরণ এবং সব শেষে খাদ্যদ্রব্যের সুষ্ঠু সরবরাহ প্রক্রিয়াকে খাদ্যসুরক্ষার অপরিহার্য অংশ হিসেবে ভাবা হয়নি।

তাই সুশীল সমাজের অংশ হিসেবে এই খসড়া বিলটিকে আমরা খারিজ করছি ও দেশের মানুষের অপুষ্টি ও ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য সরকারকে নিষ্ঠাবান ও দায়িত্বশীল হওয়ার দাবি করছি।

ব রা দ্দে র প রি মা ণ ক মা নো

যদিও দারিদ্র্য সীমা নীতির সাফল্যের বিপক্ষে প্রভূত প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, তাও খসড়া বিলটি দারিদ্র্য সীমার উপরে ও নীচে এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদটি বজায় রেখেছে। 'দারিদ্র্য সীমা'র সংজ্ঞাটিও সঠিক নয় এবং এটি কখনই দেশের ক্ষুধার তীব্রতাকে প্রতিফলিত করে না। দারিদ্র্য সীমা চিহ্নিতকরণ ও এতে অন্তর্ভুক্তকরণের মাপকাঠি নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও প্রচুর অসঙ্গতি রয়েছে। খসড়া বিলটিতে সুযোগ-সুবিধাগুলিকে দারিদ্র্যের অনুপাতের ওপর নির্ভর করে বরাদ্দ করা হয়েছে যা ন্যাশনাল অ্যাডভাইসরি কাউন্সিলের প্রস্তাবনাটিকে লঘু করে দিয়েছে। ন্যাশনাল অ্যাডভাইসরি কাউন্সিল গ্রামের মানুষদের ৯০ শতাংশ সুরক্ষার অধীনে আনার প্রস্তাব দিলেও সরকার একে কমিয়ে ৭৫ শতাংশ করেছেন। আবার সাধারণ শ্রেণির মানুষদের জন্য মাথাপিছু ৪ কেজি করে খাদ্যশস্য বরাদ্দের প্রস্তাবটিকে বাতিল করে ৩ কেজি করে খাদ্যশস্য বরাদ্দ করেছেন। আরো বিপজ্জনক হলো, বিলটিতে দারিদ্র্যের অনুপাতের ওপর ভিত্তি করে পরিবারগুলিকে 'গুরুত্বপূর্ণ' ও 'সাধারণ' এই দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। সময়ের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণির সুযোগসুবিধাগুলি ক্রমশ হ্রাস করা হবে। আবার সাধারণ শ্রেণিকে খাদ্যশস্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের অর্ধেক দামে কিনতে হবে যা বর্তমানের বিপিএল বা এপিএল কার্ড গ্রহীতারা যে মূল্য দেন তার থেকে অনেক বেশি হবে।

গ ণ ব ন্ট ন ব্য ব স্থা

খাদ্যের অধিকার আন্দোলন থেকে বারবার গণবণ্টন ব্যবস্থার সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও যথাযথ রূপায়ণের কথা উঠে এসেছে। যদিও এই বিলে গণবণ্টন ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে সরকারকে অনুদান দেওয়ার অঢেল ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এর ফলে এই ব্যবস্থায় অসৎ ও দুর্নীতিগ্রস্ত পাইকারি ব্যবসাদারা লাভবান হবে আর ভোগান্তি হবে সাধারণ মানুষের। সাম্প্রতিককালে একটি গবেষণামূলক সমীক্ষায় গণবণ্টন ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে অনুদানের নেতিবাচক দিকটি উঠে এসেছে (আপনাকে লেখা খোলা চিঠি, *ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি*, ২৩ জুলাই ২০১১।) তাই বলা যায় যে, প্রস্তাবিত বিলটি খাদ্য সুরক্ষার বিষয়টিকে অনিশ্চিত অবস্থার মুখে ফেলে দেবে।

আমাদের বিশ্বাস গণবণ্টন ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে অনুদানের প্রচলন, সামগ্রিক ভাবে খাদ্য উৎপাদন, সংগ্রহ ও মজুত করার বিষয়টিতেও গুরুতর প্রভাব ফেলবে। কৃষকরা হবেন এর প্রাথমিক শিকার কারণ গণবণ্টন ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে সরকার তাদের উৎপাদিত খাস্যশস্য সংগ্রহ করবে না ফলে তারা সরকারের ধার্য করা ন্যূনতম সহায়ক মূল্যও পাবে না যা বর্তমানে তাদের খাদ্যশস্য উৎপাদনের বৃহত্তম ভাতা। এখন, কৃষকরা বাধ্য হবেন বাজার দরে তাদের খাদ্যশস্য বিক্রি করতে যা উৎপাদন মূল্যের থেকেও কম। ফুড করপোরেশনের

গুদামগুলির প্রয়োজন হবে না এবং এই ব্যবস্থাপনাটি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে ও খাদ্য সুরক্ষার বিষয়টি বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে। গণবন্টন ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলার সরাসরি ফল হবে, সংগঠিত পাইকারি বিক্রেতারাই বাজারটিকে নিয়ন্ত্রণ করবে। পুষ্টিকর খাদ্যের বদলে টাকা বিনিময়ের প্রচলন আসলে একদল অসাধু আড়তদারের হাতেই জনসাধারণের খাদ্য সুরক্ষার বিষয়টি তুলে দেওয়া। হয়তো এই প্রথা পাইকারি ব্যবসার ক্ষেত্রে দেশে বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ বাড়াবে কিন্তু এটি কৃষকদের দুর্দশা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে পাইকারি ব্যবসা ক্ষেত্রের দুর্নীতিকেও মদত দেবে।

এছাড়াও প্রস্তাবিত বিলটিতে Unique Identification-এর কথা বলা হয়েছে যাতে নাগরিক স্বাধীনতা ও অধিকার বিপন্ন হতে পারে। এমনকি এটি সংসদের অনুমোদন ছাড়াই বেশ কিছু রাজ্যে চালুও করে দেওয়া হয়েছে।

বেশ কিছু বিষয়ের অবলুপ্তি

প্রস্তাবিত বিলটিতে মহিলা, শিশু ও সামাজিক ভাবে বিচ্ছিন্ন জনজাতির বিষয়গুলির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। গর্ভাবস্থায় ছ-মাস ধরে মাসিক ১০০০ টাকা অনুদানের বিষয়টি ক্যাম্পেনের ও ন্যাশনাল অ্যাডভাইসারি কাউন্সিলের প্রস্তাবনায় উঠে এলেও বিলটিতে বিষয়টিকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। অপুষ্ট ও স্কুলছুট শিশু ভ্রাম্যমাণ শ্রমিক দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যু ও সহায়সম্বলহীনদের খাদ্য সরবরাহের জন্য যৌথ হেঁসেল গঠনের বিষয়টিকেও অনেক কম গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়েছে এবং বহুক্ষেত্রে একে বাদও দেওয়া হয়েছে। বিলটিতে রান্না করা খাবারের পরিবর্তে তাড়াতাড়ি পরিবেশনযোগ্য খাবার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে যেটি বাস্তবে ঠিকাদারদের ব্যবসার পথ প্রশস্ত করবে।

অভাব-অভিযোগ প্রতিবিধানের যে ব্যবস্থাপনা ক্যাম্পেনের মতামতের ভিত্তিতে ন্যাশনাল অ্যাডভাইসারি কমিটি করেছিলেন তাকেও বাতিল করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ক্ষতিপূরণ দেওয়া ও জামিন অযোগ্য শাস্তির ধারাগুলির প্রয়োগ। অনুরূপ ভাবে জাতীয় ও রাজ্য স্তরে খাদ্য সুরক্ষা পর্ষদকেও বাস্তবে কোনো ক্ষমতা দেওয়া হয় নি এবং অভাব অভিযোগ প্রতিবিধানের প্রক্রিয়াটিও স্বচ্ছ নয়। ন্যাশনাল অ্যাডভাইসারি কাউন্সিল এই বিচার-ব্যাবস্থাটিকে স্বাধীন স্বয়ংশাসিত ব্যবস্থাপনা হিসেবে চালনা করার প্রস্তাব দিয়েছিল যা গ্রাহ্য না করে সার্ভিং অফিসার নিয়োগের কথা বলেছে। বিচার ব্যবস্থাপনায় ভারসাম্য রক্ষার জন্য নজরদারি ও প্রয়োগের জন্য যে ভিন্ন ভিন্ন সংস্থার কথা বলা হয়েছিল তাও বর্জিত হয়েছে। প্রস্তাবিত বিলটিতে সুযোগ-সুবিধার সংকোচন ও রাজ্য সরকারের সঙ্গে ব্যয়ভার ভাগ করে নেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে কেন্দ্র সরকারকে। যেমন সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প ও মিড ডে মিল প্রকল্পের সুযোগ সুবিধাগুলিকে এই বিলটির ধারা ৪, ৫ ও ৬ অন্তর্গত সুযোগ-সুবিধা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর ফলাফল হলো সংসদীয় গণতন্ত্রকে বাদ দিয়েই খাদ্য সুরক্ষাকে সরকারের ক্ষমতাধীন বিষয়ের অন্তর্গত করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত বিলটিতে সরকারের ব্যয় সংকোচ করার প্রবণতাটি ফুটে উঠেছে দায়িত্ববোধ ও প্রচলিত ব্যবস্থাপনাকে অস্বীকার করেই। সরকার দাবি করছে যে, বিলটি ন্যাশনাল অ্যাডভাইসারি কাউন্সিলের প্রস্তাবনাকে মেনেই করা হয়েছে যা বাস্তবে একেবারেই সঠিক নয়।

এই অবস্থায় গণবন্টন ব্যবস্থার ছিদ্রগুলিকে ভরাট করার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার করে তাকে শক্তিশালী ও সর্বজনীন করে তোলা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এর সঙ্গে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করার প্রক্রিয়াটির বিকেন্দ্রীকরণ করাও জরুরি। এর জন্য দরকার সংগ্রহ, মজুত ও সরবরাহ ব্যবস্থার পরিকাঠামোগত পরিবর্তন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

১. বাজার থেকে খাদ্যশস্য সরাসরি কৃষকদের থেকে সংগ্রহ করতে হবে বিশেষত ছোটো ও প্রান্তিক চাষিদের যারা কৃষিক্ষেত্রের সমস্যার সরাসরি শিকার।
২. প্রতিটি ব্লকে খাদ্যশস্য মজুত করার সুবিধা প্রদান।
৩. যে অঞ্চল থেকে খাদ্য সংগৃহীত হচ্ছে সেই অঞ্চলের মধ্যেই খাদ্যশস্যের সুষ্ঠু সরবরাহ করা। শুধু কোনো স্থানে খাদ্যশস্য কম পড়লে তা আশেপাশের অঞ্চল থেকে সরবরাহ করা হবে। এই ভাবে অঞ্চলভিত্তিক সংগ্রহ, মজুত ও সরবরাহের ব্যবস্থাপনা যেমন দুর্নীতি রোধ করবে তেমনি এটি সময়ানুযায়ী খাদ্যশস্যের জোগান বাড়াবে ও পরিবহণ খরচ কমাবে।

যে সরকার দেশের বড় বড় বাণিজ্যিক সংস্থাকে ৫ লক্ষ কোটি টাকা কর ছাড় দিতে পারে তাদের কাছে অর্থের অভাব কেবল একটা অজুহাত মাত্র। এর থেকে বোঝা যায়, দেশের খাদ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার জন্য এর এক-পঞ্চমাংশ ব্যয় করতেও সরকার ইচ্ছুক নয়। কৃষিক্ষেত্রের সমস্যা মেটাতে সরকারের গড়িমসি বহু কৃষককেই আত্মহননের পথ বেছে নিতে বাধ্য করেছে। খাদ্য সুরক্ষার বিষয়টিও কৃষির উৎপাদনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। প্রায় ৬৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য সরকারি গুদামে নষ্ট হচ্ছে অথবা গুদামজাত করার অভাবে নষ্ট হচ্ছে, সেখানে গণবন্টন ব্যবস্থাকে সর্বজনীন না করা সরকারের অনিচ্ছারই প্রকাশমাত্র।

দাবিসমূহ

এই বিলটি সংসদে পাশ হয়ে গেলে সরকার জনসাধারণের খাদ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার সুযোগটি হারাবে। বিলটি বাস্তবে জনসাধারণের পক্ষে ক্ষতিকারক। তাই আমরা সম্মিলিত ভাবে বিলটিকে বাতিল করছি এবং দাবি করছি যে, একে সংশোধন করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে গুরুত্ব আরোপ করা হোক।

১ গণবণ্টন ব্যবস্থাকে সর্বজনীন করা ও খাদ্যশস্যের বরাদ্দ বাড়ানো এবং ডাল ও তেল এর অন্তর্ভুক্ত করা।
২ খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য ভাতার প্রচলন এবং সংগ্রহ ও মজুত ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ।
৩ তামিলনাড়ু, হিমাচলপ্রদেশ, ওড়িশা ইত্যাদি রাজ্যের অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে গণবণ্টন ব্যবস্থার সরবরাহকে শক্তিশালী করা।
৪ শিশুদের অপুষ্টির প্রতিবিধান হিসেব মিড ডে মিল ব্যবস্থা। সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পে পুষ্টিকর খাদ্য বণ্টন। মাতৃত্বকালীন সুযোগসুবিধা ও গুরুতর ভাবে অপুষ্ট শিশুদের চিকিৎসার বিষয়টিকেও এর আওতায় আনা।
৫ কিছু জনগোষ্ঠী যেমন বয়স্ক, প্রতিবন্ধী, বিধবা, ভ্রাম্যমাণ শ্রমিক ও দুস্থদের জন্যে মাসিক ভাতা, যৌথ হেঁসেল ও খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি গ্রহণ করা।
৬ অভাব-অভিযোগ প্রতিবিধানের জন্য স্বচ্ছ ও কার্যকর ব্যবস্থাপনা চালু করা।
৭ গণবণ্টন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক সংস্থার হস্তক্ষেপ বিশেষত খাদ্য ও পুষ্টি সুরক্ষার ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে অনুদানের প্রবর্তন না করা।

খাদ্য অধিকারের আন্দোলনের পক্ষ থেকে এই প্রস্তাবিত বিলটি আমরা সম্মিলিত ভাবে খারিজ করার দাবি জানাচ্ছি। □

ফসলরক্ষক মা দুর্গার বাপের বাড়ি কি বিন্ধ্যাচলে?

চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য

পৃথিবী প্রাণচঞ্চলা। প্রতিদিন প্রতিনিয়ত এই বিশ্বে প্রাণের স্ফূরণ ঘটছে। ঘটছে অবিরত। নতুন প্রাণের সৃষ্টি হচ্ছে, প্রাচীন প্রাণ নতুনের জন্য জায়গা করে দিচ্ছে। বিশ্বের এই কারবার এই ব্রহ্মাণ্ডের, এই সৌরজগতের অন্য কোথাও নেই বলেই পৃথিবীকে বিজ্ঞানীরা বলছেন 'লোনলি প্ল্যানেট'— একাকী গ্রহ।

মহাকালীর স্তবে এক জাগয়ায় বলা হচ্ছে, প্রতি মুহূর্তে তুমি চন্দ্র-সূর্য-তারকারাজি-সহ পশু-পাখি, বৃক্ষ বনষ্পতি, নর-নারীর জন্ম দিয়ে চলেছ। মহাকালীর রূপের সঙ্গে এই মহাসৃষ্টিশীল বর্ণনা খাপ খায় না। ধ্বংসের সঙ্গে সৃষ্টির মিলন। সহস্র নরমুণ্ডের মালিকা গলায় ধারণ করে রক্তজিহ্বা অগ্নিদৃষ্টি খড়্গাধারিণী উলঙ্গিনি কি করে সৃজনের দেবী হবেন! রহস্যের এই জটাজাল যে পদতলে ভূপাতিত স্বয়ং মহাদেব, তার জটাজালের চেয়েও জটিল বোধ হয়, অন্তত হওয়াটাই স্বাভাবিক। অথচ, দুর্গাকে সংহারক রূপেও তত ভয়ংকরী কখনও মনে হয়নি।

আবার, যখন দশমহাবিদ্যার রূপগুলির দিকে তাকাই, তখন প্রথমেই পাই 'কালী'র রূপ। দশমহাবিদ্যাকে দুর্গার বলেই মানা যায়। কমলা তারই আরেক রূপ। দুর্গা প্রসঙ্গে ভারতীয় যাদুঘরের প্রাক্তন অধিকর্তা শ্যামলকান্তি চক্রবর্তীর সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে জেনেছিলাম, ভারতে দুর্গার যে সর্বপ্রাচীন প্রস্তর মূর্তিটি পাওয়া যায়, সেটি প্রথম শতাব্দীর। রাজস্থানের নাগৌর এলাকায় পাওয়া যায় এই নারী মূর্তিটি সম্পূর্ণ উলঙ্গ। কোনো ফসলের খেত থেকে একটি বুনোমোষকে সে লেজ মুচড়িয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছে। সে 'মহিষমর্দিনী'। কারণ, মোষের লেজটিকে সে মর্দন করছে। মোচড়াচ্ছে। ফসলের খেত বা বনে বুনোমোষকে কৌশলে পরাস্ত করে তার লেজের নাগাল পেতে বা তা মুচড়ে তাকে তাড়াতে যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন হয়, সন্দেহ নেই। বিশেষত, প্রথম শতাব্দীর অল্প জনসংখ্যার গ্রামীণ সভ্যতার দেশে। এই সাহসিনীকেই বলা হলো মহিষমর্দিনী।

সেই মহিষমর্দিনীর কিন্তু দুটি মাত্র হাত— নিরাভরণ এবং অস্ত্রহীন। আজকের দেবীর মতো তিনি দশভূজা নন, বরং দশদিকেই তিনি দিগম্বরী। কিন্তু তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত রেখে গেলেন। তিনি ফসলের রক্ষাকর্ত্রী। প্রাণের স্ফূরণকে তিনি প্রতিপালন করেছেন।

এরপর থেকে যত সময় এগিয়েছে, শতাব্দী থেকে শতাব্দীতে, দুর্গাও তাঁর রূপ বদলেছেন। চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ, এমনকি অষ্টম শতাব্দীতে, মধ্যপ্রদেশে দেবীর যে মূর্তি পাওয়া গেছে, সেখানে হাতের সংখ্যা চার। দেবীর হাত বেড়েছে। তার নিরাভরণ দেহে সামান্য পোশাকও জুটেছে। তার কটিদেশে লজ্জানিবারণের উপযোগী সামান্য বস্ত্র আছে যার দৈর্ঘ্য হাঁটু পর্যন্ত নামেনি। ঊর্ধ্বাঙ্গ কোথাও অনাবৃত, কোথাও সামান্য কাঁচুলি জাতীয় বস্ত্রে আবৃত। অর্থাৎ এই মূর্তিগুলি যে সভ্যতার যুগে মানুষ গড়ছেন, তাঁরা তাদের মতো পোশাক দেবীকে পরাচ্ছেন।

এই প্রসঙ্গে বলা ভালো, মূর্তির বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সমাজের একটা প্রতিচ্ছবি ধরা যায়। এবং এই পদ্ধতি সময়কাল মাপার জন্য কার্বন ডেটিংকেই বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি হিসাবেই গণ্য হয়। মানুষ নিজের সময়কালকেই মূর্তি বা অবয়ব গড়ার সময় মূর্ত করে তোলে। বিমূর্ত ভাবনা মূর্ত হয়ে ওঠে বলেই সে মূর্তি। এখনও যদি দুর্গামূর্তির রকমফের ধরতে চান, কলকাতার মূর্তি আর দিনাজপুর বা জলপাইগুড়ির কোনো গ্রামের মূর্তিকে পাশাপাশি রাখুন। হয়তো দেখবেন, প্রচার ও দৃশ্যমাধ্যমের রমরমা সত্ত্বেও দূরের প্রত্যন্ত জেলার প্রত্যন্ত গ্রামের মূর্তির পরণে লাল পেড়ে সাদা বা স্বর্ণাভ শাড়ি— পট্টবস্ত্র জাতীয়। কলকাতাতেও যে এমনটি পাবেন না, তা নয়। তবে তা পাবেন সাবেকি বাড়ির একেবারে ঘরোয়া পুজোয়। শহুরে পুজোয় মায়ের পোশাকের ঝাঁজই আলাদা।

যাই হোক, যে প্রসঙ্গে কথা বলছিলাম, ফিরে যাই। এর পরবর্তী সময়ে দেবী মূর্তির হাত চার থেকে আট হয়েছে, দশ হয়েছে, আঠারো হয়েছে এমনকি হাজার হাতও হয়েছে। হাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকগুলি পরিবর্তন ঘটেছে। সেই সব পরিবর্তনের দিকেও নজর রাখলে সময়ের সঙ্গে বদলের দর্শনটিও স্পষ্ট হয়ে যায়। আর পোশাক তো আছেই। পোশাকের সাবেকিআনা এখন চাকচিক্যে বদলাচ্ছে।

মধ্যপ্রদেশে চার হাতবিশিষ্ট যে দুর্গামূর্তি পাওয়া গিয়েছে, যা আজও মন্দিরে পুজো পায়, সেখানে দেবীর বাহন হিসাবে দেখা যাচ্ছে একদিকে সিংহ অন্যদিকে হরিণ। আমরা জানি, সিংহের বড়ই প্রিয় খাদ্য হরিণশাবক। তাহলে, কী করে এই দুইয়ের সম্মিলন সম্ভব? খাদ্য-খাদকের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান! সম্ভব। দেবীর মাহাত্ম্যে। সম্ভবত, এই বার্তাটাই দেওয়ার জন্য এই দুই পশু— যাদের সম্পর্ক খাদ্য ও খাদকের— দেবীর বাহন বানিয়ে

দেওয়া হলো। অনেকটা প্রবাদের মতো--- দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্যক্তি প্রসঙ্গে বলতে গেলে যেমন ‘বাঘে গোরুতে একঘাটে জল খায়’ বলা হয়। আবার, স্থানভেদে বাহন বদলেছে। হিমালয় লাগোয়া উত্তর ভারতে ও পশ্চিম ভারতে গুজরাত রাজস্থান, পাঞ্জাব, হিমাচলে দেবী দশভুজা হলেও ব্যাঘ্রবাহনা। সিংহ সেখানে নেই, আছে বাংলার রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। লক্ষ্য করুন, মধ্যপ্রদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গ--- বাঘ যেখানে সশরীরে বিরাজমান, সেখানে দেবীর বাহন সিংহ। গুজরাত থেকে হিমালয়, যেখানে সিংহের বাস রয়েছে সেখানে দেবীর পায়ের নীচে বাহন হয়েছে বাঘ। বিষয়টার মধ্যে যে বৈপরীত্য কাজ করছে, তার পিছনেও একটি বিশেষ ভাবনা বা দর্শন কাজ করেছে। বিশদ ব্যাখ্যায় না গিয়ে সহজ কথায় তা হলো, কাছের শত্রুকে তো চিনি। তাকে না হয় রুখে দেব। কিন্তু অচেনা শত্রু বেশি ভয়ংকর। তার স্বভাব চরিত্র তো জানা নেই। তাকে তাই দেবীর পায়ের নীচে রেখে দাও। দেবীর হাত প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি কথা পরে বলব।

এভাবেই বারে বারে দেবী মূর্তি বা দুর্গা মূর্তিতে বিবর্তন এসেছে। আর প্রতিটি বিবর্তনের পথে কাজ করেছে সমাজভাবনা। প্রত্যেকটি সমাজ দেবীকে তার নিজের মতো সাজিয়েছে। ফলে মূল বা আদিরূপ ক্রমশ বিবর্তিত হয়েছে, আধুনিক হয়েছে। এই প্রসঙ্গে *আনন্দমঠ*-এ বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনা উপমাযোগ্য। তিনি বলছেন, ‘মা যা ছিলেন, মা যা হইয়াছেন, মা যা হইবেন।’ প্রথম রূপ তিনি দেখাচ্ছেন দুর্গা, দ্বিতীয় রূপ কালী এবং তৃতীয় রূপ জগদ্ধাত্রী। বঙ্কিমচন্দ্রের এই ব্যাখ্যায় মাতৃরূপার প্রতি আবেগ ও স্বদেশপ্রেম যতটা আছে, বিবর্তনে বৈজ্ঞানিক, পৌরাণিক বা লৌকিক ব্যাখ্যা ততটাই অনুপস্থিত। হয়তো তিনি সাহিত্যের প্রয়োজনে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

কেন একথা বললাম, তার ব্যাখ্যায় আসি। আমরা জানি, দেবীর আরেক নাম ‘পর্ণশবরী’। রামকৃষ্ণ মিশনের গবেষিকা শ্রীমতী পূর্বা সেনগুপ্তার গবেষণা পত্রে তার বিশদ উল্লেখ আছে। অপর একটি নাম ‘অপর্ণা’। ‘পর্ণ’ অর্থে পাতা। কোনো কোনো কাহিনীকার বলেন, দেবী যখন মহাদেবের জন্য আরাধনা ও সাধনা করেছেন তখন তিনি কেবল পাতা ভক্ষণ করতেন। তাই তাঁর নাম ‘অপর্ণা’। এই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। ‘অপর্ণা’ শব্দের অর্থ ‘পাতাহীন’, অর্থাৎ একটি পাতাও তার সঙ্গে নেই। আমরা কালিদাসের *কুমারসম্ভব*-এ পড়েছি, উমা এই সময়ে গলাজলে নিরাভরণ হয়ে দাঁড়িয়ে মহেশ্বরের কামনায় সাধনা করতেন। অর্থাৎ, তার শরীরে তখন একটি পাতাও থাকত না লজ্জা নিবারণের জন্য। তাই তিনি ‘অপর্ণা’।

লোকসংস্কৃতিতে দেখছি, দেবীর আরেক নাম নগ্নশবরী। দেখুন, নগ্নশবরী ও পর্ণশবরী দুটি নামের সঙ্গেই ‘শবর’ শব্দ দুটি রয়েছে। ভারতীয় যাদুঘরের প্রাক্তন অধিকর্তা ড. শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী জানাচ্ছেন, আদি সমাজে শবরদের দুটি ভাগ ছিল— নগ্নশবর ও পর্ণশবর। সেই সমাজ ছিল তখন মাতৃতান্ত্রিক। বহু জায়গায় আজও আদিবাসী সমাজ মাতৃতান্ত্রিক। নগ্নশবর সমাজের যিনি অধীশ্বর ছিলেন, তার আসল নাম যাই হোক, তিনি নগ্নশবরী। এই নগ্নশবরীর নেতৃত্বে নগ্নশবররা স্থানীয় পর্ণশবরদের যুদ্ধে পরাজিত করে। পর্ণশবররা নগ্নশবরীর অধীনস্থ হয়। ভাগবতে এই পর্বে দেবীকে বলা হয়েছে ‘সর্বশবরানাং ভগবতী।”

যেভাবে দেবীর রূপ বিবর্তনের প্রসঙ্গ আমরা পেয়েছি, ঠিক সেই ধারাতেই প্রাচীন সমাজের পর্ণশবররা দেবীকে তাদের মতো করে পাতার পোশাকে সাজান। কটিতটে পাতার বেষ্টনী, গলায় পাতার মালা। কৃষ্ণাঙ্গী শবরকন্যা পাতার সাজে বা পর্ণে সজ্জিতা হয়ে নতুন নাম পেলেন ‘পর্ণশবরী’।

এই প্রসঙ্গে কানকি ও কোবালম নামে দুই পর্যটকের একটি বর্ণনা উল্লেখের দাবি রাখে। তামিলনাড়ুর কাহিনী। ষষ্ঠ শতকে তারা এক বনে রাত্রিবাস করতে বাধ্য হন। তারা দেখেন, অস্ত্রে সজ্জিত একদল মারবার যোদ্ধা (বস্তুত শবর) যুদ্ধে যাওয়ার আগে এক নগ্না দেবীর সামনে মদ্যপান করছেন ও নিজেদের শরীরের রক্তে পুজো দিয়ে যুদ্ধে বিজয় কামনা করছেন। সেই দেবী কৃষ্ণাঙ্গী। কল্পনা করুন তো, কোন্ কৃষ্ণাঙ্গী ও নিরাভরণা দেবীকে আমরা শত্রুদমনের দেবী বলে মনে করি, পুজো করি? তিনিই তো মহাকালী। তিনিই তো দশমহাবিদ্যার প্রথম এবং আদিরূপ। তারই কিছুটা প্রাকৃত রূপ অন্যভাবে পাওয়া গেছে নাগৌরে— মহিষমর্দিনী।

প্রসঙ্গ যখন এসেই গেল, তখন মহিষমর্দিনীর প্রসঙ্গেও দুটি কথা বলা ভালো। কোথাও কোথাও দেবীকে ‘মহিষাশূরমর্দিনী’ বলেও ব্যাখ্যা করা হয়। দুটি নামের মধ্যে ফারাক কেবল ‘শূর’ শব্দে, যা ইদানীং বাংলা বানানে ‘শূর’ থেকে ‘সুর’ হয়ে যাচ্ছে। আমরা জানি ‘শূর’ অর্থে রাজা। একসময় বাংলায় রাজত্ব করেছেন কর্ণাট-এর রাজা আদিশূর ও তার বংশধরেরা। আজকের বিষ্ণুপুর অঞ্চলে তারা রাজধানী বানিয়েছিলেন। শ্রীশ্রী চণ্ডীতে বা ভাগবতে পাওয়া যায়, দেবী মহিষাশূরকে বধ করার আগে বলছেন, ‘‘তিষ্ঠ! তিষ্ঠ! ক্ষণঃ তিষ্ঠঃ!’’ তারপর তিনি মধ্যিপান করছেন। কারণ, শূরেরা রুদ্র বংশজাত। রুদ্র অর্থে মহাদেব। পুরাণকাহিনী মানলে, তাঁরা দেবী দুর্গার শ্বশুরকুলের লোকজন। তাকে হত্যা করার আগে দেবী তাই নিজের শক্তিকে সংহত করতে মধ্যিপান করছেন। (কিন্তু এই শূরেরা বা অসুরেরা কারা? ইতিহাস বলছে, প্রাচীন কালে মধ্যপ্রাচ্যের পরাক্রমী রাজা অসুরবণিপাল ও তার বংশধরেরা ভারতের দাক্ষিণাত্য জয় করেছিলেন। রাহুল সাংকৃত্যায়নের ব্যাখ্যায় তারা ছিলেন সেই সময়ে উন্নত সভ্যতার ধারক। জল সংরক্ষণ, জলনিকাশী, উন্নততর দুর্গ গড়ায় তাদের সমকক্ষ কেউ ছিল না। তবু তারা শেষপর্যন্ত তৎকালীন আর্যজাতির কাছে পরাস্ত হয়েছিল। তাদের নিজেদের মধ্যে বিভাজন ও দ্বন্দ্বই তার প্রধান কারণ ছিল। ভারতীয় সভ্যতা তখন মাতৃতান্ত্রিক। আর অসুরবণিপাল নিয়ে এসেছেন পুরুষতন্ত্র। এই দুই ধারার লাগাতার সংঘর্ষ জারি ছিল। আদিবাসী অসুরবণিপালের পরবর্তী প্রজন্ম ধীরে ধীরে অনেক ধারায় বিভক্ত। কেউ মহিষাসুর, কেউ হস্তিকাসুর, কেউ বিড়ালাক্ষী, কেউ ঘোটকাসুর। সবার সঙ্গেই সেই শবরদেবীর যুদ্ধ হয়েছে। দেবী জিতেছেন ঐক্যের শক্তিতে। এই যে এই ভাগের কথা বললাম, খেয়াল করুন, প্রত্যেকটি ভাগের সঙ্গে একটি প্রাণীর নাম সংযুক্ত। এরা কিন্তু মানুষই। তফাৎ হলো, ধারার পার্থক্য বোঝাতে তাদের প্রতীক বা টোটেম ব্যবহার। তাদের রাজমুকুটে সেই প্রাণীর চিহ্ন বহন করা হতো। মোষের সিং, হাতির শূর, ঘোড়ার মাথা বা বিড়ালের চোখ তাদের টোটেম ছিল। সেই কারণেই নামের পার্থক্য। আমরা শ্রীশ্রী চণ্ডীতে এস সব অসুরদের সঙ্গে দেবীর সংগ্রাম ও বিজয় কাহিনী পাই।

মহিষাশূর নিজে ছিলেন দেবী চামুণ্ডার উপাসক। সেই দেবী চামুণ্ডাই কালী। দুর্গা নয়। মহিষাশূরের রাজ্য আজও তার নাম বহন করে— মাইশোর বা মহীশূর। মহিষাশূর নয়। মহীশূরের চামুণ্ডা মন্দিরের বাইরে মহীশূরের বিশাল মূর্তি আজও পুজো পায়।

এই প্রসঙ্গে চলে আসি দেবীর বাসস্থান প্রসঙ্গে। তাঁকে আমরা পাই কৈলাসের ঘরনী, হিমালয়দুহিতা

হিসাবে। তাহলে তিনি কৃষ্ণাঙ্গী কি করে হবেন? আর কৃষ্ণাঙ্গীর বিশ্বাসযোগ্যতা যদি বেশি হয়, তাহলে তিনি হিমালয়কন্যা হবেন কী করে? এখানে একটি দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হচ্ছে। আমরা দেখেছি তাকে তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশে সেই প্রাচীন কালেই। তাঁকে আরও একটি পরিচয়ে আমরা পাই— দেবী বিন্ধ্যবাসিনী। অপূর্ব! বিন্ধ্যবাসিনী, অর্থাৎ, বিন্ধ্যাচলের অধিবাসী। বিন্ধ্যাচল অর্থে কর্নাটক-ছত্তীসগড়-মধ্যপ্রদেশ এলাকা! তাই কি তিনি দুর্গা?

নানা ধরণের পৌরাণিক কাহিনীতে আমরা নারী চরিত্রকে পেয়েছি তার জন্মস্থানের বা বাসস্থানের পরিচয়ে। নারীর আসল পরিচয় গোপন করতেই কাহিনীকারেরা এই পথ বেছে নিয়েছিলেন। কোশলরাজ্যের কন্যা তাই কৌশল্যা, কেকয়কন্যা 'কৈয়েয়ী'। দ্রুপদ রাজার মেয়ে 'দ্রৌপদী'। রাজা কুন্তিভোজের মেয়ে 'কুন্তি'— এদের কী সত্যি অন্য কোনো নাম ছিল না? যেমন নাম পেয়েছি অম্বা-অম্বালিকা বা চিত্রাঙ্গদার? নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু বাস্তবের নারীকে তার সম্ভ্রম রক্ষার সুযোগ দিয়ে জন্মস্থান বা বাসস্থানের নামে চিহ্নিত করা ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। বিন্ধ্যাচলে আমরা পাচ্ছি 'দুর্গ' নামে একটি জেলা ও নগরের কথা। বনভূমি এলাকা বস্তার-দুর্গ-এর মানুষ কৃষ্ণাঙ্গ, আদিবাসী। এখনও সেখানকার পাহাড়বাসী ডোঙ্গরিয়া কোন্ধ জাতির মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা খানিকটা হলেও টিকে আছে। হাজার হাজার বছর আগে দুর্গের সেই শবর সমাজের দোর্দণ্ডপ্রতাপ অসুরদলনীর সাহিত্যিক নাম কী হতে পারে। দুর্গা ছাড়া আর কিছু হয় কি! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সেই কৃষ্ণাঙ্গী পর্বতায় দেবীই দুর্গা।

দেবীর বাহন প্রসঙ্গে লেখার সময় বলেছিলাম, হাতের সংখ্যা বিষয়ে পরে আবার ফিরে আসব। এখন, সেই প্রসঙ্গে আসি। এই প্রসঙ্গ তার সামাজিক ব্যাখ্যা। একসময় আর্যসমাজের এক সন্ন্যাসী বলছিলেন, দেবীর যদি অতগুলি হাত বাস্তবে হতো, তাহলে দেবীকে বলা হতো বিকলাঙ্গ। কিন্তু তিনি বিকলাঙ্গ নন। তিনি সাধারণ মানুষের মতো দুটি হাতেরই দেবী। মাতৃতান্ত্রিক ও পিতৃতান্ত্রিক সমাজ যখন যৌথ ভাবে উভয়েরই শত্রুর বিরুদ্ধে দেবীর নেতৃত্বে লড়লেন ও জয় পেলেন তখন দেবীর চার হাত কল্পনা করা হলো। নারীর দু'হাতের সঙ্গে জুড়ে গেল আরও দুটি হাত— পুরুষের। এবার ধীরে ধীরে সমাজে বর্ণভেদ প্রথা এল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের চার দুগুণে আট হাত জুড়ল নারীর দু'হাতের সঙ্গে। নারীর দু'হাতই রইল, পুরুষের হলো আট হাত। কেন এমন হলো? কারণ, বর্ণভেদ এল পুরুষের জন্য। নারী যে সমাজে বাস করলেন বা বিয়ে হয়ে গেলেন, তিনি সেই বর্ণের হলেন। নারীর নিজস্ব বর্ণ নেই। কিন্তু, বর্ণবিভক্ত সমাজেও যে কোনো বর্ণের চেয়ে নারীর সংখ্যা অনেক বেশি। এবং নারীই নেতৃত্ব দানের অধিকারী হলেন। তাই অসুরবধের মূল অস্ত্র বর্শা বা ত্রিশূল রইল দেবীর নিজস্ব দু'হাতেই।

□□ মাতৃতান্ত্রিক ও পিতৃতান্ত্রিক সমাজ যখন যৌথ ভাবে উভয়েরই শত্রুর বিরুদ্ধে দেবীর নেতৃত্বে লড়লেন ও জয় পেলেন তখন দেবীর চার হাত কল্পনা করা হলো। নারীর দু'হাতের সঙ্গে জুড়ে গেল আরও দুটি হাত— পুরুষের। এবার ধীরে ধীরে সমাজে বর্ণভেদ প্রথা এল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের চার দুগুণে আট হাত জুড়ল নারীর দু'হাতের সঙ্গে। নারীর দু'হাতই রইল, পুরুষের হলো আট হাত। কেন এমন হলো? কারণ, বর্ণভেদ এল পুরুষের জন্য। নারী যে সমাজে বাস করলেন বা বিয়ে হয়ে গেলেন, তিনি সেই বর্ণের হলেন। নারীর নিজস্ব বর্ণ নেই।

দেবী ফসলের, প্রজননের

দেবী অরণ্যচারিণী। এটিও তারই নাম। স্বাভাবিকই। মহাকবি দেখিয়েছেন, কার্তিকের জন্মের প্রয়োজনেই মহেশ্বর বিয়ে করেন উমাকে। অর্থাৎ, সেই বহুচর্চিত 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা'। আর ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শতাব্দীর পুঁথি বলছে, দেবীর পুজোয় মদ্যপান ও অবাধ যৌনাচারের রীতি ছিল। এমনিতেই আদিবাসী সমাজের মহিলারা কোনো পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিলেন না। এমনকি তারাই স্বয়ম্বরা হয়ে স্বামী বাছতেন। প্রাচীন সমাজে আজকের সামাজিক রীতিও ছিল না। ছিল, 'কা তব কান্তা, কস্তে পুত্রাঃ'। নিজের স্ত্রী, নিজের সন্তান— এমনটা নয়। তাই, যে কোনো পুরুষ ও যে কোনো নারীর মধ্যেই যৌন সম্পর্ক ছিল একটি স্বাভাবিক ঘটনা। সন্তান হতো সকলের সন্তান (রাহুল সাংকৃত্যায়নের *ভোল্‌গা থেকে গঙ্গা*-র প্রারম্ভিক অধ্যায় 'দিবা' দ্রষ্টব্য)। তাই মিলনের উদ্দেশ্য ছিল একটিই— সন্তানকামনা। প্রজনন। দেবী তাই প্রজননেরও দেবী।

এই প্রজননের প্রতীক আজও বজায় আছে দেবী পূজায়। একটি সহজ প্রতীক হলো, দেবীমূর্তি গড়তে অবশ্যই, একটুখানি হলেও, নিতে হবে পতিতালয়ের মাটি। যৌনকর্মীর ঘরের মাটিকে 'পবিত্র' গণ্য করা হলো। কেন? কারণ, ঐ একটি অঞ্চলেই 'দিবারাত্র' প্রজনন প্রক্রিয়া চালু থাকে।

দ্বিতীয়ত, দেবী পুজোয় আবশ্যিক কয়েকটি উপকরণ হলো ঘট, স-শীষ ডাব, লক্ষ্মীর ঝাঁপি এবং কোষাকুষি। কোষাকুষির আকার নারীর জননাঙ্গের একটি বৃহৎ ও একটি অপেক্ষাকৃত ছোট রূপ। তার জল বার করার অংশটি নারীর গর্ভাশয় থেকে সন্তান জন্ম নেওয়ার পথ ইঙ্গিত করে।

জলপূর্ণ ঘট-এ দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। জলপূর্ণ ঘট নারীর গর্ভের প্রতীক। গর্ভেই প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় সন্তানের, জলের মধ্যে। বাইরে মাতৃগর্ভের আচ্ছাদন তাকে রক্ষা করে। ঘট সেই প্রতীক হয়ে উঠেছে মাতৃপুজোয়। একই ভাবে, লক্ষ্মীর ঝাঁপিও একই প্রতীক। বাইরের আস্তরণ কঠোর, ভিতরে ধান রাখার অর্থ বীজ সঞ্চার। ঝাঁপির গায়ে ও উপরে রয়েছে কড়ি। কড়ির একটি ভাগ উঁচু, একটি সমতল। সমতল অংশে দু-পাশের মাঝখানে অসংখ্য খাঁজ সহ একটি বিভাজিকা উপর থেকে নীচে। নারীর জননাঙ্গের এর চেয়ে ভালো প্রতিরূপ আর কোথায়?

পুজোয় যে ডাব লাগে, তা স-শীষ হতেই হবে। কেন সশীষ? কারণ, ডাবের শীষ মাতৃগর্ভে সন্তানের সঙ্গে মায়ের যোগসূত্র নাড়ি-র প্রতিরূপ। প্লাসেন্টা। খেয়াল করুন, নারকেল গাছের সঙ্গে সন্তান ডাবও ঐ শীষ, যা প্লাসেন্টার প্রতিরূপ, তা দিয়েই যুক্ত থাকে। এছাড়া, কঠিন খোলার অভ্যন্তরে ডাবের জলেই নারকেল ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হয়। নদী-সমুদ্রে অনেকদিন লোনাজলে ভাসতে ভাসতে কোনো কূলে ঠেকে গেলে সেখানেই তারা গজায়। অঙ্কুরিত হয়। লোনাজল থেকে ভেতরের শাঁস বা বীজকে রক্ষা করে এই কঠিন আস্তরণ, মায়ের গর্ভের মতো।

প্রজননের আরেকটি উদাহরণ দিই। একমাত্র দুর্গাপুজোতেই দেবীর বোধন হয়, অন্য কোনো দেবীর বোধন হয় না। বোধন হয় নবপত্রিকার, বেলতলায়। একটি বেলগাছের পাতাসহ ডাল

পুঁতে, সেখানে নয় রকমের শস্যে হয় দেবীর বোধন। বেলডালের সঙ্গে দুটি বেলকে এমন ভাবে পাশাপাশি বাধা হয়, যে নারীর স্তনরাজি। অথচ, বেল গাছ পুরুষের প্রতীক। তার গায়ে স্তন জুড়েছে। অর্থাৎ প্রজনন প্রক্রিয়া চলছে। শিবদুর্গার মিলনক্ষণ। তার সামনে যে নয়টি গাছের চারাকে (নবপত্রিকা = ৯ ধরণের নতুন পাতা) বোধন করা হয়, তার মধ্যে আছে ধান, মানকচু, যব, হলুদ ইত্যাদি। পাতাগুলি এমন শস্যের যার প্রতিটি ধারেই অনেক ফসল জন্ম নেয়। দেবীর বোধন ও কল্পারম্ভের পর প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। সেখানেই তার পর চলে পুজোর পর্ব। ভাসানও হয় সেই ঘটেই। অর্থাৎ, জলেই বিলীন হলো, পরবর্তী জন্মের জন্য বীজ রেখে।

এই প্রতীকী আচার-উপাচারের মধ্যে দিয়ে আসলে পুজো করা হয় ফসলের। মনে রাখা ভালো, বর্ষার পর নবশস্যের সম্ভারে ও নব অঙ্কুরোদ্গমে বাংলার কৃষিসমাজে যখন স্বচ্ছলতা আসে, দেবীকে আমরা তখনই বরণ করি। এ কারণেই চৈত্র মাসের বাসন্তী পুজোর থেকে শারদীয় পূজা বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছে। বরং, চৈত্রের খরায় আগামী ফসলের অনিশ্চয়তা কাটাতে দেবীর পুজোকেই 'অকালবোধন' বা 'আকালবোধন' নাম দেওয়া যুক্তিযুক্ত হতো।

সংবাদে প্রকাশ, অতি বৃষ্টির খামখেয়ালিপনায় এ-বছর ধান উৎপাদনে অনেকটা ঘাটতি থাকবে। তার একটি কারণ যদি অতিবৃষ্টি হয়, অপর কারণ নিশ্চিত ভাবেই লক্ষ লক্ষ একর কৃষিজমিকে সরকারি পরিকল্পনায় অকৃষিতে বদলে দেওয়া। ফলে শস্যের আকাল দেখা দিচ্ছে। যেখানে যেখানে এ ভাবে কৃষিজমিকে অকৃষি করার চেষ্টা হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মানুষ প্রতিবাদমুখর হচ্ছেন। আর, তার সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন মা-বোনেরা। কোথাও তারা কৃষ্ণাঙ্গী, কোথাও শ্যামবর্ণা, কোথাও তাদের রং শেফালি ফুলের মতো উজ্জ্বল। এমনকি পীতবর্ণাও। চিনের মাটিতে তারা লড়ছেন জমি ও ফসল বাঁচাতে। অর্থাৎ, সেই পুরনো অঙ্কে, ফসলের রক্ষাকর্ত্রীরা তাড়াচ্ছে বনের মোষ। তার লেজ ধরে মর্দন করছেন মহিষমর্দিনীরা। পালাতে হচ্ছে বুনো মোষ টাটা-সালিমদের।

এবারের দুর্গাপুজো তাই পালিত হোক ফসল ও ফসলের জমি, শিবের কর্মস্থল, কৃষিজমি রক্ষার নামে।

জয় হোক সেই দুর্গার! জয় দুর্গতিনাশিনীর।□

সংগ্রহ

গান্ধর্বী-গাথা

দেবজিত বন্দ্যোপাধ্যায়

আঠারো শতকের শুরুর দিন থেকেই শহুরে কলকাতা তথা বাংলার নবাব-রাজা-জমিদার-বিত্তশালীদের বিনোদনী জগৎ ঘিরে থাকত বেশ্যা-বাইজির প্রিয়সঙ্গ। অনুসঙ্গ ছিল গান। তাই বেশ্যা বা পল্লিতে বৃত্তিমূল হয়ে ওঠে গান। অতিথিকে কতটা আনন্দ বিতরণ করবে, কতটা আনন্দ গ্রহণ করবে নিজে, তা পরিমাপ করার অধিকার কার্যত সীমাবদ্ধ ছিল বার-পল্লিতে। তাঁদের কর্মসংস্কৃতি তথা বিনোদ-চর্চা পুরোপুরিই ছিল সমাজপতি আর ধর্মপতিদের দখলে। তাঁদের আনন্দ সম্ভোগ ছিল বহু-নিষেধে ঘেরা। সময়-রুচির পরিবর্তনে পালটেছে বাধার রূপারোপ। উত্তরোত্তর বদলেছে গান্ধর্বী-গাথা। জীবন-মৃত্যুর সহবাসে বেশ্যা-বাইজির দিনগত বৃত্তিকর্মে গানই ছিল পারাপার-কাণ্ডারী। গানেই মুক্তির আনন্দ, গানেই বেদনার আর্তি। তাঁদের জীবনপাত-যশোগাথায় বৈতরণী পার হয়েছেন মঞ্চ-চিত্রের বহু-প্রতিভাধর। অথচ অন্তরে-বাহিরে সদা-প্রকাশ 'পাছে লোকে কিছু বলে'।

থিয়েটার সিনেমার পাশাপাশি মধ্য উনিশ শতকে দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরের এক বারাঙ্গনার সাহচর্যে বেহালাবাদক প্যারীমোহন গড়ে তোলেন এক যাত্রাদল। 'বেলতলার দল' নামে তাদের প্রসার ঘটে। অন্য আরেক যাত্রাদলের হদিশ মেলে— যে দলের নেত্রী ছিলেন রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের রক্ষিতা। সে দলে বারাঙ্গনা-গায়িকারা যোগ দিয়েছিলেন। বিশ শতকের সূচনায় মহিলা পরিচালিত যাত্রাদল হিসেবে খ্যাতি পায় ত্রৈলোক্যতারিণীর দল। ত্রৈলোক্যতারিণীর বাস ছিল কলকাতার সোনাগাছিতে। মতিলাল রায়ের যাত্রাধারায় গড়ে উঠেছিল এই দল। পুরুষদের পাশাপাশি দল জুড়ে অভিনয় করতেন সোনাগাছির বারাঙ্গনারা। বিনোদকর্তা পুরুষের বিনোদিনী নারীর শাশ্বত মুক্তির আলো সংগীত, মূলত গান।

কখনও সে গান চটুল:
রমণী সখের জলপান, ঠিক যে আঠারো ভাজা!
নারীর প্রেমে যে মজেছে, সেই পেয়েছে তারি মজা।।

কখনও গানের বিষয় দেহতত্ত্ব :
এল প্রেম-রসের কাঁসারি
আয় সই ভাঙা ফুটো বদল করি
একটি নয় সেই ছিদ্র নটা, রসবিহীনে অন্তর ফাটা,
জল থাকে না একটি ফোঁটা, আঠার যত সারি।

আবার কখনও গানের অবলম্বন আধ্যাত্মিকতা :
আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল
সকলই ফুরায়ে যায় মা
জনমের শোধ, ডাকি গো মা তোরে
কোলে তুলে নিতে আয় মা।

এমনকী মেলে পল্লিসঙ্গী জীবনগাথা
জনম আমার শুধু সহিত যাতনা
জীবন ফুরায়ে এল, আঁখিজল ফুরাল না।।
এমনি অদৃষ্ট ঘোর, জনমেও সখি মোর,
পুরিল না জীবনের একটি কামনা।।

এ যেন বিনোদনের করিডোর দিয়ে হেঁটে চলা— দুধারের ঘরে ঘরে বদল হয় রূপসজ্জা— ফুলের গন্ধ— নুপূরের নিক্কণ। তবলা, সারেঙ্গি আর হারমোনিয়ামের মূর্ছনায় শোনা যায় ভিন্ন চরিত্রের গান। গায়িকাদের তালিম চলে ঊষায় আর বিরামগভীর দিনান্তে বহু পথিক-বন্ধু রচনা করে শেষ-রজনীর সুপ্তগীতের মালা। প্রয়োজন আর প্রয়োজনাতীত, প্রাকৃতিক আর মানবিক, তন্ময় শরীর আর হীনঅর্থ ভাবনা দুয়েরই পরিচর্যা হয় গানে গানে।

একদিকে যেমন আছে দর্শন অন্যদিকে তেমনই ইতিহাস।□

স্মৃতির সরণী বেয়ে : মেদিনীপুর শহরের সেকাল একাল

বিপ্লব মাজী

মেদিনীপুর শহর জঙ্গলমহলে। শহরে কোনো পিচের রাস্তা নেই। সবপথই লাল কাঁকুরে মাটির মোরামঢালা পথ। শহরের উত্তর ও পশ্চিম দিক জঙ্গল ঘেরা। দক্ষিণ ও পুব দিকে কাঁসাই বা কংসাবতী নদী প্রবাহিত। মেদিনীপুর ৮০০ বছরের প্রাচীন শহর। ব্রিটিশরা ১৭৮৩-র ২২ সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর শহরকে জেলার প্রধান কেন্দ্র ঘোষণা করে। শৈশবে, বিগত শতকের পাঁচের দশকের প্রথমার্ধে, মেদিনীপুর শহরে যেদিন প্রথম প্রবেশ করি জানতাম না এ শহরের স্থায়ী বাসিন্দা হব। আমার জন্ম তমলুক শহরে (যার সুপ্রাচীন পরিচিতি তাম্রলিপ্ত বন্দর বলে। পরে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রামে স্বাধীন তাম্রলিপ্ত সরকার গঠিত হওয়ায় তমলুক শহর আধুনিক সময়েও বিখ্যাত হয়ে ওঠে।) প্রাচীন কালে গৌড়, পুন্ড্র, বঙ্গ, সমতট, সুহ্ম, রাঢ়, তাম্রলিপ্ত এইসব জনপদ বিখ্যাত ছিল। অষ্টমশতক পর্যন্ত তাম্রলিপ্ত সারা ভারতে সুপরিচিত বন্দর ও বাণিজ্য-নগর হিসেবে পরিচিত ছিল। পরে সরস্বতী নদীর প্রবাহ-পথ বুজে যাওয়ায় এবং ভাগিরথী নদীর প্রবাহপথ খুলে যাওয়ায় তাম্রলিপ্ত বন্দর ধীরে ধীরে হারিয়ে যায়। মেদিনীপুর নামের কথা তখন কেউ জানত না। কেউ বলেন ওড়িশা শাসক প্রাণকরের ছেলে মেদিনীকর-এর নামে মেদিনীপুর নামটি এসেছে। আবার কেউ বলেন ওড়িশার গঙ্গ-বংশের রাজা অনন্ত বর্মা চোড়গঙ্গ এবং পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় ও চতুর্থ নরসিংহের লিপি থেকে যে 'মিধুনপুর'-এর উল্লেখ পাওয়া যায় তাই পরে মেদিনীপুর হয়েছে। *আইন-ই-আকবরী* এবং গোপীজনবল্লভ দাসের *রসিকমঙ্গল* কাব্যে (ষোলো শতক), সতেরো শতকে রেনেলের মানচিত্রে মেদিনীপুরের নাম পাওয়া যায়। প্রায় একই সময়ে ফনে ডেন ব্রুকের লেখাতেই মিডনাপোয়ার (Midnapoer) নামটি পাওয়া যায়। মেদিনীপুর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পীঠস্থান। উপনিবেশবাদী ব্রিটিশরাও মনে করতেন মেদিনীপুর Land of Revolt। ১৭৬৭-১৮১২ চুয়াড় বিদ্রোহ, ১৮০৬-১৮১৬ নায়েক বিদ্রোহ, ১৮৩৭-এ জমিদার বিদ্রোহ মেদিনীপুরকে ব্রিটিশ উপনিবেশ বিরোধী সংগ্রামে অগ্রদূত করে তোলে। বিগত শতকের তিনের দশকে এই শহরে তিনজন জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট গুলিবিদ্ধ হন। শহরের বহু তরুণ ফাঁসিকাঠে প্রাণ দেন। যা আজ ভারতের গর্বের ইতিহাস।

তমলুক শহর থেকে পাশকুঁড়া স্টেশন হয়ে বাবা-মা-আমি ও দুবোন খড়গপুর রেল জংশন হয়ে প্রথম মেদিনীপুর স্টেশনে পৌঁছোই। খড়গপুর জংশন তখন কয়লার কালো ধোঁয়ার শহর। সবসময় রেলগাড়ির ইঞ্জিনের শব্দে সচকিত। ব্রিটিশ আমলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তৈরি রেলব্রিজ পেরিয়ে মেদিনীপুর স্টেশনে নেমে বাইরে বেরিয়ে দেখি স্টেশনচত্বর জুড়ে কয়েকডজন ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। স্টেশনটাও যেন রূপকথার একটা বাড়ি। শহরে তখনো মানুষের পায়ে টানা রিক্‌শা আসেনি। ঘোড়াগুলো চিঁহিহি করছে। ঘোড়ার গাড়িগুলো দেখতে সুন্দর! তবে ঘোড়ার বিষ্ঠার তাজা গন্ধে স্টেশন চত্বর ম ম করছে!

ঘোড়ার গাড়িতে বাক্‌সো-পেঁটরা নিয়ে আমরা উঠলাম। কোচোয়ানের গলার আওয়াজে আর চাবুকের শব্দে ঘোড়ার গাড়ি চলতে শুরু করলে পথের লাল ধুলো উড়িয়ে। স্টেশন থেকে জেলা হাসপাতাল পর্যন্ত বেশ নির্জন রাস্তা (যে অঞ্চলে এখন শহরের নগরায়ণ চলছে)। নান্নুরচক পেরিয়ে বটতলা চক এল। বটতলার কালীমন্দিরের পাশ দিয়ে গাড়ি গোলকুঁয়া চকের মোড়ে এল। এই মোড়ে অনেক ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে। গোলকুঁয়া চকে মোড় ঘুরে গাড়ি বাংলা স্কুল (আগে নাম ছিল হার্ডিঞ্জ স্কুল), মিছরি কারখানার পাশ দিয়ে ভোলা পিরিদের রাসমঞ্চের সামনে এসে দাঁড়াল। মেদিনীপুর শহরের এক একটা অঞ্চলের নাম তখন 'বাজার' বা 'পুর' দিয়ে। বড়বাজার, ছোটবাজার, মিরবাজার, সিপাই বাজার, হবিবপুর, মানিকপুর, মহাতাবপুর, সেখপুরা, বাড়মানিকপুর, নতুন বাজার, খাপ্রেলবাজার, মিঞাবাজার, বক্সিবাজার, পাটনা বাজার, কোতবাজার ইত্যাদি। আমরা যেখানে এলাম সে জায়গাটা এক রকম শহরের কেন্দ্রস্থল মিরবাজার— বড়বাজার ও ছোটবাজার সংলগ্ন। তখন এইসব অঞ্চল থেকে একটু দূরে জেলা কালেকটরেটের কাছে বার্জটাউন ছিল সাহেবপাড়া। ওখানে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, বিভিন্ন অফিসার, মেদিনীপুর-উত্তর ও দক্ষিণের এসডিও-রা থাকতেন। এছাড়া কয়েকঘর ধনী ব্যক্তি—যাদের শহরের আশেপাশে প্রচুর জমি-জমা ছিল। তখনকার ফাঁকা বার্জটাউন বর্তমানে ঘিঞ্জি এলাকা।

ভোলাপিরিদের রাসমঞ্চের পাশের সরু-গলির (একটা মোটর সাইকেল বা স্কুটার কোনোমতে যাবে) দ্বিতীয় একতলা বাড়িতে আমরা থাকব। মেদিনীপুর শহরে তখন বিদ্যুৎ সরবরাহ করে ইলিয়াস ইলেকট্রিক কোম্পানি। কয়লা পুড়িয়ে

তাপ-বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। স্বভাবতই শহরের ধনী ব্যক্তিদের ইলেকট্রিক আলো ছিল এবং তার তেজ ছিল এখনকার পঁচিশ-ওয়াট বালবের মতন। শহরের প্রধান রাস্তাগুলোতে বিদ্যুতের আলোর ল্যাম্প পোস্ট থাকলেও তার আলো বেশ স্তিমিত ছিল। শহরের সমস্ত গলিপথের মোড়ে মোড়ে জ্বলত 'গ্যাস-বাতি'। গ্যাস-বাতি বলা হলেও সেগুলো ছিল দু-তিন মানুষ উচ্চতায় বসানো চতুর্ভুজ-চিমনি (যা আধুনিক দিল্লী শহরে সৌন্দর্যবর্ধনে নিওন আলো বা ফ্লুরোসেন্ট আলোয় বিভাবিত)! প্রতিদিন সন্ধেবেলা মিউনিসিপ্যালিটির একজন লোক কাঁধে মই ও মাথায় কেরোসিনের টিন নিয়ে এসে বাতিগুলো জ্বেলে দিতে যেত। এঁদের বলা হতো বাতিওলা। ছেলেবেলায় আমার এক পরিচিত বাতিওয়ালার কাছে শুনেছিলাম, এ-কাজের জন্য মিউনিসিপ্যালিটি থেকে (বিগত শতকের পাঁচের দশকে) মাইনে পান পনেরো টাকা। ফলে শহর একরকম চাঁদের আলোর শহর। শহরের বেশির ভাগ লোক হ্যারিকেন, ডিবরি বা লম্ফ ব্যবহার করতেন। বাজারে তখন ছোট বড় নানা মাপের হ্যারিকেন, লম্ফ ও চিমনি পাওয়া যেত। ঠাকুর বিসর্জন, বা কোনো বিয়েবাড়ির শোভাযাত্রায় গ্যাসলাইট ব্যবহার হতো। হ্যারিকেন লাইট ছাড়াও, এক একজন লোক কাঁধে করে গ্যাসলাইটের ঝাড় বয়ে নিয়ে যেত। যে কোনো শোভাযাত্রাকে তখন বেশ মায়াবী লাগত।

ছোটবাজার তখনও মার্কেট হয়ে ওঠেনি। শহরের একমাত্র মার্কেট বড়বাজার। বড়বাজারের দোকান-পাট ওড়িয়া প্রভাবিত। বেশির ভাগ দোকানেই হ্যারিকেনের আলো। মাড়োয়াড়ি দোকানে দোকানে হ্যাজাক-লাইট বা হ্যারিকেনের লাইট। দু-একটি দোকানে বিদ্যুতের আলো। সে-সময় বড়বাজার মার্কেটটাকে মনে হতো যেন ওড়িশারাজ্যের কোনো মার্কেট। সত্যিই তো, একসময় মেদিনীপুর উৎকলেরই অংশ ছিল।

মালভূমি অঞ্চল বা ল্যাটারাইট জমি বলে শীতকালে শহরে যেমন শীত, গ্রীষ্মকালে তেমনি গরম। সরকারি অফিস, স্কুল-কলেজে হাতে টানা পাখা ব্যবহার হতো। আমরা যখন কলেজিয়েট স্কুলের প্রাইমারি বিভাগে পড়তাম— দেখতাম ক্লাশের পেছন দিকে বসে একজন মানুষ মাথার ওপর ঝোলানো দুটো পাখা দড়ি দিয়ে টানছে। একেবারে মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা! সরকারি অফিসগুলোতেও একই ব্যবস্থা। তখনও ইলেকট্রিক-ফ্যান অন্তত মেদিনীপুর শহরে আসেনি। স্কুলে আমাদের টিউশন ফি-র সঙ্গে পাঙ্খাওলার ফি দিতে হতো। বর্ষাকালে বৃষ্টির দাপটে শহর লাল কাদায় থক থক করত। সেজন্যে মেদিনীপুরবাসীরা বেশ গর্ব করত লাল মাটির দেশের লোক বলে।

শহরের প্রতিটি মোড়েই ছিল মিষ্টির দোকান। চা-দোকান, মুড়ি-তেলেভাজার দোকান। প্রতিটি মোড়ই সকালবেলা মুখরিত হতো নানা গল্প-গুজব আড্ডায়। সেইসঙ্গে গরম গরম তেলেভাজা ও চা খাওয়া। সব্জি বাজার সেরে, মিষ্টির দোকান থেকে ঠাকুরপুজোর সন্দেশ, প্যাঁড়া আর বাড়ির খাওয়ার মিষ্টি কিনে ঘরে ফেরা। জিলিপি, নিম্‌কি, ক্ষীরের গজা, খাস্তাগজা, কাঠিগজা, জিবেগজা, মিহিদানা, গুড়ের শুঁটি, বোঁদে, সিঙাড়া, হিং-এর কচুরি, কচুরি, লুচি ও মোহনভোগ (সুজির তৈরি) বা তরকারি— এসবই ময়রার দোকানে শোভা পেত। শহরে চা খাওয়ার চল তখন বাড়ির চেয়ে বেশি মোড়ের দোকানে। ছেলেবেলায় শহরের অধিকাংশ বনেদি বাড়িতে মা-র সঙ্গে গিয়ে দেখেছি কোনো বাড়িতেই ড্রইংরুম বলে কিছু নেই! বাড়ির-ই কোনো একটা ঘরে বিছানায় বা কাঠের চেয়ারে বসতে হতো। কয়েকজন উকিলের বাড়িতে সামনের একটা ঘরে বড় একটা টেবিলে, টেবিলের তিনদিকে বেঞ্চ আর উকিলবাবুর বসার একটা চেয়ার। এছাড়া কাঠের আলমারি ভর্তি আইনের বই। বেশির ভাগ বনেদি বাড়ির রোয়াক (আমরা বলতাম রকের-আড্ডা) ছিল কথাবার্তা বলার পাবলিক স্ফিয়ার। অনেক উকিলবাবুকে দেখতাম বাড়ির রোয়াকে বসেই গ্রামের চাষির জমি-জমার কাগজপত্র দেখছেন বা কোনো ক্রিমিনাল কেসের বিবরণ শুনছেন। আমাদের শৈশব-কৈশোর-যৌবনও কেটেছে বিভিন্ন বাড়ির রকের আড্ডায়। সকাল-সন্ধে সেইসব রকে বসে জমাটি আড্ডা, রাস্তার লোকজন এবং যে-যার ভালো-লাগা কিশোরীদের দেখা ছিল এক প্রিয় বিনোদন। তখন টেলিভিশন ছিল না, একশো চ্যানেল ছিল না, রিয়ালিটি-শো ছিল না, হায়ার সেকেন্ডারি পাশের আগে হিন্দি সিনেমা দেখার বাড়ি থেকে অনুমতি ছিল না, সিনেমা বলতে আমরা বুঝতাম স্কুলের সবাই দল বেঁধে ১৫ আগস্ট বা ২৬ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য বিভাগ থেকে দেওয়া কুপন নিয়ে হরি সিনেমা বা অরোরা সিনেমায় ভিড় জমানো। পরে মহুয়া সিনেমা হয়েছিল, এয়ারকন্ডিশনড্। প্রথম ক-বছর এসি ছিল। তারপর বন্ধ! একসময় মহুয়া সিনেমায় মেদিনীপুর শহরের সিনেমা প্রেমীরা ছাড়াও খড়্গপুর শহরের লোকেরা রেলে করে ছবি দেখতে আসত। এই মহুয়া সিনেমাকে ঘিরে জমজমাট দোকানপাট বাজার গড়ে উঠেছিল। সেই মহুয়া হল্ সবার আগে বিক্রি হয়ে গেল! প্রথমে কিনলেন এক মাড়োয়াড়ি ব্যবসায়ী। পরে তিনি বিক্রি করে দিয়েছেন কোনো এক বহুজাতিক সংস্থাকে —সেখানে শপিংমল হবে! তারপর উঠে গেল শহরের গোলকুঁয়ার চকের কাছে ব্রিটিশ আমলে প্রতিষ্ঠিত অরোরা সিনেমা হল্! সেখানেও নাকি শপিং কমপ্লেকস হবে! আর যে হরি সিনেমা হলকে আমরা গরিব সিনেমা হল্ মনে করতাম—সেটি এখনো টিঁকে আছে। মেদিনীপুর শহরে বর্তমানে ঐ একটিই সিনেমা হল্। কিন্তু সেখানেও লোক হয় না। লোকে এখন ঘরে বসে টিভিতে বা কম্পিউটারে সিনেমা দেখা পছন্দ করে! ... হয়তো হরি সিনেমাও অদূর ভবিষ্যতে উঠে যাবে।

মেদিনীপুর শহরে তখন মেদিনীপুর কলেজ। কলেজের গায়ে কলেজিয়েট স্কুল। সামনে চওড়া মোরামের রাস্তা। রাস্তায় আম, জাম, বকুল গাছ। রাস্তার ওধারে কলেজ মাঠ ও কলেজিয়েট স্কুলের খেলার মাঠ এবং তৎসংলগ্ন তেঁতুল তলার মাঠ, কোণের দিকে জেলা স্কুলবোর্ড। তেঁতুলতলার মাঠে তিনটে বড় তেঁতুলগাছ ছিল। ঢিল ছুঁড়ে আমরা তেঁতুল পাড়তাম। কলেজ মাঠ ও কলেজিয়েট স্কুল মাঠে ফুটবল খেলা হতো, শুধু শীতকালে ক্রিকেট হতো। তেঁতুলতলার মাঠে ভলিবল। কলেজমাঠের একদিকে বড় পোস্ট অফিস, অন্যদিকে কলেজ ও কলেজিয়েট স্কুল হোস্টেল। কলেজিয়েট স্কুলের গায়ে যে বাংলো প্যাটার্নের কোয়ার্টার, ১৮২৬ থেকে ১৮৯৯ পর্যন্ত সেখানে রাজনারায়ণ বসু বাস করতেন। ১৮৪১-এ মেদিনীপুর শহরে শিবচন্দ্র দেব ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্মসমাজের ঐতিহাসিক বাড়িটি ছেলেবেলায় দেখেছি সবসময় বন্ধ। তার সামনের উঠোনে বাসা বেঁধে কয়েকজন ওড়িয়া ঠাকুর (রাঁধুনি) থাকতেন। শহরের যে কোনো বাড়ির বিয়ে বা অন্যান্য ভোজে তাঁরাই রান্না করতেন। বিগত বাম সরকারের আমলে বাড়িটি ভেঙে স্টুডেন্টস হেলথ হোম বানানো হয়! ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্নটি, এর ফলে চিরতরে হারিয়ে গেল। মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে পড়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ক্ষুদিরাম বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ খ্যাতনামা

ব্যক্তিরা। কলেজিয়েট মাঠের একদিকে পুরাতন জেলখানা, অন্যদিকে জেলা স্কুলবোর্ড। জেলা স্কুলবোর্ডের পাশে ছিল একটা লালইঁটের দোতলা বাড়ি আর তার পাশেই একটা বড় পুকুর। যে পুকুরের জল বহু লোকের একমাত্র অবলম্বন ছিল।

আমাদের শৈশবে মেদিনীপুরের নাটক, বক্তৃতা, গানবাজনার একমাত্র হল্ ছিল ১৯৩৯-এ রবীন্দ্রনাথের হাতে দ্বারোদ্ঘাটিত বিদ্যাসাগর হল্। প্রাচীর ঘেরা অনেকটা জায়গা জুড়ে বিদ্যাসাগর হল্-এর সীমানা। গেট দিয়ে ঢুকতেই ছিল প্রাচীরের ধার ঘেঁষে নানা বৈচিত্র্যের ফুলের গাছ, পেছনের দিকে ফুলের বাগান আর বাকি জায়গা জুড়ে সবুজ ঘাস। বিকেলে অনেক লোক বিদ্যাসাগর হল্-এ বেড়াতে আসতেন। বাচ্চারা খেলতে আসত। বিদ্যাসাগর হল্-এর একতলা ও দোতলা জুড়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের লাইব্রেরি। কত যে মূল্যবান বই ও পাণ্ডুলিপি, পুঁথি লাইব্রেরিতে! কিন্তু কৈশোর ও যৌবনে দেখেছি লাইব্রেরির বেশির ভাগ সদস্য হয় শহরের উকিল, নয় ডাক্তার। তাঁদের বাড়ির কাজের লোকেরা সাইকেলে করে এসে লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে যেত সন্ধেবেলা। সেই সময় লাইব্রেরির দায়িত্ব পালন করতেন এক প্রাথমিক স্কুলশিক্ষক। তাকে সবাই নিতাইবাবু বলে জানতাম। এ-কাজের জন্যে মাসে তিনি গোটা পনেরো টাকাও পেতেন। শহরের কেল্লাপুকুর পাড়ে রাজনারায়ণ বসু (প্রথমে জেলা স্কুলের ও পরে কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন) ব্রিটিশ কালেক্টর এইচ. ভি. বেলির সাহায্য নিয়ে ১৮৫৪-য় ভারতের সর্বপ্রথম পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন (বর্তমানে রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার)। এই পাবলিক লাইব্রেরিতেও প্রচুর মূল্যবান বইপত্র ছিল। আজও ২৬৭টি দুষ্প্রাপ্য বই ও ২৩টি মূল্যবান পাণ্ডুলিপি আছে। সত্তর-আশির দশকেও লাইব্রেরিটি তার প্রাচীনত্ব নিয়ে অক্ষত ছিল। লাইব্রেরির সামনে ছিল সুন্দর ফুলের বাগান। বেড়ানোর পার্ক। সামনে বড় দিঘির আয়তনের কেল্লাপুকুর— যে পুকুরে একসময় জেলা সুইমিং প্রতিযোগিতা হতো। দু-একবার আন্তঃজেলা সন্তরণ প্রতিযোগিতাও এখানে হয়েছে। এই পাবলিক লাইব্রেরির অদূরে পুকুরপাড়ে একদিকে যেমন জোড়ামসজিদ, ঘোড়ার আস্তাবল ছিল— অন্যদিকে অরোরা সিনেমা হল্। আর একদিকে বাসরাস্তা, তার ওধারে ডা. উষানাথ সেনগুপ্তর বাড়ি---যার সামনের ছোট আয়তনের মাঠে একসময় কমিউনিস্টরা নিয়মিত সভা করত। প্রচারে বলা হত '.... বার .... ঘটিকায় .... ডা. উষানাথ সেনগুপ্তর বাটী প্রাঙ্গণে জনসভা।' বর্তমানে সেই মাঠের অর্ধেক অংশে হাউসিং কমপ্লেকস, দোকানপাট, অন্য অর্ধেক অংশে হোমিওপ্যাথি কলেজ হোস্টেল। সবচেয়ে যা দুঃখজনক, বিগত বাম জমানায় ঐতিহাসিক পাবলিক লাইব্রেরিটির দুর্দশা। বাড়ির প্রাচীন পরিকাঠামো নির্মম ভাবে ধ্বংস করে একটি আধুনিক দোতলা বাড়ি বানানো হয়---যার একতলায় লাইব্রেরিটির অস্তিত্ব এবং দোতালায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ দপ্তরের অফিস! অথচ ১৮৫৪-য় প্রতিষ্ঠিত ভারতের প্রথম পাবলিক লাইব্রেরিটি হেরিটেজ বিল্ডিং-এর মর্যাদা পেতে পারত! এ লাইব্রেরিটিও যেসব উকিল-ডাক্তারের নিয়ন্ত্রণে চলত— তাদের লাইব্রেরি নিয়ে কোনো দূরদর্শিতা ছিল না। কৈশোরে, যৌবনে এই লাইব্রেরিতে বসেই লোকে দৈনিক সংবাদপত্র, সাপ্তাহিক পত্রপত্রিকা পড়ত। এই পাঠকক্ষটিও ছিল অনেকটা গির্জার হল্-এর মতো। পরে, ১৯৬১-৬২ নাগাদ মেদিনীপুর জেলা লাইব্রেরিটি বিদ্যাসাগর হল্-এর এককোণে তৈরি হয়। এ দুটি ছাড়াও মেদিনীপুর শহরে আরো দুটো মূল্যবান লাইব্রেরি আত্মগোপন করে আছে—একসময় সাদা সাহেবদের (বর্তমানে কালোসাহেবদের) টাউনক্লাব লাইব্রেরি ও জেলা কালেক্টরটের লাইব্রেরি। একসময় টাউনক্লাবের লাইব্রেরিতে অফিসার ছাড়া কারো সদস্য হওয়ার অধিকার ছিল না। ১৯৫৭-৫৮ সালেও ক্লাবের চারধারে কোনো প্রাচীর ছিল না। ক্লাবের ভেতরে বিলিয়ার্ড খেলা হতো। টেনিসকোর্টে দিশি সাহেবরা র‍্যাকেট হাতে টেনিস খেলত। লোকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে দেখত। পরে, বিগত শতকের ছয়ের দশকে যখন ব্যাংক জাতীয়করণ হলো আর অধ্যাপকদের মাইনে একটু বাড়ল তখন ব্যাংক কর্মী ও অধ্যাপকরা টাউনক্লাবে সদস্য হওয়ার অধিকার পেল; তাও অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। প্রায় এই একই সময়ে মেদিনীপুর শহরে ডিএম-এর বাংলোয় মেদিনীপুর ফিল্ম সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ডিএম টাউনক্লাবের একটি রুম, মানে লাইব্রেরি রুমটি প্রতি বৃহস্পতিবার ফিল্ম সোসাইটিকে ব্যবহার করতে দেন।

অনেক পরে এই টাউন ক্লাবের পাশে বিগত বাম সরকারের সহযেগিতায় মেদিনীপুর ফিল্ম সোসাইটির নিজস্ব বিল্ডিং ও অডিটোরিয়াম তৈরি

□□ শহরের কেল্লাপুকুর পাড়ে রাজনারায়ণ বসু ব্রিটিশ কালেক্টর এইচ. ভি. বেলির সাহায্য নিয়ে ১৮৫৪-য় ভারতের সর্বপ্রথম পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন (বর্তমানে রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার)। এই পাবলিক লাইব্রেরিতেও প্রচুর মূল্যবান বইপত্র ছিল। আজও ২৬৭টি দুষ্প্রাপ্য বই ও ২৩টি মূল্যবান পাণ্ডুলিপি আছে।

হয়। এই ফিল্ম সোসাইটিটি ভারতীয় ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের প্রথমদিকের সংস্থা ফিল্ম ফেডারেশনের সদস্য। এই সোসাইটির সদস্যরা ভারতে অনুষ্ঠিত নানা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পান। ইতিমধ্যেই এই ফিল্ম সোসাইটির নিজস্ব ইতিহাস বেশ সমৃদ্ধ।

বড়বাজার থেকে একটা রাস্তা হুনমানজির চক-মিরবাজার-কর্নেলগোলা-রাজারপুকুর-কোতবাজার- হবিবপুর-বড় আস্তানা-বরিশাল কলোনি হয়ে প্রোটেস্টান্ট গির্জার কাছে বড় রাস্তায় কেরানিচটিতে রানিগঞ্জ সড়কে মিশেছে---তারপরেই ভাদুতলার জঙ্গলের শুরু। বড়বাজার আর ছোটবাজারকে যোগ করেছে 'আমাদের দোকানে'-র গলি। অর্থাৎ, গলিমুখের একদিকে 'আমাদের দোকান' অন্যদিকে চুনিলাল মাড়োয়ারির দোকান।

বড়বাজার থেকে হনুমানজির চকে এসে একটা রাস্তা যেমন মিরবাজারের দিকে চলে গেছে অন্য রাস্তাটি ভোলাপিরিদের রাসমঞ্চ, বাংলা স্কুল (ব্রিটিশ আমলে হার্ডিঞ্জ স্কুল)-এর পাশ দিয়ে গোলকুঁয়া চক-কলিজিয়েট স্কুল-মেদিনীপুর কলেজ-বড়পোস্ট অফিস—জেলা স্কুলবোর্ড—ডিএম বাংলো হয়ে বার্জটাউন চলে গেছে। কালেকটরেটের একদিকে এসপি বাংলো, পি ডবলিউ ডি অফিস, তারপর ডিএসপি বাংলো, ফরেস্ট অফিস, পেছনে মিশন গার্লস স্কুল। এসপি-র বাংলোর পেছন দিকে পুলিশ লাইন। পুলিশ লাইনের পরে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল। অন্যদিকে বড়বাজার থেকে ছোটবাজার ক্রশ করে একটা রাস্তা নিমতলা-বটতলা জেলা হাসপাতাল হয়ে স্টেশনের দিকে চলে গেছে। বড়বাজার থেকে অন্য একটা রাস্তা জগন্নাথ মন্দির হয়ে নতুন বাজার হয়ে কাঁসাই নদীর বাস-ব্রিজ চলে

গেছে। স্কুলবাজার থেকে একটা গলি বড়বাজারকে ক্রশ করে টাউনস্কুল ও হরি সিনেমা হল্ আর একটা রাস্তা বক্সিবাজার হয়ে পাটনা বাজার গেছে। এছাড়া অন্য একটা রাস্তা সুজাগঞ্জে (মেদিনীপুরের যৌনকর্মী পল্লি) কুণ্ডুদের সরষের তেল কল হয়ে জগন্নাথ মন্দির গেছে। স্কুলবাজার থেকে আরেকটা রাস্তা দুটো ভাগ হয়ে একটা ভীমচক-নিমতলাচক-দ্বারিবাঁদ হয়ে পাটনাবাজারের দিকে, এবং অন্যটি মিঞাবাজার জোড়া মসজিদ-মিঞাবাজার (এ অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমের বসবাস) হয়ে জজকোর্ট। শরের সিপাইবাজার সংলগ্ন বড় আস্তানা, ছোট বাজার সংলগ্ন কসাইপাড়া, আলিগঞ্জ প্রধানত মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল। সে-সময় শহরের প্রিন্টিং প্রেস ব্যবসা প্রধানত মুসলিমদের হাতে ছিল। কসাইপাড়ায় ছিল সারিবদ্ধ গোরুর মাংসের দোকান আর একটা মুসলিম হোটেল 'ইসলামিয়া'। এর কাছেই ছিল আলিগঞ্জ পোস্ট অফিস যেটি বর্তমানে অন্যত্র উঠে গেছে। নিমতলা চকে মুসলিমদের বেশি দোকান ছিল। শহরে মুসলিমদের আরেকটি বড় ব্যবসা ছিল জামাকাপড় সেলাই ও বই বাঁধাই-এর দোকান। বড়বাজার মিরবাজার ও আলিগঞ্জে খলিফাদের দোকান ছিল। নানারকম পোশাক তৈরিতে তাঁরাই ছিলেন বড় কারিগর। ঘোড়ার গাড়িরও একচেটিয়া মালিক ছিলেন মুসলিমরাই। পরে শহরে রিকশা এলে তাঁদের অনেকেই রিকশা চালানোকে জীবিকা করেন। শিক্ষিত মুসলিমের সংখ্যা শহরে তখন কম ছিল ; যাঁরা শিক্ষিত হতেন খুবই উচ্চশিক্ষিত হতেন। যেমন গণিতের অধ্যাপক সামসুল বারি মেদিনীপুর কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। প্রাচ্যবিদ্যায় সুপণ্ডিত আইনবিদ্ স্যার আবদুল্লাহ সোহরাওয়াদি মেদিনীপুর জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁর ভাই হাসান সোহরাওয়াদি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছিলেন। এঁদের পূর্ব পুরুষ পারস্য থেকে ভারতে এসে মেদিনীপুর শহরের বাসিন্দা হন। এছাড়া ছিলেন নজরুল পুরস্কার প্রাপ্ত সাহিত্যিক আজহারউদ্দিন খান্। অবশ্য শহরে মুসলিম উকিলের সংখ্যা ভালোই ছিল এবং এখনও আছে। শহরের মধ্যেই তখন ডোমপাড়া, মুচিপাড়া, কামারপাড়া, কুমোরপাড়া, শাঁখারিপাড়া, বেনেপাড়া, বেহারাপাড়া ছিল। বড় পোস্ট অফিসের কাছের পঞ্চুচক থেকে কোতবাজার সারি সারি শাঁখার গয়নার দোকান ছিল। শহরের সোনা-রুপোর ব্যবসা একচেটিয়া ছিল সাহাদের, আজও আছে। এখন সোনার সঙ্গে হিরের ব্যবসাও যোগ হয়েছে। কামার, কুমোর, এমনকি জুতো সেলাই করতেন যারা, সেইসব শ্রমজীবী মানুষদের সঙ্গে শহরবাসীর একটা আত্মীয়তার সম্পর্কও গড়ে উঠত। যেমন প্রতি হপ্তায় বাড়িতে কেরোসিন তেল মাথায় করে এনে যাঁরা দিতেন— তাঁদের বেশির ভাগ ওড়িশার লোক। ধারে তেল দিতেন। দরজারে চৌকাঠে ওড়িয়াতে লিখে রেখে যেতেন পাওনা কত। কোনোদিন হিসেবে গণ্ডগোল হত না। নানা-রকম বাসনকোসন আর খেলনা ফেরি করতে যাঁরা আসতেন তাঁদের বেশিরভাগই হতেন খড়্গপুর শহর থেকে আসা 'তেলেঙ্গি'। অর্থাৎ দক্ষিণভারতীয়। মাদুরও কেনা হতো ফেরিওয়ালার কাছ থেকে।

শহরের প্রায় সব বাড়িতেই কুঁয়ো ছিল। কুঁয়োর জলেই স্নান, কাপড়কাচা, শৌচকর্ম। মিউনিসিপ্যালিটির কলের জল রাস্তার ধার থেকে ধরতে হত—খাওয়ার জল। অনেক বড়লোকের বাড়িতেও কলের জল ছিল না। আধুনিক শহরে জলের ব্যবহার ও অপব্যবহার বর্তমানে যে হারে হয় তা তখন ছিল না। ব্রিটিশ আমলে তৈরি স্টেশনের কাছের জলের ট্যাঙ্ক থেকেই সারা শহরে জল সরবরাহ হতো। তাতেই কুলিয়ে যেত। মিউনিসিপ্যালিটির কলের জলের ট্যাপ তখন কেউ চুরি করত না। মানুষ গরিব ছিল কিন্তু বিশ্বায়নের লোভ তাদের ছিল না। যাক, সে কথা, গ্রীষ্মে কুয়োর জল অনেকটা নেমে যেত। এই সময়ে দুপুরের দিকে গায়ে চকচকে তেলমাখা 'কুয়োয় কিছু পড়েছে নাকি' আসত। সারা বছর যার যা কুয়োয় পড়ত, এমনকি সোনার হার বা আংটি সবই লোকটি জলে ডুব দিয়ে তুলে আনত। এইসব শ্রমজীবী মানুষ, ফেরিওয়ালা মেদিনীপুর শহরের নগরায়ণের সঙ্গে সঙ্গে একরকম বিলুপ্ত প্রজাতি হয়ে গেছে।

আজ যাঁদের হরিজন বলা হয় আগে 'মেথর' বলা হতো। পুরুষদের বলা হত 'মোথর', মেয়েদের 'মেথরানি'। শহরের দু-একটি ধনী বা ডাক্তারের বাড়ি ছাড়া—সব বাড়িতেই ছিল খাটা-পায়খানা। শহরে অসংখ্য গলিপথ ছিল, এই খাটা-পায়খানা থেকে মলমূত্র যাতে টিনের পাত্রে মাথায় করে বয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। এই কাজ করতেন প্রধানত 'মেথরানি'-রা। এঁরা প্রধানত ওড়িশার গরিব ও প্রান্তিক মানুষ। শহরের বেশির ভাগ বাড়িতে এঁরা ছিলেন অচ্ছুত। রাত-ভোর হতে না হতেই এঁদের পদশব্দে জেগে উঠত শহর। তাঁরাই এই বর্জ্য মাথায় করে শহর থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে, লালদিঘির ওধারে, রানিগঞ্জ সড়কের ধারে ধাপায় নিয়ে যেয়ে ফেলে আসতেন। বিরাট অঞ্চল জুড়ে ধাপা। তার আশেপাশেই কৃষকদের ধান জমি। রানিগঞ্জ সড়কে প্রচুর জামরুলের গাছ ছিল। কৈশোরে লালদিঘি ঠেঙিয়ে দলবেঁধে জাম পাড়তে গেলে ধাপার দুর্গন্ধ নাকে লাগত। এখন তো তার আশেপাশে পেট্রলপাম্প, রেঁস্তোরা, দোকানপাট, বড় বড় ফ্লাট বাড়িও মাথা তুলেছে। তবে সেই দুর্গন্ধ আর নাকে লাগে না। নিমতলা-বটতলার মাঝে ছিল মেথর বস্তি। আরেকটা মেথরবস্তি ছিল গোলাকুঁয়োচকের কাছে পুরোনো জেলখানার গায়ে। পাশেই বেহারা বস্তি। বেহারা বস্তিতে সাধারণত শহরের রিকশাওয়ালারা (পায়ে টানা) বাস করতেন। এঁরাও গরিব, নিম্নবর্গের মানুষ কিন্তু 'মেথরদের' ছোঁয়াচ এড়িয়ে চলতেন! শহরের বেশির ভাগ লোকই এদের অস্পৃশ্য করে রাখত। নগরায়ণের সঙ্গে সঙ্গে মলমূত্র বয়ে নিয়ে যাবার হাতে-ঠেলা গাড়ি এল। আরও অনেক পরে, আটের দশকে শহরের নতুন নতুন এলাকায় যেসব বাড়ি হতে শুরু করল সেখানে টয়লেটে এল স্যানিটারি সিস্টেম। ধীরে ধীরে খাটা পায়খানা উঠে যেতে শুরু করল। মেথর-পেশাটাও তার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যেতে থাকল। মেদিনীপুর শহরে যৌনকর্মীপল্লী ছিল কুণ্ডুদের তেলকলের কাছে সুজাগঞ্জ, বিবিগঞ্জ ও ভীমচকের কাছে নানকগলি। শহরের বাবুরা নিয়মিত এখানকার যৌনকর্মীদের কাছে যেতেন। দেশি-বিদেশি মদের দোকানও এসব অঞ্চলে ছিল। শহরে লজ-সংস্কৃতি দেখা দেওয়ায় যৌনকর্মীদের এই পাড়াগুলি হারিয়ে গেছে।

ভোরের শহরে আশেপাশের গ্রাম থেকে, ভাদুতলা, শালবনির জঙ্গল থেকে মাথায় করে, বা কাঁধে ভার বয়ে ঝাঁটিকাঠ, চেলাকাঠ, সবুজ শালপাতা নিয়ে আসতেন দলে দলে আদিবাসী পুরুষ ও মেয়েরা। তখন সারা শহরেই কয়লার উনুন। পরে গুলের উনুন হয়। শহরে গ্যাস সিলিন্ডার আসে আরও অনেক পরে, আটের দশকে। প্রতিটি বাড়িতে, খাবার-দোকানে, চায়ের দোকানে, তেলেভাজার দোকানে উনুন ধরাতে ঝাঁটিকাঠ বা চ্যালাকাঠ লাগত। সবুজ শালপাতায় মুড়ে অথবা শালপাতার ঠোঙায় মিষ্টি বা তেলেভাজা দেওয়া হতো। এখনকার মতো পলিথিনের ব্যবহার ছিল না। মেদিনীপুর শহরে সবুজ শালপাতা, ঝাঁঠিকাঠ ও চ্যালাকাঠ বিক্রি করে

আদিবাসীরা দু-পয়সা রোজগার করতেন। শহর থেকে নুন-তেল-চাল-ডাল, শাড়ি কিনে নিয়ে গ্রামে ফিরে যেতেন। তখন নীল বা লাল একপেড়ে শাড়ির দাম ছিল সাত-আট থেকে দশ-বারো টাকা। দুর্গাপুজোর আগে আদিবাসী ছেলে ও মেয়েরা দুর্গাছাতু আনতেন। ভালোই বিক্রি হতো। এছাড়া রথের সময়, রাসের সময়, ঝুলনযাত্রার সময় আদিবাসীরা দলে দলে শহরে আসতেন। দুর্গাপুজো দেখতেও আসতেন। মাঝে মাঝে শহরের চকে-চকে ময়ূরপালক মাথায় বেঁধে ধামসা-মাদল বাজিয়ে নাচ প্রদর্শন করতেন।

শহরের দুপুর বেলার দখল নিত নানা পেশার ফেলিওয়ালারা। বাসন-কোসন, শাড়ি, নানারকম খাবার, বেলুন, বিছানার চাদর নিয়ে এরা আসতেন। ‘কুয়োয় কিছু পড়ছে নাকি’-র মতো ‘ছাতা সারাই’, ‘চাবিতালা সারাই’, একটা চাকা লাগানো যন্ত্র কাঁধে ‘ছুরি-কাঁচি ধার’ আসত। প্রতি বৃহস্পতি ও রবিবারে দেখা যেত ভিখিরিদের ভিড়। মানুষ তখন চাল-ডাল এমনকি সব্জি ভিক্ষে দিত। অনেক ভিখিরি বিভিন্ন পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কও গড়ে তুলত। শহরের সর্বত্রই, কোনো গিডেনস বাউলরিচ বেকের তত্ত্ব না জেনেও, তৈরি হতো ছোটো ছোটো পাবলিক স্ফিয়ার যা প্রাইভেট স্ফিয়ারকেও প্রভাবিত করত।

১৯৫৫-৫৬ সাল নাগাদ শহর থেকে ঘোড়ার গাড়ি অদৃশ্য হলো! দেখা দিল মানুষের পায়ে টানা রিক্‌শা। সারা শহরে দু-তিনটে ঘোড়ার গাড়ি থাকল। অরোরা, মহুয়া আর হরি সিনেমার হল্‌ মালিকরা সিনেমার প্রচারে তাদের কাজে লাগাত। গাড়ির তিনদিকে নায়ক-নায়িকার পোস্টার আর মাথায় লাউড-স্পিকার বসিয়ে গান বাজাতে বাজাতে ঘোড়ার গাড়ি শহরের বিভিন্ন রাস্তায় পরিভ্রমণ করত। গাড়ির ভেতর থেকে একটি লোক সিনেমার হ্যান্ডবিল ছড়াত। আরেকটি লোক রেকর্ডপ্লেয়ারে গান বাজাত, বা কোন ছবি, কে নায়ক-নায়িকা প্রচার করত। নগরায়ণের সাথে সাথে পায়ে টানা রিক্‌শা অদৃশ্য হচ্ছে। শহর ভরে উঠেছে অটো, মিনিবাস, ট্যাক্সি, মোটর সাইকেল, স্কুটার, প্রাইভেট গাড়িতে।

বিগত শতকের ছয়ের দশক থেকে মেদিনীপুর শহরের রাস্তাঘাটের পরিবর্তন হতে শুরু করে। আগে শহরের সব পথই ছিল মোরামের পথ। এই সময়ে শুরু হয় পিচঢালা রাস্তা তৈরি। শহরের মূল পথগুলো পিচ হওয়ার পর দেখা গেল জলের পাইপ লাইন খাতে টাকা এসেছে। তখন পিচ রাস্তা খুঁড়ে পাইপ লাইন বসানো শুরু হলো। বেশির ভাগ মজুর ছিলেন আদিবাসী নারী-পুরুষ ও বাচ্চারা। শিশুশ্রম নিয়ে তখন কেউ মাথা ঘামাত না। শিশুরা মজুরি পেত অর্ধেক আর মেয়েরা পুরুষদের থেকে কম। ইলিয়াস কোম্পানি বিদ্যুৎ সরবরাহ করত। তারা উঠে গেল। ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি পর্ষদের নতুন ইলেকট্রিক খুঁটি ও বিদ্যুৎ লাইন বসল। সন্ধের পর শহরের আলোর রমরমা বাড়ল। টেলিফোন লাইনে পরিবর্তন আসে বিগত শতকের নয়ের দশকে। নয়ের দশকেও শহরের বাইরে কোথাও টেলিফোন করতে হলে টেলিফোন এক্সচেঞ্জের শরণাপন্ন হতে হতো। ঘণ্টা দু-তিন আগে থেকে তাদের বলে রাখতে হতো। এক্সচেঞ্জ লাইন দিলে তবেই দূরবর্তী শহরের মানুষের সঙ্গে কথা বলা যেত। তবে ঐ নয়ের দশকে শহরে কয়েকটি এসটিডি বুথ চালু হয়। তারও আগে পোস্ট অফিসে গিয়ে পয়সা দিয়ে ফোন করতে হত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটা ফোনের জন্য বসে থাকতে হতো। সেই সময় কোনো এক অজ্ঞাত কারণে বাড়ির ল্যান্ডফোনের চেয়ে শহরের নতুন এসটিডি বুথের লাইনগুলি সবসময় চালু থাকত। প্রতিদিন সন্ধের পর লাইনসম্যান এসে বুথ মালিকের কাছ থেকে সেদিনের ভেট নিয়ে যেতেন। যেহেতু গোটা ব্যাপারটা তখনো এক্সচেঞ্জ অপারেট করত, শুনতাম দূরবর্তী ফোনের কল সাধারণ এক্সচেঞ্জ থেকে এর-ওর লাইনে জুড়ে দেওয়া হতো। এর ফলে এক ফোনে কথা বলছে একজন কিন্তু বিল উঠছে অন্য এক ফোনের, অন্যজনের। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এসব সুযোগ নিত ব্যবসায়ীরা। গভীর রাতের দিকে তারা এই ধরণের ফোন করত! এসব নিয়ে এক্সচেঞ্জে অভিযোগ জানিয়ে কোনো লাভ হতো না। আমার জানা এক এসটিডি বুথ মালিক নয়ের দশকে একটা এসটিডি বুথ থেকে এত টাকার মালিক হলো যে পরবর্তীকালে শহরে হোটেল-লজ ব্যবসায় নামল। এখন শহর জুড়ে অসংখ্য মোবাইল টাওয়ার। তাই শহর থেকে চড়ুইপাখিও নিরুদ্দেশ।

☐☐ বিগত শতকের ছয়ের দশক থেকে মেদিনীপুর শহরের রাস্তাঘাটের পরিবর্তন হতে শুরু করে। আগে শহরের সব পথই ছিল মোরামের পথ। পিচঢালা রাস্তা তৈরি শুরু হয়। শহরের মূল পথগুলো পিচ হওয়ার পর দেখা গেল জলের পাইপ লাইন খাতে টাকা এসেছে। তখন পিচ রাস্তা খুঁড়ে পাইপ লাইন বসানো শুরু হলো। বেশির ভাগ মজুর ছিলেন আদিবাসী নারী-পুরুষ ও বাচ্চারা। শিশুশ্রম নিয়ে তখন কেউ মাথা ঘামাত না। শিশুরা মজুরি পেত অর্ধেক আর মেয়েরা পুরুষদের থেকে কম।

বিগত শতকের ছয়ের দশকের শেষে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যাংক জাতীয়করণ করার ফলে স্টেট ব্যাংক কালেক্টরেট থেকে উঠে, কালেক্টরেটের সামনের রাস্তার ওপারে চলে যায়। নতুন এসবিআই কমপাউন্ড তৈরি হয়। এসবিআই-এর ঠিক পেছনেই ইনকাম ট্যাক্স অফিস। সাতের দশকে শহরে অন্যান্য ব্যাংকের আবির্ভাব ঘটে যেমন ইউবিআই, ইউকো, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক, ইন্ডিয়ান ব্যাংক, এলাহাবাদ ব্যাংক, ব্যাংক অফ বরোদা, সেন্ট্রাল ব্যাংক, কর্পোরেশন ব্যাংক, ওরিয়েন্টাল ব্যাংক অফ কমার্স, ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ইত্যাদি। আগে থেকেই শহরে দুটো কো-অপারেটিভ ব্যাংক — পিপলস্‌ কো-অপারেটিভ ব্যাংক ও বিদ্যাসাগর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক ছিল। এছাড়াও একটা ল্যান্ড মর্টগেজ ব্যাংক ছিল। পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক দু-বার সর্বভারতীয় পুরস্কার পেয়ে ধনী ব্যাংক হয়ে ওঠে। বর্তমানে ব্যাংকের বিল্ডিংটি কর্পোরেট হাউসের মতো—কিন্তু বিগত শতকে একটা সাধারণ গ্রামীণ ব্যাংকের চেহারায় ছিল। এর শাখা ব্যাংকও বেড়েছে। এই তিনটি ব্যাংক ছাড়া দেখা দেয় মল্লভূম গ্রামীণ ব্যাংক। (বর্তমানে এটির নাম বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংক)। বেসরকারি ব্যাংক এ-শহরে আসে এই শতকের শুরু থেকে—যেমন অ্যাকসিস ব্যাংক, আইসিসিআই ব্যাংক, আইডিবিআই ব্যাংক, এইচডিএফসি ব্যাংক। মূল স্টেট ব্যাংক অফ্‌ ইন্ডিয়ার আরেকটি শাখা সম্প্রতি রাজাবাজার পঞ্চুর চকের কাছে স্থাপিত হয়েছে। ইউবিআই-এর রিজিওনাল অফিস ছাড়াও, একটা স্কুল বাজারের কাছে, অন্যটা সিপাই বাজারে। শহর জুড়ে বর্তমানে প্রায় সব ব্যাংকের এটিএম নেটওয়ার্ক। মেদিনীপুর স্টেশনে (বর্তমানে মডেল স্টেশন) এসবিআই, ইউকো ব্যাংক ও পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের এটিএম আছে।

পূর্ব ও পশ্চিম দুটি জেলায় মেদিনীপুর ভাগ

এখন তো স্টেশন রোড, জলট্যাংক (পুরোনো
অফিস যেমন বেড়েছে দ্বিতীয়, তৃতীয় রো-তে বি

যান।

হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সদর ও মেদিনীপুর শহরের নগরায়ণে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে এতগুলি ব্যাংক। প্রতিদিন কয়েক হাজার কোটি টাকার লেনদেন হয় এইসব ব্যাংকে। মেদিনীপুর শহরের নাগরিকদের একটি প্রভাবশালী অংশ এই ব্যাংককর্মী ও অফিসাররা। শহরের অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিরা হলেন সোনা ব্যাবসায়ী, ওষুধ ব্যবসায়ী, অন্য রাজ্য থেকে আগত মাড়োয়ারি সম্প্রদায়—রাজস্থানি ও গুজরাতিরা। কিছু পাঞ্জাবি বস্ত্রব্যাবসা ও রাস্তাঘাট নির্মাণে যুক্ত। মেদিনীপুর শহরে মিষ্টি ব্যবসায়ীদের বড় লবি আছে।

বিগত শতকের আটের দশক থেকে ফাঁকা ময়দান রবীন্দ্রনগর এলাকায় একের পর এক বাড়ি উঠতে থাকে। বেশির ভাগ ডাক্তাররা আর কিছু অধ্যাপক এই অঞ্চলে বসতি শুরু করেন। মেদিনীপুর শহরের স্টেডিয়ামের উল্টোদিকে বিশাল জমিদারবাড়ি ছিল। এখন সেটা আর নেই। রবীন্দ্রনগর এলাকা গড়ে ওঠার পর শহরে দেখা দিল দু-একটা প্যাথলজিক্যাল ল্যাব। এখন তো প্রায় যতজন ডাক্তার ততগুলিই প্যাথ-ল্যাব ও ওষুধ দোকান! বর্তমানে রবীন্দ্রনগর ডাক্তারপাড়া। সেখানে সকাল থেকে রোগীদের ভিড়। এর পরে পাল্লা দিয়ে শহরে দেখা দিয়েছে নার্সিং হোম, ওষুধ দোকান। একসময় স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় অভিযোগ উঠেছিল জেলা হাসপাতালের ওষুধ, অক্সিজেন সিলিন্ডার, ফিনাইল নার্সিংহোমগুলিতে পাচার হয়ে যাচ্ছে!

জেল হাসপাতালকে নিয়ে পুরোনো জেলখানার সামনের মাঠে মেডিক্যাল কলেজ তৈরি হওয়ার পর থেকে মেদিনীপুর শহরে ডাক্তররাও শহরের এক প্রভাবশালী অংশ। মেদিনীপুর শহরের রাঙামাটি অঞ্চলে একটি প্যারা মেডিক্যাল কলেজ ছাড়াও দু-তিনটি বড় মাপের নার্সিংহোম তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের (এনজিও) বেশ ককেয়কটি অ্যাম্বুলেন্স।

এত ডাক্তার। এত নার্সিংহোম এ-শহরে থাকলেও— দু-তিন বছর আগে পর্যন্ত জরুরি প্রয়োজনে পেস মেকার বসানোর কোনো ব্যবস্থা হাসপাতালে বা নার্সিংহোমে ছিল না। দু-তিন বছর আগে প্যারামেডিক্যাল কলেজে টেম্পোরারি পেসমেকার বসিয়ে কলকাতায় রোগীদের নিয়ে গিয়ে স্থায়ী পেসমেকার বসানো হতে শুরু করে। জেলা হাসপাতালে নামী-দামী যন্ত্রপাতি থাকলেও— সেগুলি অকেজো করে রাখায় এবং জেলা হাসপাতালর পরিষেবা রীতিমতো নিম্নমানের হওয়ায়— শহরে ব্যাঙের ছাতার মতো নার্সিংহোম ও প্যাথ-ল্যাবের রমরমা। রোগী-র ভিড়ের জন্য শহরে লজের সংখ্যাও বর্তমানে হু হু করে বাড়ছে। বিয়েবাড়ি, নানা অনুষ্ঠানেও লোকেরা আজকাল লজ ব্যবহার করছেন। হোটেল হিন্দুস্তান, রোজভ্যালির রিজ হোটেল লজ এ-শহরে হলেও— প্রকৃত অর্থে কোনো থ্রি-স্টার লজ বা হোটেল এ শহরে আজও নেই। শুধু মধ্যবিত্ত লজ-হোটেলের রমরমা। এইসব লজ-হোটেলে নতুন প্রজন্মের তরুণ-তরুণীদের আড্ডার ভিড় বাড়ছে।

বিগত শতকের পাঁচের দশকে মেদিনীপুর শহরের সাংস্কৃতিক পরিবেশ সংবাদপত্র, সাহিত্য, নাটক, যাত্রাপালা ঘিরে ছিল। ১৮৫১-য় জেলা কালেক্টর এইচ. ভি. বেলির পৃষ্ঠপোষকতায় দ্বিভাষিক সংবাদপত্র Midnapore and Hijli Guardian বের হয়। ১৯২২-এ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে মাসিক পত্রিকা *মাধবী* বের হয়। সম্পাদনা করেন মনীষীনাথ বসু সরস্বতী। পরে রাসবিহারী রায় সম্পাদিত *মেদিনীবাণী*, ১৯৪৪-এ প্রমথ পালের সম্পাদনায় মাসিক *প্রভাত* বের হয়। অবশ্য ১৯০৩ থেকে মন্মথ নাগের সম্পাদনায় *মেদিনীপুর হিতৈষী* বের হতে থাকে। আমি যে পত্রিকাটি ১৯৫৩-য় নিজের চোখে দেখেছি তা হলো সাপ্তাহিক পত্রিকা *মেদিনীপুরের কথা*। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির জেলার মুখপত্র ছিল। দেবেন দাশ সম্পাদক ছিলেন। অনিল বাবু সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজ দেখতেন। বিগত শতকের আটের দশক থেকে মেদিনীপুর শহর থেকে কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা বের হতে শুরু করে। তাপস মাইতি-র সম্পাদনায় প্রথম বের হয় *দৈনিক উপত্যকা*। পরে *বিপ্লবী মেদিনীপুর টাইমস*, *সব্যসাচী*, *ছাপা খবর*, *মেদিনীপুর বার্তা*। আটের দশক শহর থেকে যেসব সাহিত্য পত্রিকা বের হতে শুরু করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দীপক কর সম্পাদিত *ধানসিড়ি*, সমীরণ মজুমদার সম্পাদিত *অমৃতলোক*, বিপ্লব মান সম্পাদিত *সময় সারণী*। পরে গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পীসংঘের *শব্দের মিছিল* (আজহার-উদ্দিন খান সম্পাদিত), *ঐক্য* (সম্পাদনায় গৌরী শংকর সরকার), *ভুলুং জলদর্চি* (সম্পাদনা ঋত্বিক ত্রিপাঠী), *সৃষ্টি* (সম্পাদনা: শৈবালশঙ্কর চক্রবর্তী)। *অন্য ক্যানভাস* (সম্পাদনা বিশ্বজিৎ বন্দোপাধ্যায়), ছবির পত্রিকা *চিত্রম* (সম্পাদনা:মানব বন্দোপাধ্যায়) এ-শহর থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করে। এছাড়াও মেদিনীপুর ফিল্ম সোসাইটির *সিনেনিউজ* ও *প্রতিবিম্ব*, বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা *বিজ্ঞান মনীষা*, শিশু-কিশোরদের পত্রিকা *সুসাথী* ও *নয়ন* উল্লেখযোগ্য।

বিগত শতকের পাঁচের ও ছয়ের দশকে শহরের সঙ ও যাত্রাপালা বিখ্যাত ছিল। মেদিনীপুর শহরের বিখ্যাত সঙ বছরে একবার বের হতো কিন্তু তা দেখার জন্য শহরবাসীরা গভীর রাত পর্যন্ত রাস্তার মোড়ে মোড়ে, বাড়ির ছাদে, বারন্দায় ও উঠোনে অপেক্ষা করত। কারণ এই সঙ-এর শোভাযাত্রায় শহরের নানা কেচ্ছা বেরিয়ে আসত। মেদিনীপুর শহরে রাসের মেলা, দুর্গাপুজো, কালীপুজোর সময় শহরের বিভিন্ন যাত্রাপালা সংগঠন যাত্রা করবেন। পাঁচ ও ছয়ের দশষক পুরুষরাই মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করতেন---রানি, রাজকন্যা, সখী সাজতেন। আমরা ছোটরা সাজঘরের আড়ালে লুকিয়ে পুরুষ কী করে মেয়ে হয় কৌতূহল নিয়ে দেখতাম। আধুনিক প্রথায় মেদিনীপুর শহরে নাটক শুরু হয় ১৮৭৫-এ। তখন রেললাইন না থাকায় শহরের লোকেরা নাটক দেখতে আসত নদীপথে— নৌকা, লঞ্চ বা স্টিমারে। জমিদার প্রিয়নাথ রায়ের মেদিনীপুরের শহরের বাড়িতে (বল্লভপুরে) নাটক পরিচালনা ও অভিনয়ে ছিলেন যশস্বী চিকিৎসক ডাক্তার নীলরতন সরকার। ১৮৭৬-৭৭ সাল থেকে বিভিন্ন জমিদার ও বড়লোকদের প্রসাদোপম বাড়ির হল্-এ নাটকের চর্চা ও অভিনয় শুরু হয়। শহরের চিড়িমার নাই, বল্লভপুর, কর্নেলগোলার নাটকের দলগুলি বিখ্যাত হয়ে ওঠে। অবশ্য ১৯৩২-৩৩ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত মেদিনীপুর শহর যখন ব্রিটিশ উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনে উত্তাল, বার্জ, পেডি, ডগলাস-এর মতো জেলায় ম্যাজিস্ট্রেটরা গুলিবিদ্ধ হচ্ছেন— শহরের নাট্য আন্দোলনে কোনো এক অজ্ঞাত কারণে ভাঁটাপড়ে। বিগত শতকের পাঁচের দশক থেকে বিভিন্ন নাটকের দল ও নাট্য আন্দোলন মাথা চাড়া দিতে থাকে। ১৯৫৬ সালে প্রধানত গণনাট্য আন্দোলনের প্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত হয় কৃষ্টি সংসদ। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির তরুণরা কৃষ্টি সংসদের জন্ম দেন। শিল্পসম্মত নাটক ও কিছু যাত্রাপালা করে কৃষ্টি সংসদ শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও প্রশংসা পেয়েছে। এছাড়া যে দলগুলি নাটকে উল্লেখযোগ্য তারা হলো ক্রান্তিক, উত্তরণ, ত্রিধারা, উদয়ন। অবশ্য পাশের শহর খড়্গপুরের

আলকাপ ও মশাল বিখ্যাত নাট্যদল। মেদিনীপুর শহরে আজও নির্দিষ্ট কোনো থিয়েটার হল্ নেই। আগে বেশির ভাগ নাটক বিদ্যাসাগর হল্-এ হতো। পরে ১৪০০ দর্শকের জেলা পরিষদ হল্-এও হতে শুরু করে। শহরে মেদিনীপুর ফিল্ম সোসাইটির একটি প্রেক্ষাগৃহ আছে কিন্তু সাউণ্ড সিস্টেমে গলদ থাকায় সেখানে নাটক করা যায় না। বর্তমানে কিছু কিছু নাটক, যাত্রা বা ম্যাজিক শো জেলা স্পোর্টস অকাদেমির ইনডোর স্টেডিয়ামে হয়। শিশু উদ্যানে ও ডিএম বাংলোর পেছনে সিপাই বাজার ও খাপ্রেলবাজারের কাছে ইনডোর স্টেডিয়াম। পাশেই একটি আর্টকলেজ। এটি আটের দশকে গঠিত হলেও—বর্তমানে পরিচালনার দোষে নানা সমস্যায় ধুঁকছে। এই আর্টকলেজ মডার্ন আর্টকে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য চিত্রপ্রদর্শনী একসময় হয়েছে। বিগত শতকের পাঁচ, ছয় ও সাতের দশকে প্রতি বছর মেদিনীপুর জেলা চিত্রকলা প্রদর্শনী হতো বাংলা স্কুলে। বিগত শতকের ছয়ের দশক থেকে মেদিনীপুর শহরে স্নিগ্ধা পাল রবিসপ্তক নামে রবীন্দ্রসংগীত ও নৃত্যনাট্যের চর্চার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে রবিসপ্তকের ছাত্রছাত্রীরা এবং সহযোগীরা শহরে রবীন্দ্রসংগীত ও রবীন্দ্র নৃত্যচর্চার কয়েকটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন। সত্যম মহান্তি প্রতিষ্ঠা করেন লোকসংগীতের প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার পর থেকে মেদিনীপুর শহরের সাংস্কৃতিক পরিবেশ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। পাঁচ ও ছয়ের দশকে সেতারশিল্পী শচীন সাহা যদু ভট্ট সংগীত সম্মিলন করতেন---সারা রাত ধরে ধ্রুপদী সংগীতের আসর। বড় বড় ধ্রুপদী সংগীত শিল্পীরা শহরে আসতেন। শচীন সাহা নিজেও বড় মাপের সেতার শিল্পী। তাঁর সরগম-এ দেশ-বিদেশের শিল্পীরা সেতার শিখতে আসতেন। ব্যক্তিগত ভাবে আমি যৌবনে বহুবার তাঁর বাড়ির আসরে সংগীত শুনতে গিয়েছি।

মেদিনীপুর শহরে নানা ধর্মের মানুষ বাস করেন। তার মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানরাই প্রধান। এছাড়া খ্রিস্টান, কিছু বৌদ্ধ ও আদিবাসী এ শহরে বাস করেন। মুসলমানরা সাধারণত নিজস্ব মহল্লায় বাস করা পছন্দ করেন। প্রান্তিক অঞ্চলে খ্রিস্টানরা ও আদিবাসীরা। কিন্তু রথের মেলা, ঝুলন যাত্রা, দুর্গাপুজো, রাসমেলা, ভাইফোঁটা, সরস্বতী পূজা, হোলি উৎসবে সব সম্প্রদায়ের লোক অংশ নেন। অন্যদিকে মুসলমানদের মহরম, ঈদ-এ প্রধানত মুসলিমরা অংশ নিলেও, উরস উৎসবে সব ধর্মের লোকেরা অংশ নেন। উরস-এ বাংলাদেশ থেকেও বিশেষ ট্রেন মেদিনীপুর স্টেশনে আসে। ছেলেবেলায় শহরের মোড়ে মোড়ে মুসলমানদের শোভাযাত্রা লাঠি খেলা দেখতাম। শেষদিন ভোরবেলা কলেজগ্রাউন্ডে শত শত মহরমের তাজিয়া এসে জমা হত। তাজিয়া-র মেলা বসে যেত। পরে বড়দিনে শহরে বেশ করে চার্চের মেলা শুরু হয়। ২৫ ডিসেম্বর থেকে ইংরেজি নববর্ষ পর্যন্ত মেলা চলে। স্টেশন এলাকায় বেশকিছু বিহারী মানুষ বাস করেন। তাঁদের ছটপুজোয়ও বেশ ঘনঘটা দেখা দেয়।

নগরায়ণ বলতে যা বোঝায় তা মেদিনীপুরে শুরু হয় বিগত শতকের আটের দশক থেকে। তার আগে মেদিনীপুর ভারতের বৃহত্তম জেলার কেন্দ্র হলেও মফস্‌সল শহর ছিল। অগ্নিগর্ভ সাতের দশকে নকশাল আন্দোলনের প্রভাবে গ্রামের বেশ কিছু জমিদার ও জোতদার শহরে চলে আসতে শুরু করে এবং ঘরবাড়ি তৈরি বানায়। তা সত্ত্বেও শহরের বেশির ভাগ অঞ্চল টাড় জমির মতো পড়েছিল। এক মহল্লা থেকে অন্য মহলা মাঠের ওপর দিয়ে কোনাকুনি পায়ে হেঁটে চলে যাওয়া যেত। তখন পথের দুধারে আঁকড়গাছ, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, শিমুল, কদম, শালগাছ, সেগুনগাছ দেখা যেত। যা কিছু খেলাধূলা হতো কলেজমাঠ, কলিজিয়েট স্কুল মাঠ ও ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামে। রেডক্রস হাসপাতালের পেছনে ছিল স্টেডিয়াম। স্টেডিয়াম নামেই স্টেডিয়াম। প্রাচীর ঘেরামাঠ। মাঠের একদিকে উঁচু মঞ্চ। স্টেডিয়াম প্রকৃত স্টেডিয়ামের চেহারা নেয় বছর কুড়ি আগে। স্টেডিয়ামে স্কুল লিগ ও ক্লাব লিগ ফুটবল খেলা হতো আগে। শীতকালে কলেজ ও বড় বড় স্কুলের স্পোর্টস। শহরের বিখ্যাত ফুটবল ক্লাব—মেদিনীপুর স্পোর্টিং ক্লাব, রিক্রিয়েশন ক্লাব, সান্ত্রাফোকিয়া ক্লাব ইত্যাদি।

১৯৭৭-এ বাম জমানা শুরু হওয়ার পর থেকে অপারেশন বর্গা জোর কদমে চলতে থাকে। সরকার জমি রাখার নির্দিষ্ট সিলিং বেঁধে দেওয়ায় কংগ্রেসি জমানার জোতদার জমিদাররা শহরে প্লট করে জমি বিক্রি শুরু করেন। অন্যদিকে গ্রামের অবস্থাপন্ন পরিবার ও ধনী পরিবারগুলি গ্রামের জমিজমা বিক্রি করে শহরে ভিড় জমাতে শুরু করেন। বিগত শতকের সাতের এমনকি আটের দশকেও শহরে এককাঠা জমি ২০০ থেকে ৫০০ টাকায় পাওয়া যেত। শহরের নতুন এলাকা কুড়িপঁচিশ বছর

□□ আটের দশক থেকেই মেদিনীপুর শহর অকাদেমি শহরে রূপান্তরিত হতে থাকে প্রধানত বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে। ১৯৮১-তে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট চালু হবার পর ১৯৮৩-এর ১২ আশ্বিন (২৯ সেপ্টেম্বর) বিদ্যাসাগরের জন্মদিনে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। আইআইটি-র অধ্যাপক প্রয়াত অনিলচন্দ্র গায়েন এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপাত করেছিলেন।

আগেও ছিল প্রান্তিক অঞ্চল। তখন ১০ কাঠা জমির দাম ছিল পাঁচ হাজার টাকা। আর বর্তমানে এক কাঠা জমির দাম ছয় থেকে আট লক্ষ টাকা। ফাঁকা ক্যান্টনমেন্ট এরিয়াও এখন ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা—শরৎপল্লী থেকে নদীর ধার, ডাকবাংলো রোড, রেললাইনের ওধারে রাঙামাটি—শূন্য ধূ ধূ মালভূমি ছিল। বর্তমান মেদিনীপুর শহরে যে আধুনিক নগরায়ণের ছাপ পড়েছে তা বিগত দশ-বারো বছরের ঘটনা।

আটের দশক থেকেই মেদিনীপুর শহর অকাদেমি শহরে রূপান্তরিত হতে থাকে প্রধানত বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে। ১৯৮১-তে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট চালু হবার পর ১৯৮৩-এর ১২ আশ্বিন (২৯ সেপ্টেম্বর) বিদ্যাসাগরের জন্মদিনে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। আইআইটি-র অধ্যাপক প্রয়াত অনিলচন্দ্র গায়েন এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপাত করেছিলেন। এ-সময় সিপাই বাজারের কাছে একজনের বাড়িতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আফিস ছিল। ১৯৮৫-র জুলাই মাসে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস গড়ে উঠলে মেদিনীপুর জেলার ত্রিশটি কলেজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চলে আসে। পরে আরো পাঁচ-ছটি নতুন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পায়। এই বিশ্ববিদ্যালয় দ্রুত মেদিনীপুর শহরের পরিবর্তন ঘটাতে থাকে। অন্যদিকে শালবনিতে ট্যাঁকশাল তৈরি হওয়ায় বাইরের রাজ্যের অনেক লোক এসে মেদিনীপুর শহরে ভিড় জমাতে শুরু করেন। ফলে রাতারাতি শহরে বাড়ি ভাড়া

দু-তিনগুন বেড়ে যায়। শালবনির ট্যাঁকশলে কর্মী ও অফিসারদের নিজস্ব ক্যাম্পাস তৈরি না-হওয়া পর্যন্ত শহরের জনসংখ্যার চাপ বাড়তে থাকে। মেদিনীপুর স্টেশন থেকে শালবনি যেতে মাঝে মাত্র একটি স্টেশন--- গোদাপিয়াশল। তাছাড়া ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা। শহরে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল বিদ্যাসাগর শিশু নিকেতন (ICSC) জন্ম নেয়। বর্তমানে শহরে ডিএবি-র স্কুল ছাড়াও আরো তিন-চারটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। এদের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা প্রচুর। একুশ শতকের শুরু থেকে এই সব স্কুলে ছাত্রছাত্রীর চাপ বাড়তে থাকে প্রধানত মধ্যবিত্ত শ্রেণির হাতে নগদ অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায়।

বিগত শতকের পাঁচের দশক থেকে শহরে রাজা নরেন্দ্রলাল খান্ মহিনশ মহাবিদ্যালয় ছিল। মেদিনীপুর কলেজ তো প্রাচীন কলেজ। (১৮৭৩-এ প্রতিষ্ঠিত)। সাতের দশকে কমার্স কলেজ, বি.টি. কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন তো ল-কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ, আর্ট কলেজ, আইটিআই আছে। ১৯৭৫-এর জরুরি অবস্থার সময় থেকে শহরের কিছু কিছু রাস্তাঘাট চওড়া হতে থাকে। কিন্তু আটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে শহরের নতুন নতুন এলাকা মিত্র কম্পাউন্ড, ক্ষুদিরাম নগর, বিধাননগর, শরৎপল্লী অরবিন্দ নগর, বিদ্যাসাগর পল্লী, অরবিন্দনগর ইত্যাদি শুধু গড়ে উঠল তাই নয় — ঘনবসতিপূর্ণ হয়ে উঠল। নতুন নতুন বাজার ও মার্কেট দেখা দিল। শহরের জলসরবরাহ ব্যবস্থা (বিশ্ব ব্যাংকের টাকায়), জলনিকাশী বা নর্দমা ব্যবস্থা উন্নত হতে শুরু করল। বড়বাজার, স্কুলবাজার, নিমতলা, বটতলা, মিরবাজারের সরু ঘিঞ্জি রাস্তা চওড়া হলো। মেদিনীপুর মিউনিস্যিলটির প্রাচীন ভবনটি ভেঙে তৈরি হল। পুলিশ ফাঁড়ির সংখ্যা বাড়ল। দোতওয়ালী থানায় মহিলা পুলিশ ও অফিসার এলেন। শহরে এখন অসংখ্য কমপিউটার শেখার কেন্দ্র। অনেক অফসেট মুদ্রণের প্রেস।

বিগত বাম-জমানায় ঘটা কেশপুরের ঘটনার সময় থেকে ও তার পরে জঙ্গলমহলের ঘটনায় মেদিনীপুর শহরে জনসংখ্যার চাপ বেড়ে গেল। একুশ শতকের শুরু থেকে মেদিনীপুরে হাইরাইজ বিল্ডিং ও ফ্ল্যাট-সংস্কৃতি দেখা দিল। অবশ্য সামনে কলাইকুন্ডা এয়ারফোর্স স্টেশন থাকায় মেদিনীপুর শহরে নির্দিষ্ট উচ্চতার বেশি হাইরাইজ তৈরি সম্ভব নয়। ফলে এখানে সর্বোচ্চ পাঁচতলা বাড়ি তৈরি হতে পারে। এখানকার প্রাচীন এলকাগুলোতেও এখন বাগান, পুকুর, পুরোনো বাড়ি নিশ্চিহ্ন করে হাইরাইজ বিল্ডিং উঠতে শুরু করেছে। দুটি সিনেমাহল ভেঙে শপিংমল হওয়ার কথা থাকলেও এখনও হয়নি। ছ-সাত কিলোমিটার দূরে খড়্গপুর শহরের গিরি ময়দান স্টেশনের কাছে শপিংমলে শহরবাসীরা শপিং করতে যান। শহরে এখনো পায়ে টানা রিকশা থাকলেও— অটোর সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। প্রাইভেট গাড়ির সংখ্যাও এখন অনেক বেড়ে গেছে। বিভিন্ন রাস্তায়, বিশেষত অফিস শুরুর সময়ে ও সন্ধেবেলা রাস্তা স্থাণুবৎহয়ে থাকছে। কালেকটরেটের কাছে ক্ষুদিরাম স্ট্যাচু মোড়ে ও কেরানিওকার চৌ-রাস্তার মোড়ে ট্রাফিক সিগন্যালিং ব্যবস্থা শুরু হলেও— শহরে আরো কয়েকটি মোড়ে সিগন্যালিং ব্যবস্থা দরকার। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, সংলগ্ন ইকোপার্ক ও প্যারামেডিক্যাল কলেজকে কেন্দ্র করে রাঙামাটি অঞ্চলে জনসংখ্যা ও ট্রাফিকের চাপ বাড়ছে। বিশেষত বিদ্যাসাগর শিশু নিকেতন ও ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার গোডাউন, ফরেস্ট বাংলো সংলগ্ন রাঙামাটি অঞ্চলে— সেইসঙ্গে মহিলা কলেজ অঞ্চলেও। দীর্ঘদিন রেলক্রসিং-এ ট্রাফিক জ্যাম হতো। শেষপর্যন্ত স্টেশন রোড ও রাঙামাটির মধ্যে ফ্লাইওভার তৈরি হয়েছে। ফলে শহরের এ-দিকে ট্রাফিকের চাপ কমলেও— তাঁতিগেড়িয়ার দিকে রেল-লেভেল-ক্রশিং-এ আরেকটি উড়ালপুলের চাহিদা বেড়েছে। ঐ দিকেই ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার সংখ্যা, দোকান পাট বেড়ে গেছে। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, মহিলা কলেজ, খয়েরউল্লাচক তাঁতিগেড়িয়া দিয়েও বহু মানুষ যাতায়াত করেন। তাছাড়া মেদিনীপুর শহর থেকে ধেড়ুয়া সেতু দিয়ে ঝাড়গ্রাম যাওয়া যায়। তাই বহু যানবাহন এই পথে চলে। মেদিনীপুর স্টেশনের ওপর দিয়ে দূরপাল্লার বহু ট্রেন যাওয়ার ফলে দীর্ঘসময় তাঁতিগেড়িয়া লেভেলক্রশিং-এ যানবাহন, পথচারীরা আটকে থাকেন। কাঁসাই বা কংসাবতী নদী থাকায় দক্ষিণ দিকে মেদিনীপুর শহরের আর বাড়বার সম্ভাবনা নেই। শহর বাড়তে পারে কেরানিচটির দিকে। ইতিমধ্যেই কেরানিচটি পর্যন্ত রানিগঞ্জ সড়কের দুধারে ঘনবসতি তৈরি হতে শুরু করেছে। এদিকে পুলিশ লাইন, জেলখানা পেরিয়ে শহর চলে গেছে।

আইন-ই-আকবরির হিসেব ধরলে মেদিনীপুর শহরের বয়স পাঁচশ বছরের বেশি। ব্রিটিশরা ২২ সেপ্টেম্বর ১৭৮৩ মেদিনীপুর শহরকে জেলার প্রধান কেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করে। অন্যদিকে ওড়িশার চোড়গঙ্গ রাজাদের শিলালিপির কথা ধরলে মেদিনীপুর ৮০০ বছরের পুরনো শহর। ৮০০ বছর আগে অবশ্য নাম ছিল ‘মিঠুনপুর’। আধুনিক মেদিনীপুর শহর যেমন আকাদেমি শহর (কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে), তেমনি পুরোনো মেদিনীপুর ঐতিহাসিক শহর। ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর বিখ্যাত হয়ে ওঠে। শহরের প্রতিটি মোড়েই এক বা একাধিক শহিদের ব্রোঞ্জ বা পাথরমূর্তি আছে। এছাড়া শহরে ২০০ থেকে ৫০০ বছরের পুরোনো মন্দির, মসজিদ আছে। আধুনিক সময়ে শহরের শিশুউদ্যান, সুকুমার সেনগুপ্ত উদ্যান, ইকোপার্ক, কাছেই কর্ণগড় মন্দির, হজরত পীর লোহানর এক গম্বুজ সমাধি মসজিদ, মিরবাজারের টিকিয়া মসজিদ, নতুন বাজারের জগন্নাথ মন্দির, বড়বাজারের শীতলামন্দির, আলিগঞ্জ তিন গম্বুজ দেওয়ানাখান মসজিদ (আওরঙ্গজেবের দেওয়ান কেফায়ৎ মোল্লা প্রতিষ্ঠা করেন), সিপাইবাজারে চোল শাহ মসজিদ (১৬৪৪-এ নির্মিত), প্রাচীন দুর্গামন্দির, কলেজ-কলিজিয়েট মাঠের পাশে প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ (ছেলেবেলায় আমরা পুরানো জেলখানা বলতাম)— যেখানে মুঘল ও মারাঠীরা দুর্গ হিসেবে ব্যবহার করত, পরে ইংরেজরা সেনানিবাস ও জেলখানা হিসেবে ব্যবহার করে, বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দির, স্টেশন রোডে ১৮৫১-এ প্রতিষ্ঠিত রোমান ক্যাথলিক গির্জা, আব্বাসগড়ে ব্যাপটিস্ট মিশন গির্জা, আব্বাসগড়, মির্জা বাজারের জোড়া মসজিদ উল্লেখযোগ্য দেখার জায়গা। রোড চন্দ্রকোণায় গড়ে উঠছে ফিল্মসিটি।

অদূর ভবিষ্যতে মেদিনীপুর ও খড়্গপুর শহর নিয়ে একটি বৃহৎ নগর তৈরি হতে চলেছে। কাঁসাইনদীর উত্তরে মেদিনীপুর দক্ষিণে খড়্গপুর রেলওয়ে জংশন শহর ও হিজলির আইআইটি। দুই শহরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ইতিমধ্যেই টাটা মেটালিক্স, কোকওভেন, টাটা বিয়ারিং, বিভিন্ন ইস্পাত কারখানা তৈরি হয়ে গেছে। দুই শহরের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে কলকাতা— মুম্বাই সোনালি সড়ক এনএইচ— সিক্স।

বিশ্বায়ন-শিল্পায়ন যেভাবে চলছে মনে হয় অতিদ্রুত দুই শহরের মধ্যেবর্তী অঞ্চলের ধানখেত ও সবুজ অঞ্চল মুছে গিয়ে নিঃশব্দে কংক্রিটের শহর মাথা তুলবে। একটাই বাঁচোয়া, সামনে কলাইকুন্ডা এয়ারফোর্স থাকায় মেদিনীপুর— খড়্গপুর যমজ শহরে কোনোদিন পাঁচতলার বেশি হাইরাইজ উঠবে না। □

সুরুলিয়ায় নাচনির পরিসর

সুধাংশু চক্রবর্তী

সকালের কাগজে হেডলাইন ছিল 'রেলের কালো দিন'। কালকা মেল-এ এতগুলো মৃত্যুর খবর নিয়ে এসেছিল একটা আতঙ্কের ভাবনা। ঘড়ির কাঁটার মানে সেকেন্ডের কাঁটার একচুল এদিক-ওদিক জীবন-মৃত্যুর মাঝে দেওয়াল তুলে দিল, হাহাকার ও স্বজন হারানোর নির্মম পরিবেশ তৈরি করে দিল। সকালের এইসব দুঃসংবাদের ভাবনা মাথায় নিয়েই বিকেলে পুরুলিয়া যাত্রা। কারণ 'মানভূম লোকসংস্কৃতি ও নাচনি উন্নয়ন এবং গবেষণা কেন্দ্র'টি উদ্বোধন করতে যাবেন এলাকার বিধায়ক ও মন্ত্রী শ্রী শান্তিরাম মাহাত। সমস্ত আয়োজন পাকা করতে এই যাত্রা, যদিও দিনকালের গতিকে এ-যাত্রা অন্তিমও হতে পারত।

নাচ-গান-বাজনা, তিনে মিলে নাচনি শিল্প। খোলা হাওয়ায়, মুক্ত আকাশের নীচে গ্রামীণ বিনোদন। নাচনি নাচে বাজানোর যন্ত্রগুলি হল—ঢোল, ধামসা, করতাল ও তাসা। আর এগুলির বাজনদারদের বলে সুরপার্টি। নাচনির পোশাক হলো ঘাঘরা, ব্লাউজ আর কোমর বন্ধনী যার দুই অগ্রভাগ কোমর বাঁধার পর ক্রুশভাবে কাঁখের উপর দিয়ে পিঠের দিকে ঝুলে থাকে। গায়ে থাকে ঘুঙুর, দুইহাতে রুমাল, রসিকের ধুতি পাঞ্জাবি আর মাথায় পাগড়ি। ঝুমুরের সুরের সহযোগিতায় প্রথমে সানাই তান ধরবে, বাজনায় প্রথম আসবে ঢোল তারপর ধামসা, তাসা ও করতাল। মূলত খোলা আকাশের নীচে, বৃত্তাকারে দাঁড়ানো দর্শকদের মাঝে এর আসর। নাচনি নাচের প্রাণস্পন্দন ঝুমুর, নৃত্যকর্মটি নিয়ন্ত্রিত হয় ঝুমুরের রস, ভাব ও বিষয় অনুযায়ী। আর নৃত্যের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয় আটটি অঙ্গ—মাথা, ভুরু, চোখ, মুখ, বাহু, ছাতি, কোমর ও পা। ঝুমুরের ভাব ও সুরকে নাচনি নেচে-গেয়ে রঙিন করে তোলে ছন্দে, মাতিয়ে তোলে লাস্যে-কটাক্ষে, দর্শনীয় করে তোলে হস্তে, মুদ্রায় ও ভাবে। এক ঝুমুরশিল্পীর মতে নাচনি শিল্পের প্রসারের জন্য বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গন থেকে শুরু করে পালাপার্বনের অঙ্গন, সব জায়গাতেই অবাধ থাকা প্রয়োজন।

ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের দ্রাবিড় গোষ্ঠীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষজন আপন খেয়ালে জীবনের চাওয়া-পাওয়া জানান দিতে যে গান করেন তার নামই ঝুমুর। বাঁধনহীন অথচ ছন্দোবদ্ধ এই মানুষেরা সেই কবে থেকে ঝুমুর বাঁধতেন, লিখতেন না। কলিভিত্তিক রচনার রেওয়াজ ভারতবর্ষের সাহিত্যে প্রাচীন। বৈদিক যুগের মন্ত্র, খনার বচর, চুটকুলা, শায়েরি, টুসু-ভাদু গীত সবকিছুতেই কলিভিত্তিক রচনার নিদর্শন পাওয়া যায়। ঝুমুর গানের সুর-মাত্রা-লয়,প্রকারভেদ যাইহোক না কেন কলিভিত্তিক রচনা এসবেরই ক্রমবিবর্তন। ঝুমুর গান ও নাচনি নাচ সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। ছোটনাগপুর, ঝাড়খণ্ড, মানভূম অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর লোকেরাই এই সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। জামতাড়ার রাজবাড়ি ছিল একসময় ঝুমুর গানের দুর্গ। সন্ধেবেলা হলেই রাজার বৈঠকখানায় বসত ঝুমুর নাচনিদের আসর। জামতাড়া আর মিহিজামের মাঝামাঝি, আসানসোল-পাটনা রেললাইনের ধারে সাহারডাল গ্রামকে বলা হতো নাচনিদের গ্রাম, নাচনি ও রসিকদের বসতি।

যিনি নাচনি রাখেন তিনি রসিক নামে পরিচিত। রসিক কথার অর্থ হলো 'রসের সাগর'। নাচনিকে রসিকই নৃত্যশিক্ষা দেন, নাচনির উপার্জনেই রসিকের সংসার চলে। কিন্তু নাচনিরা রসিকের বিবাহিত স্ত্রী হন না। এরা রসিকের তৈরি সম্পত্তি। একজন রসিকের একাধিক নাচনি থাকতে পারে। তবে নাচনির একাধিক রসিক থাকতে পারে না। রসিকের পৃথক সংসার থাকে, ছেলেমেয়ে থাকে। নাচনির জন্য থাকে পৃথক ঘর, রসিকের বাড়িতে নাচনির অবাধ যাতায়াত থাকে না। রসিকের ঔরসে নাচনিরা সন্তান সম্ভবা হন, সন্তানের জন্ম দেন। অথচ নাচনি কিংবা নাচনির সন্তান রসিকের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারেন না। নাচনির সন্তানের বিয়ে ঠিক হয় কোনো নাচনির ছেলেমেয়ের সাথে। একটি মেয়ে ঘরের বাইরে এসে এক পুরুষের কাছে আশ্রয় পায়, নাচ-গান শেখে, আসরে গাইতে গাইতে গলা ভাঙে, মোটা হয়ে যায় কণ্ঠস্বর। নাচনি জগতে ঢুকে পড়া সহজ, টিকে থাকা কঠিন, কিন্তু বেরিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। তাই নাচনি প্রথা এক স্বতন্ত্র সামাজিক বিধি। জীবন যাপনে দেবদাসী ও নাচনির খানিকটা মিল রয়েছে। কিন্তু দেবদাসীর মান্যতা পায়নি নাচনি। নাচনি প্রথার সৃষ্টির মূলে রয়েছে তিনটি কারণ : একটি দরিদ্র পরিবারে নারীর অসহায়তা, দ্বিতীয়টি ক্ষমতাশালী পুরুষের লালসা এবং তৃতীয়টি ধর্মাচরণের মোড়কে বা শিল্পের আড়ালে ভোগবিলাস।

নাচনি বিষয়টি বুঝতে গেলে যে বিশেষ অঞ্চল জুড়ে এর প্রচলন ও প্রভাব, সেখানকার অধিবাসীদের বিশ্বাস, সংস্কার এবং চিন্তাভাবনার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। এই বিশেষ অঞ্চল

বলতে পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলা, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের কিছু অংশ, ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশের কোনো কোনো অংশে বসবাসকারী হাড়ি, বাউরি, কামার, কুমোর, কুইরি, নাপিত, ধোপা, তাঁতি, জোলাদের বলে কুড়মি যাদের মাতৃভাষা হচ্ছে কুড়মালি। কুড়মি জাতির টোটেম হচ্ছে কুড়ম বা কচ্ছপ। এদের বিশ্বাস কচ্ছপই সমুদ্র থেকে মাটি তুলে পৃথিবী সৃষ্টি করেছে। কুড়মি জাতির ধর্ম 'সারনা ধর্ম'। কুড়মালি সংস্কৃতি কৃষিভিত্তিক। কোনো নারীকে রাখনি, খাওয়াসিন এবং নাচনিরূপে গ্রহণ করার সামাজিক প্রথা কুড়মি সমাজে প্রচলিত। কুড়মালি ভাষায় 'ততঁ' শব্দের মানে সন্ধান। যে জনগোষ্ঠীর মানুষ জড়জগৎ এবং জীবজগৎ অর্থাৎ জগৎ সৃষ্টির মাহাততঁ বিশ্বাস ও অনুসরণ করেছিল তারাই মাহাতঁত নামে পরিচিতি লাভ করেছিল। মাহাতঁত শব্দের অপভ্রংশ হচ্ছে মাহাত। এই কুড়মি সমাজ ও তার সংস্কৃতি, আর্যদের এদেশে আসার আগেই ছিল।

এই অঞ্চলের নারীদের দুঃখবেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ হয় এই অঞ্চলের নিজস্ব লোকসংগীত ঝুমুরের মাধ্যমে। ঝুমুর গাইতে পারে আর যে পুরুষের ঝুমুরে সমস্ত মানুষ সচকিত হবে এমন পুরুষই এই অঞ্চলের নারীদের পছন্দ। লোকসংগীত রচয়িতা অনন্ত কেশরিয়া বলেছেন ঝুমুর-এর মূল শব্দ 'ঝুমেইর'। 'ঝু' অর্থে ঝুড়, 'মেইর' অর্থে মই। অর্থাৎ বন বা জঙ্গল থেকে যে সুরসৃষ্টি হলো মই দেওয়ার মতো লোকসমাজে। সেই সুর একাকার হয়ে গেল। আর এক কবি ও শিল্পী কর্মবীর মাহাত-র মতে এই অঞ্চলের মানুষ একসঙ্গে মিলবার জন্য জমায়েত বা সঙ্ঘবদ্ধ করার জন্য যে বিশেষ সুরে 'ঝুমঅর' ডাকা হত সেই সুরকেই বলা হয় 'ঝুম্যর'। এই অঞ্চলের এক সাহিত্যিক রাধাগোবিন্দ মাহাত উত্তর বিহারের সাঁওতাল পরগণার রাজমহল পাহাড় থেকে দক্ষিণে সিমলিপাল পাহাড় পূবে খড়গপুর থেকে পশ্চিমে ডালটনগঞ্জ ও পালামৌ জেলার ভূখণ্ডকে 'ঝুমুরখণ্ড' বা 'জুম্যর দেশ' বলেছেন।

ঝুমুরকে ঝাড়খণ্ডী কীর্তনও বলে। চৈতন্যদেবই কীর্তন কথাটির ব্যাপক প্রচার করেছিলেন। কীর্তন প্রতিষ্ঠা লাভ করে ষোড়শ শতকে। তাই ঝুমুর কীর্তনের চেয়ে প্রাচীন। ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করার জন্য ঝাড়খণ্ড বা ঝুমুরদেশের মধ্য দিয়ে পুরী গিয়েছিলেন। চৈতন্যদেব নিজে 'তাণ্ডব' ও 'লাস্য' নৃত্যে দক্ষ ছিলেন। মহাদেব তার শিষ্য তণ্ডুকে যে নাচ শিখিয়েছিলেন তা হলো 'তাণ্ডব' নৃত্য এবং পার্বতী বানরাজার মেয়ে ঊষাকে শিখিয়েছিলেন 'লাস্য' নৃত্য। 'তাণ্ডব' বীররসের এবং 'লাস্য' কোমল শৃঙ্গার রসের নাচ। 'নাচনি'র নাচে এই লাস্য দেখতে পাওয়া যায়। দামোদর মিশ্রের *সংগীত দামোদর*-এ ঝুমরি রাগিনীকে বলা হয়েছে শৃঙ্গার রসাত্মক। চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এও ঝুমুরের লক্ষণ আছে। গবেষকরা বলেন, বৈষ্ণব প্রভাবে প্রেমসংগীত ঝুমুরে যোগ হয় রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-লীলামূলক বিষয়। যাইহোক, দ্রাবিড় গোষ্ঠীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এই ঝুমুর গান, সমতল বাঙালির কাছে একটি সাংস্কৃতিক উপাদান না হয়ে, এটি একটি আঞ্চলিক সংগীত হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। ফলে ঝুমুরের প্রতি উদাসীন রইল বাংলার কবি ও শিল্পীরা। তবে নাচনি নাচের আসরের রমরমা হারিয়ে গেছে অনেক আগে। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে অনেকে জমিদারি হারান ফলে নাচনি পৃষ্ঠপোষকতায় অক্ষম হন। এই সময় মূলত কৃষি নির্ভর স্থানীয় মাহাত ও সর্দার শ্রেণিভুক্ত এক শ্রেণির পৃষ্ঠপোষক রসিকের আবির্ভাব হয়। সমাজ সংসারে টিকে থাকতে এবং অন্য বিকল্প ব্যবস্থা না খুঁজে পেয়ে, এই নতুন পৃষ্ঠপোষক রসিকদের নাচনিরা মেনে নেন।

পুরুলিয়া জেলার বান্দোয়ান থানার মাখলা গ্রামে এক কৃষক পরিবারে সিন্ধুবালা দেবী জন্ম নিয়ে মাত্র তেরো বছর বয়সে নাচনি দলে যুক্ত হয়েছিলেন। নিজের প্রতিভার গুণে তিনি হয়ে উঠেছিলেন ঝুমুর শিল্পী ও নাচনি। ১৯৯৪ সালে লালন পুরস্কার এবং ১৯৮৭-৮৮ সালে আকাদেমি সম্মান পেয়েছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সৎকার হয়েছিল। রাজুয়াবালা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নাচনি নৃত্য পরিবেশন করেছেন। বিমলাদেবী নাচনি নৃত্য ও ঝুমুর গানের শিক্ষিকা, এই নাম যশ হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের ব্যক্তিজীবন পড়ে থাকে অন্ধকারে। শেষ বয়েসে ভিক্ষাবৃত্তিই তাদের জীবনধারণের অবলম্বন হয়। ২০০৬ সালের জুলাই মাসে রাজুয়াবান মারা গেলেন। মহুল গাছের তলায় প্রাণহীন নিথর দেহটা পড়েছিল। মৃতদেহে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে, রেল লাইনের ধারে ফেলে আসা হয়। এক শিল্পীর এক করুণ নিষ্ঠুর পরিণতির কথা এসে পৌঁছেছিল দুর্বার সংগঠনের অফিসে। দুর্বার থেকে একটি টিম যায় পুরুলিয়ায়। দূরে দূরে থাকা নাচনিদের একত্রিত করা হয়। দুর্বারের অধিকার আদায়ের আন্দোলনের কথা শুনলেন নাচনিরা। নাচনিদের জোট বেঁধে শক্তিশালী করে উন্নয়নে সামিল করার উদ্যোগে যুক্ত হলেন পুরুলিয়ায় পরিচিতি আছে এমন জনাকয়েক মানুষ জন। নাচনিরাও বুঝেছিলেন সংগঠন তৈরি করতে পারলে অনেকদূর পর্যন্ত এগোনো যায়। পুরুলিয়া জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরে ২০০৬ সালে ৬ অক্টোবরে নাচনিদের নিয়ে সভা বসে। পরের সভা ২০০৬ সালের ১৫ অক্টোবরে বলরামপুরের রয়েল ছৌ একাডেমির মাঠে। তৈরি হয় 'মানভূমি লোকসংস্কৃতি ও নাচনি উন্নয়ন সমিতি'। ২০০৭ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে এক আলোচনাচক্র বসে পুরুলিয়ায় শ্যাম ধর্মশলায়। ২৮ মার্চ, ২০০৭ সালে কলকাতায় দুর্বার আয়োজিত সর্বভারতীয় বিনোদকর্মী সম্মিলনে যোগ দিলেন নাচনি ও তাদের রসিকরা। ১ এপ্রিল, ২০০৭-এ জয়পুরের ফরেস্ট মোড়ে হলো প্রথম নাচনি সম্মিলন। ৩০ এপ্রিল, ২০০৭-এ কলকাতার একাডেমি অফ ফাইন আর্টস হল্-এ বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে হয় এক আলোচনা চক্র। তৈরি হয় নাচনিদের শিল্পীর মর্যাদা দেবার দাবিপত্র। এই দাবিপত্র পেশ করার কথা ছিল তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। তাঁর দফতর থেকে নির্দেশ আসে সংস্কৃতি দফতরের অধিকর্তার কাছে জমা দিতে। সংগঠনের তরফ থেকে পোস্তবালাদেবী দাবিপত্র জমা দেন। ৪ এপ্রিল ২০০৭ সালে সংগঠন রেজিস্টার্ড সোসাইটি হিসাবে সরকারি স্বীকৃতি পায়। এইসব প্রচেষ্টার ফসল হলো রাজ্য সরকারের তরফ থেকে নাচনিদের শিল্পী হিসাবে সম্মান প্রদান (২০০৭)। আর এখন জুলাই ১৬, ২০১১ নাচনি শিল্পী বিমলাদেবীও দাবিপত্র তুলে দিলেন এলাকার বিধায়ক ও মাননীয় মন্ত্রী শ্রীশান্তিরাম মাহাত-র হাতে। প্রসঙ্গত, এই দাবিপত্র পেশ করার অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির কথাগুলি এখানে একটু বলে রাখা ভালো।

পুরুলিয়া পৌঁছবার পরের দিনের প্রথম কাজ ছিল এলাকার অত্যন্ত পরিচিত এক সমাজসেবী, একটি আদিবাসী সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা মাননীয় গোপীবল্লভ সিংদেও মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে পুরনো সম্পর্কটা একটু জানিয়ে দেওয়া। পুরুলিয়া শহর থেকে প্রায় ৩১ কিমি দূরে রাজনোয়াগড়ে ওঁর বসতবাটীতে পৌঁছে দেখি এলকার রুক্ষতাকে সরিয়ে দিয়ে গাছ-গাছালিতে ভরা এক সবুজের সমারোহ। একটা গাছ নজর

কাড়লো। নাম শুনলাম 'বাঁদর পিছলা গাছ' যার তলাটা বেদি করে গোল করা আছে। সহকর্মী প্রণব জানালো জ্যোৎস্নারাতে চাঁদের আলোয় এই গাছ এক অদ্ভুত মায়াবী পরিবেশ এনে দেয়। সামনে গিয়ে দেখলাম বাঁদর পিছলে যাবার মতোই গাছের কাণ্ড। শবর অদিবাসীদের কাছে এটা ঔষধি গাছ। গৃহকর্তা জানালেন উনি ছোটো বয়সে ওঁর মায়ের মামার বাড়ি থেকে এই গাছটি এনে এখানে পুঁতে ছিলেন। এই গাছটির বেদিকে ঘিরেই শবর উৎসব পালন হয়। আমরাও এখানে কাঠের বেঞ্চে বসে পড়লাম, বেতের চেয়ারে বসা ওঁর মুখোমুখি। পরিচয়পর্ব ও কুশল বিনিময় করে আসার উদ্দেশ্য জানাতে ওঁর নয়নতারার ফোকাল লেনথ ছোটো হলো, কথার গভীরতা মেপে নিয়ে ফস করে বলে উঠলেন, 'পুরুলিয়ায় বাড়ি তৈরির শুরুতে মিস্ত্রির কাজে ঝামেলা বেঁধে ছিল না!' প্রণব জানালো ওটা মিস্ত্রিদের কাজ ও কাজের মালমশলা নিয়ে হয়েছিল, সংগঠনের সাথে কিছু ঘটেনি। এখন বাড়িটা প্রায় হয়ে এসেছে, উদ্বোধন করতে হবে আর আগামী দিনে কিভাবে চলবে যেটা নিয়ে ভাবতে হবে তো। 'ভাবনটা মাঝখানে অন্যদিকে চলে যায়', বলে উঠলেন। প্রণব ধাক্কা সামলাতে কথা থামিয়ে চায়ের গ্লাসে চুমুক দিল।

ধাক্কা দেওয়া সান্ত্বনার কাজটা উনিই সারলেন। বললেন, 'অনুষ্ঠানে যেতে পারি, কিন্তু কোনও ভাষণ দিতে পারবো না।' সাহস পেয়ে আমিও বলে ফেললাম— 'না না আপনার উপস্থিতিই অনেক।' বিরাট অঙ্কের টেনশন মুক্ত। কলকাতা থেকে আনা নিমন্ত্রণ পত্রে ওঁর নাম ছাপা হয়ে গিয়েছে যে। কথায় কথায় আমলাশোলের কাজের প্রসঙ্গও চলে এল। বিরসা চক-এ প্রতি রোববার হাট বসছে জানালাম। এই হাটে হাড়িয়া বিক্রি বন্ধ হওয়াতে গোটা হাটটাই বেশ ক'দিন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। একথা শুনে জলধর শবর (খেড়িয়া শবর কল্যাণ সমিতির সচিব) একগাল হেসে দিল। এই হাসি জানিয়ে দিল, আদিবাসী জীবন আর হাড়িয়া আলাদা করা যায় না।

ফেরার পথে গাড়ি থামানো হলো এক স্কুল বাড়ির সামনে। ওখানে নাচনি লতা ও তার রসিক হাজারী আছে। উদ্বোধনের কথা বলা হলো, কোথা থেকে ফিরছি, টুকটাক খবর দিতে আর নিতে গাড়ির কাছ বরাবর এগিয়ে এল লতা। ফিসফিস করে বলল, 'আপনারা এসে পড়লেন ভালোই হলো, তুমুল ঝগড়া চলছিল, কেননা আগের মতো নাচের ডাক পাই না আয়ও কমে গেছে, তাই আমাকে ফেলে রেখে নিজের ঘরে ফিরে যাবে হাজারী।' বিষয়টা নিয়ে আমরাও একটু আলোচনা করলাম। সঙ্গে থাকল স্থানীয় উৎসাহী যুবক নবেন্দু মহালি, সুদীপ মাহাত ও সিদ্ধার্থ ভাণ্ডারী।

পরের দিনের গন্তব্য পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন। গেট পার হয়ে সোজা একেবারে মহারাজের সামনে। পরিচয় দিয়ে আসার উদ্দেশ্য বলতেই সোজা নিজের অফিস ঘরে নিয়ে গেলেন। হাতে দেওয়া *দুর্বার ভাবনা* পত্রিকাটির পাতা ওলটাতে ওলটাতে বললেন, 'এই এত প্রচার হচ্ছে, জানতে পারা যাচ্ছে, তা সত্ত্বেও মেয়েরা চাকরি করে দেবার ফাঁদে বা বিয়ের প্রলোভনে পড়ছে।' মৃদু কথাবার্তাও চলল এই নিয়ে।

এরপর গেলাম পঞ্চায়েত অফিসে। নিমন্ত্রণ পত্র ও পত্রিকা দেখে নিয়ে বলে দিলেন 'শনিবার, চেষ্টা করব থাকার।' ওখান থেকে বিডিও অফিস। বিডিও প্রদীপ দাস পঞ্চায়েতের সভাপতির সাথে মিটিং করছিলেন। দুজনকেই নিমন্ত্রণ পত্র দিলাম। নাচনিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান শুনে জয়েন্ট বিডিও বিশ্বজিৎ জানালেন নাচনিদের বিপিএল কার্ড থাকলে ব্লক থেকে বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক প্রকল্পে যুক্ত করা যাবে। পুরুলিয়া ব্লক-২ তে নারী উন্নয়ন নিয়ে দায়িত্বে থাকা সবিতা খাঁ সময় নিয়ে নাচনিদের জন্য দুর্বার কেন এগিয়ে এল আর আগামী দিনে কিভাবে এগোতে চায়, শুনলেন। 'মন্ত্রী আসছেন, যেতে তো হবেই', বলে ফেললেন। অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ আধিকারিক দেবতোষ মণ্ডল নিমন্ত্রণ পত্র পড়লেন। তারপর শুনে নিলেন নাচনি-কথা, পুরুলিয়ায় নাচনির পরিসরের কথা। এবং দিলেন সহযোগিতার আশ্বাস।

পুরুলিয়ায় যেখানে বাড়িটা তৈরি হচ্ছে সেটা পুরুলিয়া স্টেশন থেকে প্রায় চার কিমি দূরত্বে। রিক্সায় গেলে তিরিশ টাকা। বাড়িটির উল্টোদিকেই বিশাল এলাকা জুড়ে 'ডিয়ার পার্ক' যেখানে দেখা মিলবে হরিণ, ভাল্লুক, বাঁদর আর গাছ-গাছালিতে ভরা পাখির কলতান মুখর পরিবেশ। ভিতরে রয়েছে কয়েকটি জলাশয়, গাছের চারা তৈরির জন্য নার্সারি আর দোতলা গেস্ট হাউস। অনুষ্ঠানে আসবেন দুর্বারের প্রধান উপদেষ্টা ড. স্মরজিৎ জানা এবং সচিব ভারতী দে।

সাহেব বাঁধ পার হয়ে এবার গেলাম ফরেস্ট অফিসে। দুটো ঘর বুক করতে।। দুর্দান্ত সুন্দর জায়গা। দুটো বিশাল জলাশয়, মাঝখান দিয়ে পিচঢালা পথ। জলাশয়ে সংস্কারের কাজ চলছে। এখানকার জলকে পরিস্রুত করে পানীয় জল হিসাবে শহরবাসীকে সরবরাহ করা হয়।

অবাঙালি বন আধিকারিকের কাছে নাচনি-কথা বলতে এমন ভাবে তাকালেন যেন ভিন্ন কোনো গ্রহের কথা বলছি। ওঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বড়বাবুর (হেডক্লার্ক) কাছে অতিথি নিবাসের দুটি ঘরের জন্য আবেদনপত্র জমা দিলাম। ওই আবেদনপত্র মঞ্জুর হয়ে রসিদের চিরকুট হাতে পেতে সময় নিয়ে নিল পাক্কা এক ঘণ্টা পঞ্চান্ন মিনিট। মাঝে অবশ্য এককাপ চা ও বিস্কুট খাইয়েছে। দুটি ঘর একদিনের জন্য ভাড়া এক হাজার টাকা। টাকাটা আবার অতিথি নিবাস থেকে বার হয়ে আসার সময়ে ওখানকার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে জমা দিতে হবে। সঙ্গে অবশ্যই বখশিস (অকথিত)।

বনবিভাগের অফিস থেকে বেরিয়ে আসার সময়ে এক কর্মীকে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের অফিসটা কোন্ দিকে জিজ্ঞাসা করে নিয়ে এক রিক্শায় উঠে পড়ে বললাম চলো সার্কিট হাউস, প্রায় মিনিট দশেক লাগল। সার্কিট হাউসের উল্টোদিকের বিল্ডিং। সামনের কিছুটা মাঠ মতন ফাঁকা জমি পড়ে আছে। সেটা পার হয়ে দফতরে ঢুকে শুনলাম উনি জেলা পরিষদ ভবনে গেছেন মিটিং করতে। ওঁর এক সহকর্মীর কাছ থেকে নম্বর পেয়ে ওনাকে মুঠোফোনে উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার করতে উনি জানালেন জরুরি কাজে কলকাতায় যেতে হবে, চেষ্টা থাকবে অনুষ্ঠানে যাওয়ার। বেরিয়ে এসে নজরে এল বাড়িটির দশা। মনে হচ্ছিল রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতির সাথে ওই ভগ্নদশা বাড়িটির যেন কোথাও মিল রয়েছে। আর পুরুলিয়ায় নির্মীয়মান সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র তাই এসেছে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাতে।

পুরুলিয়ার দেবেন মাহাত হাসপাতাল। হাসপাতাল সুপারকে দিলাম কার্ডটি। ওঁর মুঠোফোনের নম্বরটা লিখে নিয়ে ওঁকেই জিজ্ঞাসা করলাম জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কোথায় বসেন। উনি হাত তুলে ওঁর ঘরে যাবার রাস্তাটা দেখিয়ে দিলেন। অফিস ছুটি হয়ে গিয়েছে। ঘরে ফিরতে ব্যস্ত এক করণিকের কাছে নিমন্ত্রণ লিপি রেখে এলাম। পুলিশ সুপার অফিসে ছিলেন। স্লিপ পাঠিয়ে সাক্ষাৎ চাইলাম। ঘরে ঢুকে নমস্কার বিনিময় করে পত্রিকা ও আমন্ত্রণের কার্ড হাতে দিলাম।

ছিপছিপে চেহারায় ডোরাকাটা গেঞ্জি গায়ে ঠোঁটের কোণে হাসি ও মৃদুভাষী জানান দিলেন কি ভয়ানক এক উপদ্রুত অঞ্চলের দায়িত্বে আছেন তিনি। অ্যাডিশন্যাল সুপার-এর চিঠিটাও ওঁর অফিসে রেখে এলাম।

মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান, জেলা সভাধিপতি, সিধু-কানো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয়া উপাচার্য, জেলাশাসক, সহ জেলাশাসক ও জেলা পরিকল্পনা আধিকারিকদের কার্ড বিলি এবং গ্রামে গ্রামে নাচনিদের অন্দরমহলে যোগাযোগ করার কাজটি শেষ পর্যন্ত সুষ্ঠু ভাবেই সম্পন্ন হলো। এর সঙ্গে সুরুলিয়ায় গিয়ে নাচনি পোস্তবালা ও তার রসিক বিজয়-এর সাথে উদ্বোধন অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনা ও বাড়ি তৈরিতে মিস্ত্রিদের কাজের তদারকিও করা হলো যুগপৎ ভাবে।

প্রয়াত নাচনি শিল্পী সিন্ধুবালা মাঝি'র ভাইপোর সাথে কথা হয়েছে। পুরস্কৃত হওয়া সমস্ত মানপত্র, স্মারক ও কয়েকটি ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন। আলোচনা করে স্থির করা হলো ওইসব স্মারক দ্রব্য নিয়ে একটি প্রদর্শনী কক্ষ তৈরি করে মাননীয় মন্ত্রীকে দিয়ে উদ্বোধন করানো হবে, আর সময়াভাবে যখন উদ্বোধন ফলক তৈরি করা হয়ে উঠছে না তখন সামনের একটি দেওয়ালে তেলরঙে লেখা থাকবে উদ্বোধন হওয়ার কথা।

দুটি প্রশ্নের মুখোমুখি বেশ কয়েকবার, বেশ কয়েকজনের কাছে। প্রথমটি হচ্ছে 'দুর্বার তো যৌনকর্মীদের সংগঠন, নাচনিরাতো যৌনকর্মী নয়, তাহলে যৌনকর্মীরা নাচনিদের পাশে কেন। বলে ফেলাই ভাল এই বেশ কয়েকজনের মধ্যে ছিলেন গবেষক, সরকারি আধিকারিক এবং রাজনৈতিক কর্মী। এই প্রশ্নের জবাবে জানান দিতে হয়েছে যে, এক প্রান্তিক জনগোষ্ঠী (যৌনকর্মী) তার চার পাশে থাকা আরও বেশ কয়েকটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে (গৃহশ্রমিক, নির্মাণকর্মী, শবর আদিবাসী এবং অবশ্যই নাচনি) তার নিজেদের সামাজিক অবস্থান পালটাতে ও অধিকার আন্দোলনে সামিল করতে দুর্বার এগিয়ে এসেছে। যাতে এই আন্দোলন আরও জোরদার হয় এবং একে একটা বড় আকার দিতে পারলে সমাজের যারা নীতি নির্ধারণের জায়গায় আছেন তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ পালটানোর কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে— আপনাদের সংগঠনের ভালই টাকা-পয়সা আছে, বিদেশী ফান্ড আসে। এর উত্তরে বলা হলো, 'না, না ওসব কিছুই নেই। কোনো সরকারি প্রজেক্টও আসেনি।' বিদেশী ফাণ্ডতো অনেক দূরের। সংগঠনের সদস্যদের চাঁদা আর কর্মীদের স্বেচ্ছাশ্রমেই চলার পথ তৈরি হয়েছে। এই সুরুলিয়ায় লোক সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রটির জন্য দুবিঘা জমি ক্রয় বাবদ লেগেছে চারলক্ষ টাকা আর বাড়িটি নির্মাণে এখনো পর্যন্ত খরচ হয়েছে বারো লক্ষ টাকা।

এই সব বিষয়ে আরও পরিষ্কার হতে বা করতে স্থানীয় উৎসাহী জনা কয়েক, নাচনিদের নিয়ে ও মানভূম লোক সংস্কৃতি চর্চায় নিয়োজিত এমন জনা কয়েককে নিয়ে আলোচনায় বসা হলো উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আগের দিনে। ইতিমধ্যে কলকাতা থেকে আরও কয়েকজন এসেছেন।পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত গ্রাম-গঞ্জের তথ্যের জন্য স্পেন থেকে আসা এক সংবাদগ্রাহিকাও উপস্থিত। তবে আমাদের আলোচনায় অনেক তথ্য ও বিষয় উঠে এল। তৈরি হলো মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণী দাবি সনদপত্রের খসড়া।

চিঠিটা লেখা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর নামে, প্রতিলিপি যাচ্ছে মন্ত্রী শান্তিরাম মাহাত, মন্ত্রী সমাজ কল্যাণ দফতর, তথ্যসংস্কৃতি বিভাগের অ্যাডভাইসরি কমিটির সদস্যার কাছে। দাবি সনদ পত্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করার বিষয়গুলি হচ্ছে :

১ সরকারিভাবে মানভূম লোকশিল্পীদের পেনসন, শিল্পীভাতা, বার্ধক্যভাতা, ইন্দিরা আবাস যোজনার ব্যবস্থা করা,
২ নাচনিদের সন্তানদের জন্মদাতা রসিকের সম্পত্তিতে অধিকার দেওয়া,
৩ লোকশিল্পী গম্ভীর সিং মুড়া ও সিন্ধুবালার নামে পুরস্কার দেওয়া,
৪ স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে মানভূম লোকসাহিত্য পাঠও হিসাবে স্থান করা,
৫ মানভূম লোকসংস্কৃতি মেলার আয়োজন করা,
৬ কুরমালি ভাষার গঠন ও পাঠন-এর ব্যবস্থা করা।

মাননীয় মন্ত্রী এলেন। তাঁকে বরণ করলেন নাচনি বিমলা, পোস্তবালা, সরস্বতী ও লতা। মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন দুর্বারের সচিব ভারতী দে ও মুখ্য উদদেষ্টা ড। স্মরজিৎ জানা, শবরপিতা গোপীবল্লব সিং দেও, ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক প্রদীপ দাস, রয়েলছের প্রতিষ্ঠাতা ডা. সুখেন বিশ্বাস, ঝুমুর শিল্পী সুনীল মাহাত, সৃষ্টি মাহাত ও কিরিটী মাহাত, খেড়িয়া শবর কল্যাণ সমিতির সচিব জলধর শবর, অধ্যাপক শশাঙ্ক শেখর সেনাপতি, নাটুয়া শিল্পী বীরেন কালিন্দি, সিন্ধুবালা দেবীর ভ্রাতস্থ হৃযিকেশ মাহাত, তথ্যসংস্কৃতি বিভাগের অ্যাডভাইসরি কমিটির সদস্যা নিয়তি মাহাত এবং জনাকয়েক রসিক সহ ঝুমুর শিল্পী। অনুষ্ঠান ছিল নাচনিদের নাচ সহ ঝুমুর গান। নাচে অংশগ্রহণ করেছিলেন বিমলাদেবী, রেনুকাদেবী, শান্তিবালা দেবী, সরস্বতী দেবী, পোস্তবালা দেবী। ছিল ছৌ নাচ। নবেন্দু মাহালির নির্দেশনায় 'প্রভাত আলো'র শিল্পীরা দেবী দুর্গার মহিষাসুর বধ বিষয়ক একটি নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে। পরিবেশিত হয় বাউল গান। শিল্পকলা পরিবেশনকরেন নাটুয়া শিল্পী বীরেন কালিন্দি। অনুষ্ঠানের স্বাগত ভাষণে অনুষ্ঠা চলার মাঝপথে, শঙ্খধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টিতে দেওয়ালে লেখা উদ্বোধন অনুষ্ঠানের কথাগুলির আবরণ পর্দা উন্মোচন করে প্রদর্শনী কক্ষের সবুজ ফিতে কেটে 'মানভূম লোকসংস্কৃতি ও নাচনি উন্নয়ন এবং গবেষণা কেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি প্রকল্প দফতরের মাননীয় মন্ত্রী শান্তিরাম মাহাত। ছ-দফা দাবিসনদ পত্র লোকশিল্পীরা দিলেন মাননীয় মন্ত্রীকে ও সঙ্গে আসা অ্যাডভাইসারি কমিটির সদস্যা নিয়তি মাহাতকে। উনি গ্রহণ করে বলেন, 'এই দাবিসনদটি আমি অবশ্যই মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেব'।

এরপর শুরু হলো বাউল গান, একের পর এক এবং অনেকের অংশগ্রহণে অবশেষে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন যখন বিমলা দেবী, তখন ঘড়িতে বিকেল চারটে বেজে কুড়ি মিনিট। দুর্বারের মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ স্মরজিৎ জানা বলেন, 'পুরুলিয়ার ছৌ, নাজনি, নাটুয়া ইত্যাদি লোকসংস্কৃতি ও শিল্প সারা দেশের গর্ব। কিন্তু এইসব শিল্পীরা কষ্টের মধ্যে দিন কাটান। ফলে এই সংস্কৃতিকে বাঁচাতে তাঁরা যৌথভাবে কিছু করে উঠতে পারেননি। গত ২০০৪ সালে দুর্বারের পক্ষথেকে 'মানভূম লোকসংস্কৃতি ও নাচনি উন্নয়ণ সমিতি' গঠন করা হয়। দুর্বারের প্রচেষ্টায় ২০০৭ সালে নাচনিরা শিল্পীর মর্যাদা পান। এই প্রচেষ্টার ফসল হল এই গবেষণা কেন্দ্র। আসলে এটা এই এলাকার লোকশিল্পীদের আশ্রয়স্থল। পাশাপাশি দুর্বার যেমন যৌনকর্মীদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন গোটা দেশ সহ বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে দিয়েছে তেমনই বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নানা সমস্যা ও অধিকার আদায় ও অত্যাচারের প্রতিবাদ করার কাজে যুক্ত হয়ে পড়েছে। তাই নাচনি শিল্পীদের ওপর যে কোন ধরনের অত্যাচার অনাচারের বিরুদ্ধে দুর্বারের লড়াই সচল থাকবে।□

মৃত্যুদণ্ড : একটি সরকারি হত্যা

কিরীটি রায়

ঘৃণ্য অপরাধের শাস্তি কী মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত? সুপ্রিম কোর্টের ভাষায় 'বিরলের মধ্যে বিরলতম (The rarest of rare cases) অপরাধের জন্যে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত।' এক্ষেত্রে শুধু গুণগত নয়, পরিমাণগত গুরুত্বও মাপতে হবে। আমাদের দেশে ১৯৭৫ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত প্রায় ৪০ জন মানুষ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে। সর্বশেষ ১৯৯৪-এর ১৪ আগস্ট ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়কে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। স্বাধীনতার পরে কতজন মানুষকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছে তার সংখ্যা নিয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। সরকারি পরিসংখ্যানে যেখানে ৫২ জনের ফাঁসির কথা বলা হয় সেখানে পিপল্‌স ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ (পিইউসিএল)-এর তরফ থেকে ৩,০০০-৪,৩০০ জনের তথ্য তুলে ধরা হয় (Appendix, 34 of 1967, *Law Commission of India Report*)। সংবিধান রচনার সময় সংবিধান পরিষদের বিভিন্ন সদস্য (১৯৪৭-১৯৪৯-এর মধ্যে) মৃত্যুদণ্ড উঠিয়ে দেবার প্রস্তাব রাখেন, যদিও সে প্রস্তাব মানা হয় না। ব্রিটিশ শাসনের ১৮৬১-র পেনাল কোড অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ড বজায় থাকে। পরবর্তী দুই দশকে সংসদের উভয়কক্ষে ও বেসরকারি ভাবে মৃত্যুদণ্ড উঠিয়ে দেওয়ার প্রস্তাবে বিল আসে কিন্তু তা গৃহীত হয় না।

আমাদের দেশে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় হাত-পা-চোখ, গলায় শক্ত দড়ির ফাঁস লাগিয়ে। সৌদি আরবে শরিয়তি আদালত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে তরবারি দিয়ে গলা কেটে। আমেরিকায় ইলেকট্রিক চেয়ারে বসিয়ে। গুয়াতেমালা, থাইল্যান্ডে বিষাক্ত ইনজেকশান দিয়ে। সোমালিয়া, তাইওয়ান, উজবেকিস্তান, বেলারুশে মেরে ফেলা হয় গুলি করে। আফগানিস্তানে তালিবানি শাসনে এবং এখনও মেরে ফেলা হয় জীবন্ত অবস্থায় অর্ধেক শরীর মাটিতে পুঁতে, তারপর পাথর ছুড়ে। ইরানেও তাই। চিনে গুলি করে, বিষাক্ত ইনজেকশানে, সোমালিয়ায় পেটে ছুরি মেরে। এ যেন আইনকে অস্ত্র করে এক ঘৃণ্য নারকীয় হত্যাকাণ্ড। হত্যাকারী আর কেউ নয় রাষ্ট্র, তা সে গণতান্ত্রিক হোক অথবা স্বৈরাচারী; ধর্মনিরপেক্ষ বা ধর্মীয়; ধনতান্ত্রিকই হোক বা কমিউনিস্ট। শাসক যেই হোক না কেন মৃত্যুদণ্ডের বীভৎসতার পার্থক্য নেই। এভাবে কোনো অপরাধের সাজা হতে পারে?

মৃত্যুদণ্ডের সপক্ষে বড় যুক্তি হলো, এর ফলে নাকি অপরাধ হ্রাস পায়। যুক্তিটি রাষ্ট্রের। যুক্তিটি কিছু ব্যক্তিরও। আমরা ধনঞ্জয়ের মৃত্যুদণ্ডের সমর্থনে কলকাতার রাস্তায় তাদের সরব হতে দেখেছি। সত্যিই কী তা হয়? এ-ব্যাপারে রাষ্ট্রসংঘের ১৯৯০ সালের ও তার পরে ২০০২ সালের গবেষণামূলক প্রতিবেদন থেকেও কোনো সমর্থন মেলে নি।

মৃত্যুদণ্ড বজায় থাকলেও অপরাধের সংখ্যার কোনো তারতম্য ঘটে না। এক্ষেত্রে কানাডা এক বড় উদাহরণ। এ-দেশে ১৯৭৫ পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ড চালু ছিল। সেই সময় কানাডার প্রতি ১ লক্ষ মানুষ পিছু ৩.০৯ ছিল খুনের হার। ১৪ জুলাই ১৯৭৬ কানাডার হাউস অফ কমনস্ (বিল সি-৪৮৪) খোলাখুলি ভোটে মৃত্যুদণ্ড রোধ করে। পরিবর্তে শাস্তি হিসাবে বাধ্যতামূলক আজীবন কারাবাস (২৫ বছরের পর প্যারোলে মুক্তির সম্ভাবনা সহ) বজায় থাকে। ১৯৮০-তে ১ লক্ষ জন পিছু খুনের হার নেমে দাঁড়ায় ২.৪১। ১৯৮০-২০১০ পর্বে এই গড় ক্রমশ হ্রাসমান। অর্থাৎ 'মৃত্যুদণ্ড অপরাধ কমায়' এই তত্ত্ব অসার ও যুক্তিহীন এবং তা প্রমাণিতও।

২০১০ সালে পৃথিবীতে ২৩টি দেশে রাষ্ট্র মৃত্যুদণ্ডের নামে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০০৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ৫২ জন, সৌদি আরবে ৭০ জন, ইরানে ৩৯০ জন, ইরাকে ১২০ জনের বেশি মানুষকে রাষ্ট্র হত্যা করে। সবথেকে বেশি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে যে দেশ তার নাম গণপ্রজাতন্ত্রী চিন। সঠিক সংখ্যা পাওয়া মুশ্‌কিল। নানা সূত্রে তা ১০০০-এরও বেশি বলে জানা যায়। আবার, ২০০৭-এ সারা পৃথিবীতে যে ৫,৮৫১ জনের মৃত্যুদণ্ড দিয়ে মানরা তথ্য জানা যায়, তাতে শুধু চিনেই ৫,০০০-এর বেশি মানুষ আছে। দ্বিতীয় ইরান (৩৫৫), তৃতীয় সৌদি আরব (১৬৬), চতুর্থ পাকিস্তান (১৩৪) ও পঞ্চম আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (৪২)। ৩০ মার্চ ২০১০ অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল চিনা কর্তৃপক্ষকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলে কতজন মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে তা জানানো হোক। চরম শাস্তিদানের বিষয়ে গোপনীয়তা হঠাতেও বলা হয় (*The Report, Death Sentences and Execution in 2009*)।

সব থেকে সাংঘাতিক তথ্য আসে শিশুহত্যা বিষয়ে। অর্থাৎ রাষ্ট্র এমনকি মৃত্যুদণ্ড দিয়ে শিশুহত্যাও করে। শিশু মানে ১৮ বৎসরের নীচে অপ্রাপ্ত বয়স্করা। সৌদি আরবে আইন মোতাবেক অপ্রাপ্ত বয়স্কদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। সুদানের

জেলে দুজন শিশুকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে রাখা হয়েছে— রাষ্ট্রসংঘের এক রিপোর্ট থেকে এ-কথা জানা যায়, এবং যে কোনো দিন তা কার্যকর হতে পারে। ২০০৯-এর অক্টোবরে মায়ানমারে দুই অপ্রাপ্ত বয়স্ককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ১৬ বছরের মাওঙ্গ আঙ্গ ও অন্যজন (যার নাম জানা যায়নি) ছিল কিশোর সৈনিক। তাদের অপরাধ লড়াইয়ের সময় অন্য এক কিশোর সৈনিককে তারা মেরেছিল। (*The Report, Hands of Chain*) ।

রবীন্দ্রনাথের কথায় 'দণ্ডিতের সাথে দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে, সর্বশ্রেষ্ঠ যে বিচার'। সে বিচারব্যবস্থা এখনও স্বপ্ন আমাদের কাছে। সর্বত্র রাষ্ট্র এই 'চরম শাস্তি' নামক অস্ত্রকে ব্যবহার করে আসছে তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের খতম করার চেষ্টা হিসাবে। যেমন ভুট্টো, যেমন সাদ্দাম হুসেন। অজুহাত দেখিয়েছে হরেকরকমের। এ প্রসঙ্গে ইন্দিরা-হত্যা মামলার অভিযুক্ত কেহর সিং-এর নাম আসে। তার প্রাণভিক্ষার আবেদন নাকচ করেন তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি। তাঁর আদেশনামাটি এইরকম:

> 'রাষ্ট্রপতির মতে, দেশের সর্বোচ্চ আদালত যে বিষয়ে মতামত দিয়েছে, তিনি সেই মামলার দোষগুণের ভিতরে ঢুকতে চান না।'

রাষ্ট্রপতির এই অভিমতের বিরুদ্ধে কেহর সিং আপত্তি জানান। সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ অভিমত দেয়, রাষ্ট্রপতির মতামত ভুল। তাঁরা এও বলেন, সুপ্রিম কোর্টও ভুল হতে পারে। তাই সমস্ত নিবন্ধিত প্রমাণাদি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করে রাষ্ট্রপতি অভিযুক্তর অপরাধ ও শাস্তির বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত থেকে ভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যা রাষ্ট্রপতির এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে। দুঃখের কথা হলো, এই ভুলের সংশোধন হয় না। কেহর সিং-এর ফাঁসি হয়।

আমরা জানি, নিয়ম না মানাটা কাদের একচেটিয়া অধিকারের মধ্যে পড়ে। আজ পর্যন্ত কোনো মন্ত্রী আমলার মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে আমাদের দেশে, এমন তথ্য জানা নেই। যদিও এক বা একাধিক ফৌজদারি মামলায়, বিশেষত খুন, গুমখুন, ধর্ষণ, গণহত্যায় অভিযুক্ত সাংসদ, বিধায়কের সংখ্যা প্রচুর। দেশের প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে পঞ্চায়েত অফিস সর্বত্র প্রসারিত দুর্নীতি। সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা, শিল্পপতি, ধর্মীয় নেতা সকলেই এক অলিখিত শাস্তি না-পাওয়ার সুবিধা ভোগ করে। অথচ শাস্তি পায় তারাই যারা সব থেকে পিছিয়ে পড়া। ঠিক সময়ে ঠিকমতো উকিল ধরতে না পারা, ব্যয়ভার বহন করতে না পারা বিলম্বিত বিচার, বিচার ব্যবস্থার পক্ষপাতিত্ব, উচ্চতর আদালতে আপিল করার অক্ষমতা এবং সর্বোপরি তার সামাজিক-গোষ্ঠীগত, আর্থিক বাস্তবতা তাকে চরম শাস্তির শিকার করে তোলে। শ্বাপদের আস্ফালনে রাষ্ট্র তার চ্যালেঞ্জহীন আধিপত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে চলে। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, এপিজে আবদুল কালাম এক মারাত্মক প্রশ্ন রেখেছিলেন: 'কেন চরম শাস্তি শুধু সমাজের দুর্বলতর শ্রেণিই ভোগ করে?' প্রশ্নটা স্বাভাবিক।

পৃথিবীতে বেশির ভাগ অপরাধ হয়, প্রবল উত্তেজনার মুহূর্তে (frenzy moment)। যদি হত্যাকারীর হাতে আবার অস্ত্র তুলে দেওয়া হয় তবে সে যে আবার কাউকে হত্যা করবে, তা নাও হতে পারে। যারা স্বভাবগত ভাবে হত্যাকারী তাদের মানসিক চিকিৎসার প্রয়োজন, যেমন প্রয়োজন একজন স্বভাব চোর, মর্ষকামী, অন্যান্য মানসিক রোগীর ক্ষেত্রেও। আবার যে পেশাদার খুনি, তার এই পেশার পিছনের নিয়োগকর্তার ভূমিকাটি আন্দাজ করে নিতে অসুবিধা হয় না। পেশাদার খুনি আর সরকারি ফাঁসুড়েদের মধ্যে তাই তফাৎ কোথায়?

সাধারণ মানুষ প্রকৃতিগত ভাবেই নিয়ম মেনে চলে। প্রত্যন্ত এলাকা যেখানে সরকারি সুবিধার ছিটেফোঁটা নেই, না বিদ্যুৎ, না জল, না বিপিএল কার্ড, একশোদিনের কাজ প্রকল্প— সেখানেও সরকার আছে। 'না এসব করা যাবে না, করলেই শাস্তি'—অর্থাৎ শাস্তির ভয়, শাস্তির পিছনে সরকার আছে। অথচ সরকার নিজে নিয়ম মেনে চলে না। এবং ফাঁসি সহ নানাবিধ শাস্তি যেমন লকআপে পিটিয়ে খুন, জেলে, হাসপাতালে অবহেলায় মৃত্যু ঘটিয়ে চলে। আর সংবিধানের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে অনাহারে অবহেলায় প্রতিদিনের মৃত্যুমিছিল কে ঘটিয়ে যাচ্ছে?

এতসব প্রশ্নকে এড়িয়ে গিয়েও মৃত্যুদন্ড বজায় রাখা হয়েছে। নিজেকে সভ্য দেশ হিসাবে দাবি করতে গেলে যা বজায় রাখা উচিত নয়। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ পেতে অনেক কাঠখড় পেড়াচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। মানবাধিকার রক্ষার ইনডেক্সে মৃত্যুদণ্ডের স্থান কোথায়? কেননা ১৫ ডিসেম্বর ১৯৮৯ রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ একটি ঐচ্ছিক খসড়া চুক্তি (Optional Protocol) ঘোষণা করে। তাতে বলা হয় প্রোটোকলে স্বাক্ষরকারী সব সদস্য রাষ্ট্র তাদের দেশীয় পরিসরে মৃত্যুদণ্ড চিরতরে লোপ করার জন্যে সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যস্থাদি গ্রহণ করবে। (Resolution 44/128)। দুঃখজনক হলেও এটি সত্য যে রাষ্ট্র হিসাবে ভারত তাতে স্বাক্ষর করেনি।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের ভয়শূন্যচিত্ত ও উচ্চশিরের দেশে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। সে আশার অবকাশ এখনও সুদূর। চরম শাস্তির ভয় দেখিয়ে সর্বব্যাপী রাষ্ট্র নিজের ক্ষমতা জাহির করছে এখনও। এখনও তাই সরকার মানে পুলিশ, বিএসএফ, সেনাবাহিনী, পনেরোই আগস্ট লালকেল্লায় প্রধানমন্ত্রী। হুটার লাগানো গাড়ির কনভয়, শাস্তি-জেল-আদালত। তাই নির্দয় আঘাত করার সময় এসেছে সমগ্র পদ্ধতির বিরুদ্ধে। সময় এসেছে প্রশ্ন তোলার, চরম শাস্তি, মৃত্যুদণ্ডের নামে সরকারের হাতে একটা হত্যা করার আইনত হাতিয়ার থাকবে কিনা! □

অক্টোবর ২০১১-য় প্রকাশিত হবে

শুভেন্দু দাশগুপ্ত ও স্মরজিৎ জানা সম্পাদিত

দুর্বার ভাবনা সংকলন

অ ধি কা র ভা ব না

এই সংকলনে লিখেছেন : **সন্তোষ রাণা, অশোকেন্দু সেনগুপ্ত, শাশ্বতী ঘোষ, সুজিতকুমার দাশ, রবীন মজুমদার, স্মরজিৎ জানা ও শুভেন্দু দাশগুপ্ত।**

দুর্বার প্রকাশনী

৪৪ বলরাম দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৬। ফোন : ২৫৪৩ ৭৪৫১/৭৫৬০

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংস্কার এবং প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

ব্রতীন চট্টোপাধ্যায়

প্রেসিডেন্সি কলেজ/ইউনিভার্সিটি উন্নয়নের জন্য মেন্টর গ্রুপের প্রথম দফার পরামর্শ জমা পড়েছে। মেন্টর গ্রুপ নিয়োগ করে কোনো সক্রিয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নবায়ন এই দেশে এর আগে কখনও হয়েছে বলে শোনা না গেলেও, শিক্ষার জগতে এমন যে আর কোথাও হয়নি বা হচ্ছে না এমন বোধহয় নয়। বিশ্বায়নের প্রয়োজনে শুধু পশ্চিমে পুরনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নবায়নের উদ্যোগ যেমন নেওয়া হয়েছে তেমনই এইদেশেও অনেক বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই রকম উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একটা প্রক্রিয়া হচ্ছে, প্রতিষ্ঠানের কোনো একটি অংশের উন্নয়ন আর অন্যটা হলো পুরো প্রতিষ্ঠানের সম্যক নবায়ন। দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি স্বভাবতই বেশি জটিল এবং এই বিশেষ ক্ষেত্রে জটিলতাটা আরও বেড়েছে তার কারণ প্রেসিডেন্সি কলেজের ইউনিভার্সিটি হিসাবে উন্নীত হওয়া একটা স্তর আর তার ওপর সেই ইউনিভার্সিটির নবায়ন আর একটি স্তর। এমন একটা প্রক্রিয়া এই বিষয়ে অনুধাবনে আগ্রহী গবেষক/পাঠকদের কাছে চিত্তাকর্ষক হতে বাধ্য।

এমনিতে দেখলে এ আর এমন কি মনে হলেও, এই রকম প্রাতিষ্ঠানিক নবায়নের উদ্যোগের কারিগরি তথা তাত্ত্বিক বিষয়ের অধ্যয়ন বেশ কিছুদিন কারিকুলাম স্টাডিজ-এর মনোযোগের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ঘরবাড়ি, বা শিক্ষকদের বেতনক্রম সংস্কার একটা প্রয়োজনীয় বিষয় হলেও, সবটা মিলিয়ে একটা গোটা প্রতিষ্ঠানের সংস্কারের কথা উঠলে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদর্শগত প্রসঙ্গগুলি এবং তার নির্বাহ, তা কার্যকর করবার ব্যবস্থা ইত্যাদি অনেক বিষয়ও এসে পড়েই। এই সবই, মনোযোগের ক্ষেত্র। এই মনোযোগের গোড়ায় রয়েছে, যে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেই অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মতোই একটা বিশেষ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচনা করার সমাজ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ। অনেক সমাজবিদই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে চরিত্রগত ভাবে আলাদা সমাজ হিসাবেই বিচার করতে চাইছেন শুধু নয়। সাধারণত সামাজিক পরিবর্তনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে, এমন একটা ধারণা প্রচলিত থাকলেও অনেকেই মনে করেন, প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে শিক্ষালয়ই সেই পরিবর্তনে যোগ দেয় একেবারে শেষে। আসলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিন কেমন হবে, বা লাইব্রেরি কেমন হবে সেই বিষয়গুলি এই সংস্কারের প্রসঙ্গে আসতেই পারে কিন্তু সেই সব বিষয় প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় আদর্শের বদল ঘটায় না, বরং তাকে সুস্থিত করে মাত্র। যে বিষয়টা কেন্দ্রীয় তা হলো, এই সংস্কারের পর এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কি ভাবে আলাদা হবে?

প্রেসিডেন্সির প্রসঙ্গে অবশ্য সেই উদ্দেশ্যর কথাটা আগেই বলে দেওয়া হয়েছে— এই নতুন বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বমান স্পর্শ করবে। এই যুক্তিতেই বলা যেতে পারে, নবায়নের মাধ্যমে এই বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বায়িত সমাজের জন্য প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে। এমন এক সংকল্প রূপায়ণে, বিশ্বমানের শিক্ষার সঙ্গে পরিচিতি আছে তথা সহজাত এমন গুণী শিক্ষকদের আহ্বান করা হয়েছে। বিশ্ব বলতে যদি পশ্চিম বুঝি তাহলে সেখানকার মানের সঙ্গে এঁরা যারপরনাই অবহিত এবং অভিজ্ঞ।

প্রথম দফার যে পরামর্শ জমা পড়েছে, এবার তার রূপায়ণের পালা। এই পর্বটাই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। বেশ কিছুকাল আগে, কেম্ব্রিজ ইন্সটিটিউটের জন এলিয়ট শিক্ষা-পরিচালনার জগতে, একটা আপ্তবাক্য চালু করেছিলেন— যতো ভালো পরামর্শই হোক না কেন, প্রতিষ্ঠানের নিজগুণে তা শেষপর্যন্ত তালগোল পাকিয়ে যেতেই পারে, পাকিয়ে যায়। পরামর্শ এবং তার রূপায়ণের মধ্যে যে বোঝাপড়ার যে অবকাশ তা থেকে যে সব সংকটের শুরু হয় তার বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা থেকেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংস্কার বিষয়ক অধ্যয়ন, গবেষণার সূত্রপাত। সাধারণত কোনো বিশেষজ্ঞ বা আমলার নেতৃত্বে একটা গোটা প্রতিষ্ঠানের আমূল সংস্কারের যে সমস্ত উদ্যোগ নেওয়া হয়, চরিত্রগত ভাবে তার মোটামুটি তিনটি রকমফের ইতিমধ্যে লক্ষ্য করা গেছে, যাকে তিনটি আলাদা মডেল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

গত শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই প্রথম মডেলকে চিহ্নিত করা গেছে— একটা সাধারণ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, তার রূপায়ণে সরলরৈখিক বিন্যাসে কি কি করতে হবে তার একটা তালিকা প্রস্তুতি এবং যাঁরা সেটা করবেন তাঁদের কাছে সেটা দাখিল করা। এখানে, ঐ সাধারণ উদ্দেশ্যটাকে সঠিক বুঝতে না পারা, উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকলে ক্রমশ তার আত্মপ্রকাশ ইত্যাদির সংকট যেমন থাকে, তেমনই দীর্ঘ অভ্যাসজাত আচার থেকে তাকে প্রথমে তাত্ত্বিক স্তরে ও পরে কাজের ক্ষেত্রে প্রতিরোধ করার একটা প্রসঙ্গ থেকে যায়। আসলে, ঐ সরলরৈখিক বিন্যাসের মধ্যে যে যান্ত্রিক যুক্তি কাজ করে, তাই বাধা হয়ে দাঁড়ায় সম্ভবত।

যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই মেধা, সেখানে কর্মরত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত মানবিক সম্পদের সামূহিক প্রকাশ। ব্যক্তিগত এবং সেই কারণেই এই সামূহিক প্রকাশ বহুবাদী, আর এইখান থেকে একমুখী সংস্কারের প্রস্তাবের বিরোধের সম্ভাবনা গড়ে ওঠে। এই বিরোধাভাস ব্যক্তিগত স্তরে শুরু হলেও, তা ক্রমশ সামূহিক স্তরে সম্মতি সংগ্রহ করতে শুরু করে। আসলে, এই মডেলের সমস্যাই হচ্ছে, পরামর্শদাতা এবং পরামর্শগ্রহীতার মধ্যে বাস্তবিক ব্যবধান বা আপাত ভাবে ব্যবধান রচনার প্রয়াস। এই প্রয়াসের মধ্যেই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে

একধরণের স্বাধীনতার সংজ্ঞা চর্চিত হয়। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের স্ব-নিয়ন্ত্রণের অধিকারই, বিরোধের মুখ হয়ে ওঠে— এমন লক্ষ্য করা গেছে।

দ্বিতীয় মডেল, ঐ স্বাধীনতাকেই প্রাথমিকতা দিয়ে প্রতিষ্ঠানের সংগঠনে যাঁরা যুক্ত তাঁদের মতামতকেই অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রস্তাব। সত্তরের দশকে মূলত আমেরিকার অনেক প্রতিষ্ঠানের সংস্কারে এই স্বাধীনতার অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতেই নবায়নের পরিকল্পনা তৈরি করা। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই দেখা গেছে— স্বাধীন ভাবে সিদ্ধান্ত নেবার সুযোগ পেলে অধিকাংশ শিক্ষাকর্মী পুরনো অবস্থাতেই থাকতে পছন্দ করেন। এর প্রধান কারণ, পরিবর্তিত অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা বা অভিজ্ঞতার অভাব বা তার সম্বন্ধে অসম্মতি, যা থেকে ঠিক বিরোধিতা নয়, বরং একধরণের নিরাপত্তাহীনতা তৈরি হয়। নদী পেরোনোর আগে যেমন অন্য পাড় সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা থাকে, তা নদী পেরোব না এমন কোনো সংকল্প নয় তবে একটা অস্বাচ্ছন্দ্য থাকে যা থেকে অনিশ্চয়তাবোধের জন্ম হয়। মজার ব্যাপার এই যে, একবার নদী না পেরোলে কিন্তু আগের পাড়টা সম্বন্ধে তুলনামূলক কোনো মন্তব্য করা যায় না। সংস্কারের পর ঠিক কি পরিস্থিতি হবে তা নিয়ে অনিশ্চয়তা থেকে যে নিরাপত্তাহীনতা তৈরি হয় এই সামূহিক নিরাপত্তাহীনতাই শেষপর্যন্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বাধিকারের তথা আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গ তুলে সংস্কারের বিপক্ষ মতের বৈধতা দাবি করে।

তৃতীয় মডেল আসলে ফলিত সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকেই এসেছে এবং প্রকরণগত ভাবে যাকে Action Research বলা হয় তাই; এই ইংরেজি শব্দের একটা বাংলা প্রতিশব্দ তৈরি করেছেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ আনিসুর রহমান এখানে সেটাই ব্যবহার করা যাক—গণ-গবেষণা। আগের দুটো মডেলকে একসঙ্গে দেখলে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাকর্মীদের মতামত প্রকাশের অবকাশ রচনা করা এবং একই সঙ্গে নদীর অন্য পাড় সম্বন্ধে অবহিত করা এবং কৌশলগত ভাবে সেতুর ওপর দিয়ে হাঁটতে সাহায্য করা—এই হলো এই মডেলের কৃত-কৌশল। বলাবাহুল্য, এই প্রক্রিয়া দীর্ঘসূত্রী অবশ্যই কিন্তু দীর্ঘসূত্রিতার এই প্রক্রিয়াই এই মডেলের ফলিত কৌশল। যে বিশেষ সংস্থা বা ব্যক্তি সংস্কারের প্রস্তাব আনছেন তিনি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিবিড় ভাবে যুক্ত হয়ে তার সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে প্রথমেই প্রতিষ্ঠানের সংস্কৃত হওয়ার ক্ষমতা এবং সম্ভাবনা বিচার করে সংস্কারের যে প্রধান লক্ষ্য স্থির করবেন, সেই লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য অনেক ছোট ছোট সেতু নির্মাণ করবেন। এই যে মানচিত্র তৈরি হলো, তা তিনি বা তাঁরা কেবল প্রতিষ্ঠানের শীর্ষকর্তৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করবেন অথবা যে বা যাঁরা তাঁকে এই কাজে নিযুক্ত করেছেন তাঁদের বা তাঁর সঙ্গে আলোচনা করবেন। সেখান থেকে সম্মতি পেলে এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের পরে সংস্কারের লক্ষ্যে 'গণ-গবেষণা'র কাজ শুরু করা যাবে। এই পর্যায়, প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশ এবং বিনিময়ের সময়। এই মত বিনিময়ের মধ্যেই যাকে informed debate বলে তার জন্য প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মধ্যে সক্ষমতা গঠন করবেন; যিনি বিশেষজ্ঞ তিনি মাঝামাঝি একটা অবস্থান নিয়ে নদীর অন্য পাড়ের সম্বন্ধে পরিচিতির পরিস্থিতি তৈরি করবেন— সেতু রচনা করবেন। এরই মধ্যে অবশ্যই, সংস্কারের সম্ভাবনা বা ক্ষমতা ধরা পড়বে আর তারই নিস্পৃহ বিচার থেকে ধরা পড়বে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছনো যাবে কি না? অভীষ্ট লক্ষ্যের পরিবর্তন প্রয়োজন কি না? এই হলো দ্বিতীয় পর্যায় যখন আবার প্রতিষ্ঠানের শীর্ষকর্তৃত্বের সঙ্গে পরামর্শের সময়। আলোচনা সাপেক্ষে, অভীষ্ট লক্ষ্যের পরিবর্তনের এই বৈশিষ্ট্যই এই মডেলকে 'গণ-গবেষণা'র চরিত্র দিয়েছে।

প্রশ্ন হলো, এই ভাবে অভীষ্ট লক্ষ্যের পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে কি কোথাও পৌঁছনো যাবে, গেলে কবে? এই প্রসঙ্গে, রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হতেই হচ্ছে, এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কি ভাবে পরিচালিত হবে এই প্রশ্নে তিনি একটি বাক্যবন্ধ ব্যবহার করেছেন— Perpetual creation , এর একটা দুর্বল বাংলা অনুবাদ হতে পারে 'ক্রমান্বয় সৃজন'। 'অচলায়তন'-এর লেখকের এই পর্যবেক্ষণকে এই তৃতীয় মডেলের সঙ্গে দেখলে যেটা দাঁড়াচ্ছে তা হলো সংস্কারকে 'ক্রমান্বয় সৃজন' হিসেবে দেখার দৃষ্টিকোণ। এই দৃষ্টিকোণের মধ্যে কিন্তু ধরা আছে প্রতিষ্ঠানের 'ক্রমান্বয় সৃজন'-এর সক্ষমতা এবং তার বিকাশ। অন্তিম বিচারে, সংস্কারের সূচনা যিনি বা যাঁরা করেছেন তাঁর বা তাঁদের অনুপস্থিতিতেই ক্রমান্বয় সংস্কারের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে থাকলেই এই প্রক্রিয়াকে সার্থক বলা যাবে। অর্থাৎ, মোদ্দা কথাটা হলো সংস্কারের তথা একের পর এক সেতু পেরোনোর দায় শেষপর্যন্ত ঐ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদেরই উপরই রইল।

বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতার প্রয়াণের পর বিশ্বভারতীর সুহৃদ গান্ধীজী শান্তিনিকেতনে এলে বিশ্বভারতীর এক যুবক কর্মী প্রশ্ন করেন, রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে কি ভাবে এই প্রতিষ্ঠান পরিচালত হবে? বিশ্বভারতীর সুহৃদ উত্তর দিয়েছিলেন— আপনাদের সমবেত সদিচ্ছা এবং প্রজ্ঞাই রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে এই প্রতিষ্ঠানকে পরিচালিত করবে। পরবর্তীকালের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য অগুন্তি সরকারি ও বেসরকারি বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি/সমিতি যে সব পরামর্শ দিয়েছেন সেই বিষয়ে আলোচনার অবকাশ এটা নয়। প্রেসিডেন্সি কলেজ/ইউনিভার্সিটি-র সংস্কারের উদ্দেশ্যে মেন্টর কমিটি প্রথম দফার যে পরামর্শ দিয়েছেন, তার সম্বন্ধে মত প্রকাশ করার অবকাশও এটা নয়। সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে এই উদ্যোগের কোনো সম্যক বিচার সম্ভব নয়, উপযুক্তও হবে না। কিন্তু, মোটামুটি ভাবে যেটা মনে হয় সেটা হলো, মেন্টর কমিটি শুধু প্রতিষ্ঠানের কাঠামোগত সংস্কারের প্রসঙ্গ যে লক্ষ্য করেছেন তা নয়, প্রতিষ্ঠানের সম্যক উদ্দেশ্যের প্রসঙ্গটিও লক্ষ্য করেছেন। এই অংশটিই আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে, বিশেষ করে স্বাধীনতা-উত্তর এই দেশের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নবায়নের সম্ভাবনার বিষয়টি বুঝবার জন্য।

প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের প্রসঙ্গে মেন্টর কমিটি কোনো কেতাবি মডেল ব্যবহার করেছেন কি না বা কোনো স্বতন্ত্র যুক্তিবদ্ধ প্রক্রিয়া ব্যবহার করেছেন কি না, সেটা জানা না গেলেও, জানা যাচ্ছে যে, এই নথি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে অর্পিত হয়েছে। বলাবাহুল্য, তাঁরা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিলেও এই পরামর্শের রূপায়ণের দায় শেষপর্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীদের ওপরই রইল বলে মনে হচ্ছে। এদেশে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের কোনো কেতাবি ইতিহাস নেই, অবশ্যই এই সংস্কারের প্রক্রিয়া সেই ইতিহাসের সূচনা করল। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংস্কারের বিষয়ে উৎসাহী পাঠক, গবেষক নিশ্চয়ই এই প্রক্রিয়ার গতি প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রাখতে চাইবেন। প্রবন্ধের শেষে, সেই সংখ্যালঘু পাঠক/ গবেষকদের পক্ষ থেকে এই প্রতিবেদনের একটা প্রতিলিপি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার অনুরোধ রইল। □

ভারতের সবচেয়ে বেশি বিদ্যালয়-ছুট পশ্চিমবঙ্গে

গৌতম ঘোষ

প্রাথমিক শিক্ষা হলো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা-ব্যবস্থার বনিয়াদ বা মূল ভিত্তি। এই বুনিয়াদী শিক্ষায় যোগ্যতা অর্জন না করলে আজকের সমাজ ব্যবস্থায় উচ্চ বা উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করা যায় না। এ কারণেই প্রাথমিক শিক্ষার সাফল্যের মধ্যে দিয়ে দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার অবগতির প্রকৃত রূপটি প্রতিবিম্বিত হয়। জাতিগঠনের মূল উপাদান প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে বাংলার শিক্ষিত সমাজ মোটেই সচেতন নন তা এই শিক্ষার দুরবস্থার কথা পর্যালোচনা করলে সহজেই বোঝা যায়। পশ্চিমবঙ্গ এমনই একটি রাজ্য যেখানে প্রায় এক লক্ষ বালক-বালিকা প্রতি বছর শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের একটি প্রশাসনিক প্রতিবেদন (*Administrative Report 2001*) থেকে জানা যায় যে, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০০-এ এই রাজ্যে স্বীকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৫২,৩৮৫ টি। ঐ তারিখে নথিভুক্ত প্রাথমিক অর্থাৎ ১ম-৫ম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ১,০০,১৫,৯৫৫ (এক কোটি পনেরো লক্ষ নশো পঞ্চান্ন)। এদের মধ্যে বালক ৫২,৫৬,০৮৭ এবং বালিকার সংখ্যা ছিল ৪৭,৫৯,৮৬৮। এই প্রতিবেদনটিতে ঐ বছরের প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া ছাত্রসংখ্যা কত ছিল তা স্বতন্ত্র ভাবে উল্লিখিত না থাকায় আলোচনার সুবিধার্থে ন্যূনতম একটি আনুমানিক সংখ্যা অর্থাৎ মোট ছাত্রসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ যদি ধরা হয় তাহলে প্রথম শ্রেণির ছাত্রসংখ্যা হয় ২০,০৩,১৯১ জন হিসেবে ধরে নিচ্ছি। এই আনুমানিক সংখ্যাটি নিঃসন্দেহে কম। কেননা, প্রথম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয় বর্জন করলেও সরকারি তথ্যে সেটি উল্লিখিত হয় না। শিক্ষাবর্ষের শুরুতে ভর্তি হওয়া ছাত্র সংখ্যাকে প্রচলিত ভাবে প্রথম শ্রেণির ছাত্রসংখ্যা হিসাবে গণ্য করা হয়। প্রথম বছরের বিদ্যালয়-ছুট (School dropout)—এর সংখ্যা ধরা পড়ে পরের বছরের শুরুতে দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি হওয়ার সময়ে।

উপরে উল্লিখিত সংখ্যাগুলি শুধুমাত্র সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলির ছাত্রসংখ্যার পরিমাণ ধরা হয়েছে। এই বিদ্যালয়গুলি ব্যতীত এই রাজ্যে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর যথা তফশিলি উপজাতি, জনশিক্ষা প্রসার বিভাগের সমাজ কল্যাণ শাখার বিদ্যালয়, পুরসভা, কেন্দ্রীয় সরকার, সেনাবাহিনী পরিচালিত বিদ্যালয় সহ মাদ্রাসা শিক্ষা, বোর্ড নিয়ন্ত্রিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ছাত্রসংখ্যা এর মধ্যে ধরা হয়নি। তবে এগুলির সম্মিলিত ছাত্রসংখ্যার পরিমাণ এতই নগণ্য যে পরিসংখ্যানে সবিশেষ তারতম্য ঘটাবে না।

নথিভুক্ত এই ২০ লক্ষ প্রাতিষ্ঠানিক ছাত্রছাত্রীর প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির কাল ছিল মে, ২০০০। সময়ের হিসাবে ফেব্রুয়ারি ২০০৯-এ ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা। যদি ধরে নেওয়া যায় মোট পরীক্ষার্থীর ২০ শতাংশ মাধ্যমিকের নির্বাচনী (Test) পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে তাহলেও পরীক্ষার্থীর মোট সংখ্যা হওয়া উচিত ১৬ লক্ষ। কিন্তু তথ্যানুযায়ী জানা যায় যে, ২০০৯-এর মাধ্যমিক পরীক্ষায় নিবন্ধীকৃত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৯,৪৯,৭২৩ এবং পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয় ৯,৪০,৪৮২ জন (নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও অন্তত এক বছরের জন্য ৯,২৪১ জন ছাত্রছাত্রী ছুট হয়ে গেল)। এখন প্রশ্ন হলো অবশিষ্ট (১৬,০০,০০০-৯,৪৯,৭২৩= ১০,৫০২৭৭ জন অর্থাৎ ধরা যাক সাড়ে দশ লক্ষ ছাত্রছাত্রী কোথায় গেল এই দশ বছরে?

এরাই হলো বিদ্যালয়-ছুট্। প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত দীর্ঘ দশ বছরের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে একটি দলের (Batch)১০ লক্ষেরও বেশি ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। এই আনুমানিক পরিসংখ্যান যে কতখানি যথার্থ তা প্রমাণিত হয় ২০১১-এর আদমশুমারি (প্রাথমিক তথ্য অনুসারে) থেকে। সমগ্র দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে 'বিদ্যালয় ছুট'-এর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এখানে ৬-১৪ বছর বয়সী বিদ্যালয়-ছুট-এর সংখ্যা ৯.৬১ লক্ষ। যে বিহারকে একটি অনগ্রসর রাজ্য বলে মনে করা হয় সেখানে বিগত এক দশকে বিদ্যালয় ছুট-এর সংখ্যা ৬.৯৬ লক্ষ। পশ্চিমবঙ্গের থেকে অনেক কম। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে, সাম্প্রতিক জনগণনায় বিহারে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে (Literacy Rate) ১৬.৮ শতাংশ। পক্ষান্তরে, পশ্চিমবঙ্গের এই বৃদ্ধি ৮.৫ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গের বৃদ্ধি প্রতি জনগণনায় জাতীয় বৃদ্ধির থেকে কম হয়। ২০০১-এর আদমশুমারি অনুযায়ী জাতীয় বৃদ্ধি ছিল ১২.৬ শতাংশ এবং পশ্চিমবঙ্গের ১০.৯৪ শতাংশ।

প্রাথমিক শিক্ষার ব্যর্থতার কারণে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার মান ক্রমশ নিম্নমুখী। জাতীয় স্তরের স্বাক্ষরতা হারের ক্রমাঙ্ক অনুসারে ৩৫টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে ১৯৯১ সালে এই

রাজ্যে স্থান ছিল ১৮। ২০০১-এ হলো ১৯ এবং ২০১১-য় সেই মান নেমে গিয়ে ২০-তে দাঁড়িয়েছে। সর্বাপেক্ষা জনবহুল যে সব রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, মানের ক্রমাঙ্ক অনুযায়ী ২০০১-এ পশ্চিমবঙ্গের উপরে ছিল তাদের মধ্যে একমাত্র পাঞ্জাব ছাড়া অন্যসব রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের উপরেই অবস্থান করছে। আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য ত্রিপুরা ১৩তম স্থান থেকে উন্নীত হয়ে ৪র্থ স্থানে পৌঁছে গেছে।

ত্রুটিপূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আজ এই রাজ্যে নিরক্ষর এবং বিদ্যালয় ছুট-এর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিয়ত চর্চার অভাবে বিদ্যালয় ছুট বালক-বালিকারা একদা নিরক্ষর হয়ে পড়ে। সচেতনতা, নিজেদের জীবন-জীবিকা এবং সমাজের প্রয়োজনে তারা অর্জিত শিক্ষাকে ব্যবহার করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। অর্থাভাবে, স্বল্প-শিক্ষক সম্বলিত বিদ্যালয়, শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক বা উচ্চশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব, বিদ্যালয়-গৃহ, শিক্ষাপোকরণ এবং ত্রুটিপূর্ণ পাঠ্যবিষয়ের জন্য আজ রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা বর্ণহীন রূপ ধারণ করেছে। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশিত প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষা কার্যক্রম বারবার রাজ্য গ্রহণ করা সত্ত্বেও অবস্থার কোনো তারতম্য ঘটেনি।

সত্তর দশকে পঞ্চম পরিকল্পনা কালে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বিকল্প হিসাবে প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষা (Non-formal education) কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ১৫-৩৫ বছর বয়সীদের শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথম ৬-১৪ বয়সী বিদ্যালয়-ছুটদের জন্য কেন্দ্রভিত্তিক শিক্ষা-কর্মসূচি গ্রহণ করা হলো। একই সঙ্গে ভাবা হলো বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন শিশুদের কথা। এদেশে কর্মসূচি গ্রহণ এবং সেটির সার্থক রূপায়ণের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য থাকে। এক শ্রেণির সরকারি আমলা এবং কেন্দ্রগুলির পরিচালক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির অধিকাংশই কর্তৃপক্ষের অনীহা, মিথ্যাচার, কারচুপি এবং অবাধ লুণ্ঠনের কারণে কর্মসূচি বন্ধ হয়ে যায়। বস্তুত, সরকার বাধ্য হয় বন্ধ করে দিতে। এর ফলে হাজার হাজার বিদ্যালয়-ছুট বালক-বালিকার শিক্ষাগ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে ওঠে। স্তব্ধ হয় শিক্ষার অগ্রগতি এবং সমাজের সার্বিক উন্নয়ন।

এরপর নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে ১৯৯০ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে জাতীয় সাক্ষরতা মিশন নির্দেশিত সার্বিক সাক্ষরতা অভিযান (TLC) সাক্ষরোত্তর প্রকল্প (PLC) প্রবহমান শিক্ষা কর্মসূচি (CEP) গ্রহণ করা হলো। এই কর্মসূচির লক্ষ্য দলের (Target Group) অন্যতম হলো বিদ্যালয়-ছুট বালক-বালিকারা। আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার সমমানের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা এই প্রথম করা হলো। কিন্তু এই রাজ্যে এই প্রকল্প বিশেষ করে প্রবহমান কর্মসূচি চূড়ান্ত ভাবে নিস্ফল হয়। রাজ্যব্যাপী সকল স্তরের মানুষকে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে, হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগ করে, কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে রাজ্যের সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির পরিমাণ হলো ১৯৫১-৬১ দশকের তুলনায় ১.০৫ শতাংশ কম। (১৯৫১-তে শতকরা হার ছিল ২৪.৯৫ শতাংশ, ১৯৬১-তে ৩৪.৪৬ শতাংশ এবং ২০০১-এ হার ৬৮-৬৪ শতাংশ ও ২০১১-র হার ৭৭.১ শতাংশ)।

এই ব্যর্থতার কারণ বহুবিধ---কর্মসূচি পরিচালনায় দলসর্বস্ব রাজনীতি, অবাধ লুণ্ঠন এবং প্রশাসনের ক্লান্তি ও ক্রমিক অনাগ্রহ। এসব কারণে প্রবহমান শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে উপস্থিতির হার কমতে কমতে একদিন শূন্যের কোঠায় পৌঁছে গেল। গোয়াল ঘরে, পরিত্যক্ত কারখানায়, খোলা আকাশের নীচে শিক্ষার পরিবেশহীন, স্বাচ্ছন্দ্যহীন পাঠকেন্দ্রে পড়ুয়ারা আসে না। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষাকেন্দ্রগুলিও ছিল প্রায় একইরকম। পড়ুয়ার অভাবে দিনের পর দিন কেন্দ্রগুলি খোলা হয় না। প্রশাসন থেকে যখন পরিদর্শনের কথা হয় তখন কেন্দ্রগুলি সাজিয়ে-গুছিয়ে কর্তা ব্যক্তিদের দেখিয়ে সন্তুষ্ট করা হয়। এ সবের ফলে পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষা পশ্চাদমুখী হতে লাগল। ২০০৯-এ এই রাজ্যে ৫-৮ বছর বয়সী ৮০,৬৫৪ জন ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে।

২০০৭-০৮-এ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ছিল ৬৮,৩৭,৪০৫ জন। ২০০৯-এ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ছাত্রসংখ্যা আরও কমে দাঁড়ায় ৬১,৯০,১৫৬-তে। এই বিশাল সংখ্যক বালক-বালিকাকে ভর্তি করা গেলেও শেষ পর্যন্ত এদের অনেককেই ধরে রাখা সম্ভব হয় না। বিদ্যালয়-ছুট চলতেই থাকে। ২০০৭-০৮-এ বিদ্যালয় বহির্ভূত বালক-বালিকা ছিল ৫,৪৫,৬৭৭ জন। এদের অধিকাংশ শিশু শ্রমিক হিসাবে পরিণত হয়। ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা এবং মোটর গ্যারেজ, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, মিষ্টি বা খাবারের দোকানে কাজ করে সামান্য হলেও পরিবারের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আনছে। শিশু শ্রমিক আইন (নিষিদ্ধকরণ এবং নিয়ন্ত্রণ) ১৯৮৬-কে উপেক্ষা করে এদের দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। ক্ষেত্রবিশেষে দিনে ১৮ ঘণ্টাও কাজ করতে হয় এদের।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে ১৯৭৮ এবং ১৯৮৬-তে পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪২,৬৫৯ এবং ৪৮,৪৫৬। এই সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে পেতে ২০০০ সালে বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়াল ৫২,৩৮৫টি। বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির মূল উদ্দেশ্য শিক্ষার প্রসার ছিল না। বরং উদ্দেশ্য ছিল কিছু যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া, বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। পরিকল্পনা খাতে অর্থ বরাদ্দ বাড়িয়েও পরিদর্শন, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ব্যয় ব্যতীত ১৯৯৯-২০০০-এ প্রাথমিক শিক্ষা বাবদ প্রকৃত ব্যয় ছিল ১১৮৪,২৯, ৮১,১৮০ টাকা এবং ২০০৮তে সেই বাবদ ব্যয় ১৮৯১,৩৬,৪৬,২২৩ টাকা এবং ২০১০-১১ এই বাবদ বাজেট বরাদ্দ ২৮৬৯,০৫,৫৮,০০০ টাকা। তবুও শেষরক্ষা করা গেল না। বিদ্যালয়-ছুট, নতুন ছাত্রের অভাবে এবং প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষাকেন্দ্রগুলির জন্যে বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমতে লাগল। ২০০৭-০৮, ২০০৮-০৯-এ সংখ্যা দাঁড়াল যথাক্রমে ৪৯,৯৬২ এবং ৪৯,৮৯৩। ২০০৯-১০ অবশ্য অল্প কিছু বিদ্যালয় বেড়ে হয়েছে ৫০,৪৪৭ টি।

সাম্প্রতিক নির্বাচনের পরেও পরিবর্তনের যুগেও দেখা যায়, গ্রামাঞ্চলে বহু বিদ্যালয় আছে যেখানে শিক্ষকের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা পূর্ণসময়ের জন্য বিদ্যালয়ে থাকে না। আবার এমন বিদ্যালয় আছে যেখানে প্রতি দুজন ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষক। এসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা নিয়মিত আসে না। সম্প্রতি এরকম একটা ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে বীরভূম জেলার সিউড়িতে। জেলা শাসকের নির্দেশে সহকারী জেলা শাসক সেই গ্রামে তদন্তে গেলে জানতে পারেন একটি বিদ্যালয়ে মাত্র ৮ জন ছাত্র এবং তারা নিয়মিত আসে না। পঁয়ত্রিশ বছরের প্রাচীন এই বিদ্যালয়টিতে কখনই ৪০ জনের বেশি ছাত্র ভর্তি হয়নি।

সহকারী জেলাশাসক অন্য একটি বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখেন মোট ১২৫ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে উপস্থিত মাত্র ৮ জন। ঐ বিদ্যালয়ে চার জন শিক্ষক আছেন। অনুসন্ধান করলে এরকম অবস্থা রাজ্যের বহু গ্রামেই চোখে পড়বে। ছাত্রের অভাবে কলকাতা পুর নিগম পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি একটার পর একটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

গ্রামাঞ্চলে বহু বিদ্যালয় আছে কৃষি মরশুমে ছাত্রসংখ্যা এত কমে যায় যে ক্লাস চালানোই দায় হয়ে দাঁড়ায়।

এই দুরবস্থা কাটাতে, প্রাথমিক শিক্ষায় আগ্রহ বৃদ্ধি ঘটাতে এবং বৃহত্তম সংখ্যক বিদ্যালয়-ছুট এবং নিরক্ষর বালক-বালিকাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে নতুন করে নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হলো। ২০০০ সালের নভেম্বর মাসে 'সর্বশিক্ষা অভিযান' শুরু হয়। 'সর্বশিক্ষা' অর্থাৎ সকলের জন্য শিক্ষা। এই অভিযানের পরিপূরক হিসাবে শিশুশিক্ষা কেন্দ্র (SSK), মাদ্রাসা শিক্ষা কেন্দ্র ইত্যাদি শুরু হলো। ২০০9 সালে প্রাথমিক শিক্ষা, সর্বশিক্ষা, শিশুশিক্ষা কেন্দ্র ইত্যাদি ব্যবস্থায় ভর্তি হওয়া ছাত্র সংখ্যা হলো ৯৫,২৭,২৮৫।

ছাত্রদের নিয়মিত স্কুলে এবং তাদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য 'মিড ডে মিল' বা 'বিদ্যালয়ে দ্বি-প্রাহরিক খাদ্য প্রদান বিষয়ে জাতীয় প্রকল্প'টি ১৯৯৫ সালের ১৫ আগস্ট শুরু হলেও ২০০০ সালের অক্টোবর থেকে যথেষ্ট পরিমাণে সম্প্রসারিত হয়। কিন্তু এই রাজ্যে এই প্রকল্পটি যথারীতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। খাদ্যের গুণগত মান এতই নিকৃষ্ট যে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী ছাত্রছাত্রীরাও গ্রহণ করতে আগ্রহী হয় না। যেদিন খুব ভালো খাবার দেওয়া (আমিষ জাতীয়) হয় সেই দিনই স্কুলে উপস্থিতির সংখ্যা সবচেয়ে বাড়ে। ঘুণধরা এই সমাজে, শিশুর খাদ্য চুরি করতে 'মিড ডে মিল'-এর সরবরাহকারীরা কুণ্ঠিত হয় না। ১২ গ্রাম প্রোটিন এবং ক্যালোরি বিশিষ্ট খাদ্য কোথাও পরিবেশিত হয় না। প্রকল্পটি গ্রহণের আগে ভাবা হয়েছিল এটি চালু হলে বিদ্যালয়-ছুট-এর সংখ্যা কমবে। কিন্তু কার্যত সেটা সম্ভব হয়নি।

বিদ্যালয় হোক অথবা শিক্ষা কেন্দ্র হোক 'বিদ্যালয় ছুট'-এর কারণ নিহিত সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে। এই ধরণের ছুট্ ঘটে সাধারণত নিম্নবৃত্ত অথবা দরিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে। সমাজবিজ্ঞানী এবং শিক্ষাবিদ্রা বিদ্যালয়-ছুট-এর কয়েকটি কারণ নির্ণয় করেছেন— ১. সচেতনতার অভাব; ২. দারিদ্র্য; ৩. পাঠগ্রহণে অনীহা; ৪. বিদ্যালয়ের পরিবেশ অপছন্দ ; ৫. শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সম্পর্ক; ৬. উপযুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষাসেবীর অভাব; ৭. কর্মমুখী পাঠক্রমের অভাব ; ৮. শিক্ষার্থীদের বাসস্থানের দূরত্ব বিদ্যালয় অথবা কেন্দ্রগুলির অধিক; ৯. কৃষিকাজের সময়ে সাময়িক ছুট; ১০. অল্প বয়সে বিবাহ; ১১ শিক্ষা- উপকরণের অভাব; এবং সর্বোপরি ১২. শিক্ষা ব্যবস্থার সামাজিকীকরণের অভাব। এই সব আর্থ-সামাজিক কারণের একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ সম্ভবত এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

□□ রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন— 'আমাদের যে শক্তি আছে তাহারই চরম বিকাশ হইবে, আমরা যাহা হইতে পারি তাহাই সম্পূর্ণ ভাবে হইব—ইহাই শিক্ষার ফল।' আমরা কিন্তু আমাদের সমাজে শিক্ষা বলতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে বুঝি যা নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে শিক্ষার্থীকে পাঠদান করে। মূলত চাকরির কারণে পড়াশুনা। এই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা হলো সংকীর্ণ শিক্ষা। রাজ্য সরকার এবং শিক্ষাবিদ্দের চিন্তার শিথিলতার কারণে এই রাজ্যে শিক্ষানীতির মূল রূপটি হলো সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষার প্রসার ঘটানো অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়া।

শিক্ষার্জনের সুযোগ পাওয়া হলো মানব সমাজের মৌলিক অধিকার। এই অধিকার ব্যাপক এবং সর্বজনীন হওয়া বাঞ্ছনীয়। সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, শিক্ষা দু-রকমের—ব্যাপক শিক্ষা এবং সংকীর্ণ শিক্ষা। ব্যাপক শিক্ষা হলো একজন শিক্ষার্থীকে চেতনার দিক দিয়ে বড় করে তোলা যাতে সে সাফল্যের সঙ্গে ভবিষ্যতের সম্মুখীন হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন— 'আমাদের যে শক্তি আছে তাহারই চরম বিকাশ হইবে, আমরা যাহা হইতে পারি তাহাই সম্পূর্ণ ভাবে হইব—ইহাই শিক্ষার ফল।' আমরা কিন্তু আমাদের সমাজে শিক্ষা বলতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে বুঝি যা নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে শিক্ষার্থীকে পাঠদান করে। মূলত চাকরির কারণে পড়াশুনা। এই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা হলো সংকীর্ণ শিক্ষা। রাজ্য সরকার এবং শিক্ষাবিদ্দের চিন্তার শিথিলতার কারণে এই রাজ্যে শিক্ষানীতির মূল রূপটি হলো সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষার প্রসার ঘটানো অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়া। অর্থাৎ একে একমাত্র শিক্ষাদান পদ্ধতি হিসাবে গ্রাহ্য করা।

এই সংকীর্ণ শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ হয় না, আত্মোপলব্ধি হয় না। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শিক্ষার্থীর ধী-শক্তি, মানসিক কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির সহায়তা করে না। এই শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে কোনো আর্থ-সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তৈরি করে দেওয়া হয়। মানসিক ভাবে একজন শিক্ষার্থী হয়ে ওঠে আত্মকেন্দ্রিক, আত্মসর্বস্ব। এই ধরণের শিক্ষায় একটি প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা তৈরি হয়। আর্থ-সামাজিক কারণে প্রতিযোগিতায় অসফল শিক্ষার্থীদের খুবই সঙ্গত কারণে পঠন-পাঠনে ঔদাসীন্য জাগে, অনীহা বৃদ্ধি পায়।

আমাদের শিক্ষানীতির আরেকটি প্রধান দুর্বলতা হলো সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন সামাজিক অবস্থার শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার্জনের সুযোগ নেই। শিক্ষার্থীর সুপ্ত গুণাবলী কিংবা তার বৃত্তিসমূহকে বিকশিত করার অথবা একজন শিক্ষার্থীর জীবিকার্জনের স্বার্থে তার রুজি-রোজগারের জন্য তাকে যোগ্য করে তোলার কোনো পাঠক্রম প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় নেই। সমাজের যোগ্যতম ব্যক্তিকে বাছাই করার কোনো ভূমিকা আমাদের বিদ্যালয়গুলি পালন করে না। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার এটিই বড় দুর্বলতা যে একজন শিক্ষার্থীকে তার জীবনের প্রয়োজনে উৎপাদনশীল কাজকর্মে অংশ নিতে সাহায্য করে না। শিক্ষাবিদ্গণ কখনো ভাবেন না যে, এক দেশকাল, এক বিশিষ্ট জনগোষ্ঠীর কাছে যা যথোপযুক্ত, তা অন্যের ক্ষেত্রে নাও হতে পারে। শিক্ষানীতি রূপায়ণে দেশকাল, সুযোগ, প্রয়োজন এবং সামর্থ্যের তারতম্যকে উপেক্ষা করা হয়। এই কারণে শুধুমাত্র নীরস পাঠক্রমে অনেক শিক্ষার্থীর বৈরাগ্য জন্মে। তাদের অভিভাবকদের মনে এরকম যান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি বিরূপতা জাগে। ফলে, ছাত্রছাত্রীদের একাংশ ক্রমশ বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য হয়ে পড়ে।

বিগত বামফ্রন্ট সরকার দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বিনা বেতনে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। যে সমাজে কোনো বৈষম্য নেই শুধুমাত্র সেখানেই সকলের জন্য সমান সুযোগ দেওয়া যায়। বেতন না নেওয়ায় যে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছিল সেটা কেউই খেয়াল করলেন না। যাদের বেতন দেওয়ার ক্ষমতা নেই তারা উপকৃত হলো বটে কিন্তু যাদের বেতন দেওয়ার ক্ষমতা আছে তাদের কাছে

এই বেতনের টাকা উদ্বৃত্ত হলো। সেই টাকা শিক্ষাগ্রহণের অন্য প্রয়োজনে অতিরিক্ত পুস্তকাদি, শিক্ষাপোকরণ ক্রয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যয় করার সুবিধা হলো। কিন্তু দারিদ্র্যসীমার নীচের মানুষগুলির সেই সুবিধা হলো না। এই শ্রেণির ছাত্ররা শুধুমাত্র বেতনের অভাবে বিদ্যালয়-ত্যাগ করে তা নয়, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্থাভাব, অন্নাভাবও তাদের অগ্রগতি রোধ করে। শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ, পরিবহণ ব্যয় ইত্যাদির অভাবে তারা বিদ্যালয় ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। যাদের বেতন দেওয়ার ক্ষমতা আছে তাদের কাছ থেকে বেতন নিয়ে সেই সংগৃহীত অর্থে দারিদ্র্য-সীমার নীচের শিক্ষার্থীদের কিছু সাহায্য করা যেত। কেন্দ্রীয় সরকার যেমন প্রতিটি করের সাথে ৩ শতাংশ শিক্ষা সেস সংগ্রহ করে সেই টাকায় 'সর্ব শিক্ষা অভিযান', 'মিড ডে মিল' প্রকল্পগুলিতে অর্থ বরাদ্দ করে— রাজ্য সরকার এরকম কোনো পরিকল্পনা নিতে পারত। এটি হলে, বিদ্যালয়-ছুটের সংখ্যা বৃদ্ধি পেত না। রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার সুযোগ থেকে এক শ্রেণির মানুষ বঞ্চিত হতো না। এসব কারণে ব্যাপক অর্থে শিক্ষাকে সমাজের জীবনধারার সঙ্গে মিলিত করা গেল না।

ব্যক্তি মানুষের মনোভাবের (attitude) সৃষ্টি হয় বিভিন্ন বিষয় এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে। বিদ্যালয়ের পারিপার্শ্বিকতা, পরিবেশ শিশুর নরম মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। পরিবেশ আকর্ষণীয় হলে বিদ্যালয়ের প্রতি শিশুর আগ্রহ বৃদ্ধি হবে। বিগত বছরগুলিতে অনেক বিদ্যালয় গৃহ পাকা বাড়ি হলেও বহুক্ষেত্রেই আগের মতো মাটির ঘর টালি অথবা টিনের ছাউনি রয়ে গেছে। অনেক বিদ্যালয় এতই দূরে যে ছাত্রছাত্রীদের পরিবহণের সাহায্য নিতে হয়। গ্রামের গরিব শিশুদের সাধারণত যে ধরণের বাড়িতে বসবাসের অভ্যাস স্কুলবাড়ির অবস্থাও প্রায় সেই রকমই, কিংবা তার চেয়ে খারাপ। যথেষ্ট আলো বাতাস নেই এমন সব অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘর। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে শৌচাগার নেই, থাকলেও নিয়মিত পরিচ্ছন্ন হয় না। পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। থাকলেও সে জল অপেয়, অস্বাস্থ্যকর। বাগান তো দূরের কথা কোনো উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ নেই বহু স্কুলের। খেলার মাঠও নেই। পাঠক্রমের মধ্যে কোনোরকম খেলাধূলার ব্যবস্থা নেই। বিনোদনের কোনো ব্যবস্থা নেই বিদ্যালয়গুলিতে। আগে শিক্ষার্থীদের জন্য রেডিও ছিল, এখন বন্ধ হয়ে গেছে। টেলিভিশনে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীর কোনো অনুষ্ঠান নেই, গান, নাচ, হাতের কাজ ইত্যাদি বৃত্তির অনুশীলন নিয়মিত হয় না। আছে শুধুমাত্র নীরস পাঠক্রম।

জর্জ বার্নাড শ ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন—'He who can, does. He who cannot, teachers'. কিংবা তাঁর আর একটি কথা— 'He who cannot teach, teaches teacher'. শ'-এর আপ্তবাক্য দুটি আমাদের সমাজজীবনে যে কতখানি সত্য তা বোঝা যায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পরিবেশ, শিক্ষকদের ভূমিকা, পঠন-পাঠন ইত্যাদি পর্যালোচনা করলে। আজ প্রায় আশি শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষক প্রত্যক্ষ রাজনীতি অথবা এজেন্সি, ক্ষুদ্রব্যবসা, গৃহশিক্ষকতা ইত্যাদি কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। বস্তুত বিদ্যালয়গুলি হলো তাঁদের অবকাশ গ্রহণের জায়গা। গতানুগতিক নীরস পাঠদান ছাড়া তাঁদের অন্য কোনো ভূমিকা নেই।

আজকাল শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে কোনো হৃদয়ের সম্পর্ক নেই। একজন শিক্ষক গতানুগতিক ভাবে চরম উদাসীনতার সঙ্গে দৈনন্দিন শিক্ষা দেন। পশ্চাৎপদ শ্রেণির ছাত্রদের এগিয়ে আনার জন্যে কোনো অধ্যাবসায় তাঁদের থাকে না। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এ-রাজ্যে অধিকাংশ শিক্ষকই শিক্ষণপ্রাপ্ত নন। সমাজের বনিয়াদ তৈরি করার কথা যাঁদের তাঁরা প্রশিক্ষণহীন, নিম্নশিক্ষিত, ন্যূনতম বেতন এবং মর্যাদার অধিকারী। তাঁরা শিশু মনস্তত্ত্ব জানেন না, শিশুশিক্ষার প্রাথমিক শর্ত পালন করেন না।

শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রদের এখন সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। একজন ছাত্র দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকলে, পাঠে অমনোযোগী হলে, দুর্বিনীত আচরণ করলে কোনো শিক্ষক ছাত্রের অভিভাবকের সঙ্গে আলোচনা করেন না, ছাত্রের বাড়িতেও যান না তার দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণ জানতে। ছাত্র শিক্ষক পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং স্নেহের সম্পর্ক নেই। কোনো শিক্ষক পাঠক্রম-বহির্ভূত প্রাসঙ্গিক বিষয়ের কথা যথা—সমাজের প্রচলিত প্রথা- প্রতিষ্ঠা, আচার-বিচার, ন্যায়-নীতি, মূল্যবোধ, জীবন গড়ে তোলার যাবতীয় বৈশিষ্ট্যর সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় ঘটান না।

ব্যাপক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিকীকরণ সম্পূর্ণ হয়। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সূচনা-পর্বে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা হলো সমাজের উচ্চতর সোপানে আরোহণের অত্যতম মাধ্যম। যে সব ছাত্র এই আরোহণের সকল সম্ভাবনাকে হারিয়ে ফেলে সে নৈরাশ্যের শিকার হয়ে বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করে। সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণির ছাত্ররা মর্যাদাসম্পন্ন উচ্চমানের বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পায়। ফলে উচ্চশ্রেণিতে আরোহণের সুযোগও তারাই বেশি পায়। মর্যাদাহীন সাধারণ বিদ্যালয়গুলি ছাত্রদের মধ্যে এই সম্ভাবনার সৃষ্টি করতে পারে না। স্বাধীনতার ৬০ বছর পরেও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির এত গুণগত পার্থক্য রাজ্য সরকারের শিক্ষানীতি অথবা শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতার পরিচায়ক।

নৈরাশ্যের এই অন্ধকারের মধ্যে মাঝে মাঝে আলোর রূপালি রেখা দেখা যায়। বিদ্যালয়-ছুট আদিবাসী ছেলেমেয়েদের আলোর দিশা দেখাচ্ছেন হাওড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষা সংসদ। বস্তুত, তাঁদের উদ্যোগে DIET অর্থাৎ District Institute of Education & Training তাঁদের প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণে শুরু করেছেন আংশিক সময়ের আবাসিক সেতু-পাঠক্রম। জেলার জগৎবল্লভ-পুরের শঙ্করহাটি-১, জগৎবল্লভপুর-১ এবং ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের আদিবাসী ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয় ছুট বন্ধ করতেই এই পাঠক্রম।

সমীক্ষার মাধ্যমে এই সংস্থা জেনেছে ঐ সকল গ্রামে বাবা মায়েরা যখন কৃষিকাজে লিপ্ত হন তখন তাঁদের ছেলেমেয়েরা নিঃসঙ্গ অবস্থায় বাড়িতে থাকে। অনেক বাবা-মা তাঁদের সন্তানদের সঙ্গে করে মাঠে নিয়ে যান। ফলে এই সব ছেলেমেয়েরা স্কুলে ভর্তি হলেও ইতি টানতে হয়। এই অবস্থা দূর করার জন্যে উক্ত সংস্থা ১০-৫টা পর্যন্ত শিশুদের রেখে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। পড়াশুনা ছাড়া এদের দেওয়া হয় সকাল, দুপুর ও বিকালের খাবার। আদিবাসী সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ছেলেরাই এদের পড়ানোর দায়িত্ব নিয়েছেন। গাড়িতে করে সকালে বিভিন্ন গ্রামের ছেলেমেয়েদের এনে আবার ঐ গাড়িতেই সন্ধ্যাবেলায় গ্রামে ফিরিয়ে দেওয়া হয় তাদের। বর্তমানে প্রায় ১৬০ জন বিদ্যালয়-ছুট শিক্ষার্থী আছে ঐ কেন্দ্রে। পুরো ব্যয় নির্বাহ হয় সর্বশিক্ষা মিশনের বরাদ্দ থেকে।

সংখ্যায় নগণ্য হলেও বিদ্যালয়-ছুট ছেলে-মেয়েরা এভাবে আলোর সন্ধান পাচ্ছে। এই ভাবে শিক্ষার মাধ্যমে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে সামাজিক উত্তরাধিকার। □

সৃজনশীলতায় চেতনাতীতের ভূমিকা

অজয় চক্রবর্তী

যাঁরা কবিতা লেখেন তাঁরা জানেন যে, কাব্যসৃষ্টির ব্যাপারটা সর্বাংশে চেতন মনের ক্রিয়া নয়। মনের অতল থেকে রঙিন বুদ্‌বুদের মতো উঠে আসে শব্দেরা, উঠে আসে নানান প্রতীক, নানান চিত্রকল্প নিয়ে। সার্থক কবিতার জন্ম হয় সেই অবচেতনে, যেখানে সব অনুভূতির স্মৃতি মেশামেশি হয়ে থাকে। তাই সেখানে চিলের 'ডানার রৌদ্র' গন্ধময় হতে পারে, সন্ধ্যা আসতে পারে 'শিশিরের শব্দের মতো'। কবিতা লিখব বললেই কবিতা লেখা যায় না, কবিকে প্রতীক্ষায় থাকতে হয় কখন কবিতা আপনি এসে ধরা দেবে তার চেতনার গভীরে। যতক্ষণ তা না হয় ততক্ষণ কবি নিরুপায় থাকেন।

কবিতার ক্ষেত্রে যা সত্য, সৃজনশীলতার অন্যান্য ক্ষেত্রেও তা সমভাবে সত্য। সার্থক কবিতা যেমন হয়ে যায়, কেমন করে হয় তা যেমন কবি নিজেই জানেন না, বিজ্ঞানের মৌলিক সমস্যার সমাধানও তেমনি হয়ে যায়। বিজ্ঞান-সাধকের অজান্তে ওই সমাধান এসে করাঘাত করে বিজ্ঞানীর মনে। কেবল সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই নয়, সৃষ্টিশীলতার অন্যান্য ক্ষেত্রেও অবচেতনের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। প্রখ্যাত চিত্রকর পাবলো পিকাসো বলেছিলেন, 'je ne cherche pas, je trouve', অর্থাৎ, 'আমি খুঁজি না, আমি পেয়ে যাই।'

স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টিকে কেমন করে খুঁজবে? যার সৃষ্টিই হলো না তাকে কোথায় খুঁজবে সে? শিল্পী তাঁকে আকস্মিক ভাবে পেয়ে যান। সৃষ্টি আপনি এসে ধরা দেয় স্রষ্টার কাছে।

বিজ্ঞান-সাধনা কি কোনো অনুসন্ধান? হয়তো-বা। কিন্তু যতক্ষণ না বিজ্ঞানী তাঁর অভীষ্টের দেখা পাচ্ছেন ততক্ষণ তিনি নিজেই জানেন না তিনি কি খুঁজছেন! কেননা, কোনো সমস্যা সমাধানের খোঁজে বিজ্ঞানী যখন তৎপর হন তখন সমাধানের অবয়বটা কেমন হবে তা তার জানা থাকে না। কাজেই, বিজ্ঞান-সাধনাকে যদি অনুসন্ধান বলি তবে তা অজানা লক্ষ্যের অনুসন্ধান।

অধিকাংশ মানুষ, এমন কি অধিকাংশ বিজ্ঞানী মনে করেন যে, সুপরিকল্পিত পথে যুক্তির ক্ষুরধারে বাধার কণ্টক অপসারণ করে এগিয়ে গিয়ে বৈজ্ঞানিক সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। তারা বিশ্বাস করেন যে, বিজ্ঞানকর্ম বিজ্ঞানীর পরিশীলিত মনের সচেতন ক্রিয়া। কিন্তু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং উদ্ভাবনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, ব্যাপারটা আদৌ তেমন নয়। একথা সত্য যে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্য চাই একটি পরিশীলিত এবং যুক্তিবাদী মন। কিন্তু সৃষ্টিশীল বৈজ্ঞানিক চিন্তা চেতন মনের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ থাকে না। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, সৃজনশীল বৈজ্ঞানিক চিন্তার নেপথ্যে থাকে মনের অবচেতন স্তরের ক্রিয়া। বিশেষ করে, যে-সব আবিষ্কারের ফলে চিন্তার জগতে বৈপ্লবিক ধ্যানধারণার আবির্ভাব হয় অবচেতন মনই সে-সব আবিষ্কারের সূতিকাগার।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে, যখন সৃষ্টিশীল মন কোনো বিশেষ সমস্যা নিয়ে বা কোনো বিষয় নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করতে থাকে তখন মনের চেতন স্তর এবং অবচেতন স্তর—এরা উভয়েই ওই বিষয়ে তৎপর হয়। মনের অবচেতন স্তরই সব আবিষ্কারের, সব নতুন চিন্তার জনক। সব সমস্যারই সমাধান হয় মনের অচেতন স্তরে। সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো তা উঠে আসে সচেতন স্তরে। এই হঠাৎ-আলোই স্বজ্ঞার আলো।

জ্ঞান-জগতের সব ক্ষেত্রেই সৃজনশীলতার স্বরূপ অভিন্ন। কাব্যসৃষ্টির সময় কবির মন যেভাবে কাজ করে পদার্থবিজ্ঞান কিংবা জীববিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব আবিষ্কারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীর মন সে ভাবেই কাজ করে। চেতনার যে অতীন্দ্রিয় স্তরে উন্নীত হলে কবি অনুভব করেন 'উটের গ্রীবার মতো কোনো এক নিস্তব্ধতা' কোনো বিজ্ঞানী যখন নতুন কোনো তত্ত্ব বা বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করেন তখন তিনিও চেতনার সেই স্তরে উন্নীত হন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মনের চেতন স্তরের সক্রিয় অনুশীলন ছাড়া অবচেতন বা অচেতন স্তর সক্রিয় হয় না। তাই, শিল্পী, সাহিত্যিক এবং বিজ্ঞানীকে সচেতন ভাবে তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে সাধনা করে যেতে হয়। সাফল্যের অনিবার্য শর্ত হলো অনুশীলন— তা সে শিল্পসাহিত্যেই হোক বা বিজ্ঞানেই হোক। ওস্তাদ তবলচি যখন ওস্তাদ শিল্পীর সঙ্গে সংগত করতে বসেন তখন মূল শিল্পীর সংগীত বা সুরধ্বনির সঙ্গে তাল মিলিয়ে তবলচির আঙুল চলতে থাকে বিশ্বস্ত ভাবে এবং সঠিক মুহূর্তে সঠিক স্থানে আঘাত করে নির্ভুল বোলটি ফুটিয়ে তোলে। মূল শিল্পীর সংগীতধ্বনি শুনে তবলচি যদি ভাবতে বসেন— 'ধিন্' বাজাবেন, নাকি 'তুন্'— তাহলে সংগতে অনিবার্য ভাবে অসংগতি আসবে।

তবলা-চর্চা শুরু করার সময় শিক্ষার্থী মাত্রা গুণে গুণে গাণিতিক নিয়মে বোল্ বাজায়; গান বা বাজনা শুনে তাল ঠুকে ঠুকে বোঝে 'কার্ফা' বাজবে, নাকি 'দাদরা'। অর্থাৎ, অনুশীলনের প্রথম ধাপে যুক্তিপ্রয়োগের অবকাশ থাকে, সচেতন চিন্তনের একটা ভূমিকা থাকে। কিন্তু পরিণত তবলচি যখন লহরা বাজান তখন তার আঙুলের গতি-নিয়ন্ত্রণে যুক্তিপ্রয়োগ বা চিন্তনের কোনো ভূমিকা থাকে না, থাকলেও সে ভূমিকা নিতান্তই গৌণ। অনুশীলন ছাড়া কোনো ক্ষেত্রেই বড়ো মাপের সাফল্য আসে না। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কিছু করতে হলে মস্তিস্ককে ঋজু চিন্তায় অভ্যস্ত করতে হবে, বৈজ্ঞানিক যুক্তি এবং পদ্ধতির প্রয়োগে অভ্যস্ত হতে হবে। কিন্তু আবিষ্কারের বা উদ্ভাবনের সফল মুহূর্তে নতুন সত্যের ইঙ্গিত আসে মনের চেতনাতীত স্তর থেকে।

যারা স্রষ্টা, যারা শিল্প, সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের সাধনায় ব্রতী তাদের নিজেদের মানসিক প্রক্রিয়াগুলি পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করলেই একথার যাথার্থ্য বুঝতে পারবেন। কোনো বিজ্ঞানী হয়তো একটা সমস্যা নিয়ে গভীর ভাবে ভাবতে লাগলেন, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে নানান ভাবে ওই সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেও সফল হলেন না। হাল ছেড়ে দিয়ে তিনি হয়তো অন্য কাজে মন দিলেন, কিংবা মন থেকে ওই সমস্যার চিন্তা দূর করে কিছুদিন ছুটি কাটিয়ে এলেন। তারপর আবার যখন তিনি তাঁর সমস্যায় ফিরে এলেন তখন হয়তো দেখলেন যে, তিনি তাঁর সমস্যাটির সমাধান পেয়ে গেছেন। কী করে এমন হয়? সচেতন প্রয়াসে দীর্ঘ সময়েও যে সমস্যার মীমাংসা করা যায় নি, অকস্মাৎ তার সমাধান হয় কীভাবে? কেউ তা সঠিক ভাবে বলতে পারে না। তবে এর সম্ভাব্য উত্তর হলো এই যে, সমস্যাটির সমাধান হয় মনের অবচেতন স্তরে। মনের অতলে সংঘটিত প্রক্রিয়াগুলি চেতনার অগোচরে ঘটে বলে একথা বললে ভুল হবে না যে, সমস্যাটি আপনিই তার সমাধান খুজে পায়।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয় যে, বিজ্ঞানী তাঁর উদ্দিষ্ট সমাধানটি পেয়েছেন স্বপ্নে। সাহিত্যের ইতিহাসেও এমন নজির আছে যেখানে সৃজনশীল সাহিত্যিক সৃষ্টিশীল কোনো ধারণা বা ইঙ্গিত পেয়েছেন ঘুমের মধ্যে। রসায়ন-বিজ্ঞানী অগাস্ট কেকুলে জৈব যৌগ 'বেনজিন'-এর গঠনশৈলীর ধারণা পেয়েছিলেন স্বপ্নে। আর এল স্টিভেনসন তার *ড. জেকিল অ্যান্ড মি. হাইড* গ্রন্থের প্লটটি পেয়েছিলেন স্বপ্নে।

আমেরিকার শারীরবিজ্ঞানী ডব্লু বি ক্যানন লিখেছেন যে, তাঁর ক্ষেত্রে প্রায়শই এমন ঘটেছে যে, তিনি একটি সমস্যা মাথায় নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন এবং সকালে জেগে উঠেছেন সমস্যাটির সমাধান নিয়ে। অনেক সময় সৃজনশীল কোনো ধারণাই যেন খোঁচা মেরে তাঁকে ঘুম থেকে তুলে দিয়েছে মাঝরাতে। কোনো জনসমাবেশে কিংবা কোনো সেমিনারে কী বলবেন সে সম্পর্কেও তিনি নির্দেশ পেতেন ঘুমের মধ্যে! এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন,

> 'As a matter of routine I have long trusted unconscious processes to serve me-- for example, when I have had to prepare a public address, I would gather points for the address and write them down in rough outline. Within the next few nights I would have sudden spells of awakening, with an onrush of illustrative instances, pertinent phrases, and fresh ideas related to those already listed.'

স্নায়ুর মধ্য দিয়ে উত্তেজনার অনুভূতির প্রবাহে রাসায়নিক বিক্রিয়ার যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে সে সম্পর্কে মৌলিক আবিষ্কার করেছিলেন প্রাৎজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অটো লোয়েভি (Otto Loewi)। তিনি তার বৈপ্লবিক ধারণাটি পেয়েছিলেন ঘুমের মধ্যে। অধ্যাপক লোয়েভি যখন স্নায়ুর মধ্য দিয়ে উত্তেজনা প্রবাহের গতিপ্রকৃতি নিয়ে ভাবছিলেন তখন তিনি একদিন গভীর রাত্রে একটি দীপ্ত ধারণা নিয়ে জেগে উঠেছিলেন। তিনি বিছানা থেকে উঠে ঘুমের মধ্যে পাওয়া সমাধান সংকেতটা লিখে রাখলেন। কিন্তু পরদিন ঘুম থেকে উঠে ওই নোটগুলি পড়ে তিনি কিছুই উদ্ধার করতে পারলেন না। আসল কথাটাই তিনি লিখে রাখেন নি! তিনি ভাবলেন, ল্যাবরেটরিতে গিয়ে যন্ত্রপাতির সামনে দাঁড়ালে হয়তো তিনি তার স্বপ্নে-পাওয়া ধারণাটি আবার খুঁজে পাবেন। কিন্তু, না। সারাদিন ধরে বহু চেষ্টা করেও তিনি তাঁর হারিয়ে যাওয়া সূত্রটির সন্ধান পেলেন না। কোনো পরিচিত ব্যক্তির নাম কিংবা ফোন নম্বর মনে করতে না পারলে যেমন অস্বস্তি হয় অধ্যাপক লোয়েভি সারাদিন সেই অস্বস্তিতে কাটালেন। কেন তিনি তাঁর নিদ্রালব্ধ সমাধান-সূত্রটি ভালো ভাবে লিখে রাখেন নি একথা ভেবে তিনি নিজেকেই দোষারোপ করলেন।

দিনান্তে বিছানায় শুয়েও বিজ্ঞানী লোয়েভি একই কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লেন। সেদিন মধ্যরাত্রে আবার বিজ্ঞানীর ঘুম ভেঙে গেল। আনন্দে তিনি বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লেন। হারানো সূত্রটি স্বপ্নযোগে আবার ধরা দিয়েছে তাঁর কাছে। এবার আর তিনি ভুল করলেন না। তিনি এবার তার স্বপ্নে-পাওয়া ধারণাটা সবিস্তারে নোট করে রাখলেন এবং গবেষণাগারে গিয়ে একটি সরল পরীক্ষার সাহায্যে ওই ধারণার সত্যতা যাচাই করে নিলেন।

এমন আরও অসংখ্য দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যায় যেখানে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী সচেতন প্রয়াস ছাড়াই মনের গভীর থেকে আকস্মিক ভাবে এমন সব সমস্যার সমাধান পেয়েছেন প্রথাগত চিন্তন-মননের পথে তাঁরা সে-সব সমস্যার সমাধান করতে পারেন নি। জার্মান বিজ্ঞানী ফন হেলমহোল্টৎজ, বিজ্ঞানী পোঁয়াকারে প্রমুখ বড়ো মাপের বিজ্ঞানীও তাঁদের জীবনে অনুরূপ ভাবে বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধান লাভ করার কথা জানিয়েছেন।

এ আলোচনা থেকে পাঠকদের মনে এ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হতে পারে যে, অবচেতন-লব্ধ ধারণা সব সময়ই সঠিক পথের সন্ধান দেয় এবং ফলপ্রসূ হয়। মনে রাখতে হবে যে, অবচেতন-লব্ধ ধারণা বা কোনো সংকেত ভ্রান্তিপ্রবণ মানব-মনেরই ফসল। স্বাভাবিক ভাবেই, চেতনার নেপথ্য থেকে আগত ধারণা বা সমাধান সংকেত সবসময় নির্ভুল হয় না। তবে, অবচেতন স্তরের ইঙ্গিত পেয়ে যে-সব বিজ্ঞানী সফল হন তারাই কেবল তাদের অবচেতন-লব্ধ ফলপ্রসূ সূত্রগুলির কথাই মনে রাখেন, নিস্ফল ধারণাগুলির কথা মনে রাখেন না।

বিজ্ঞানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হয়েছে আকস্মিক ভাবে লাভ করা স্বজ্ঞার আলোয়। এ থেকে অনেকে ভাবতে পারেন যে, যে-সব বিজ্ঞানী ভাগ্যবান কেবল তারাই চেতনাতীতের সহায়তা লাভ করেন এবং বিজ্ঞানে বড়ো মাপের আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। একথা যারা ভাবেন তারা ভুলে যান যে, কেকুলের মতো রসায়নবিদই স্বপ্নে বেনজিনের গঠনশৈলীর রহস্যভেদ করতে পারেন, আর্কিমিডিসের মতো বিজ্ঞানীই স্নানাগারে বাথটাবে শুয়ে হঠাৎ প্লবতার সূত্রের ইঙ্গিত পেতে পারেন, গাউসের মতো গণিতবিদই চেতনাতীতের ইঙ্গিত পেয়ে জটিল গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারেন। □

প্রফুল্লচন্দ্র ও পরিবেশ

রবীন মজুমদার

পরিবেশ আজ আমাদের খুবই পরিচিত শব্দ। পরিবেশ নিয়ে শোরগোল সর্বত্র সর্বদা। এদেশের স্কুলেও এখন পরিবেশ একটি অবশ্যপাঠ্য বিষয়। তারও আগে পরিবেশবিদ্যা বিষয়টি কলেজে অবশ্য পাঠ্য হয়েছে এরাজ্যে, ২০০১ সালে এবং অনেকেই আমরা জানি যে, নির্দেশটি প্রথম আসে ভারতের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় সুপ্রিম কোর্ট থেকে। তারপর তা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাধ্যমে ১৯৯৪ সালে সুপারিশ হয় রাজ্যে রাজ্যে। সুপ্রিম কোর্ট থেকে নির্দেশটি এসেছিল কারণ ততদিনে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তোলপাড় পড়ে গেছে পরিবেশকে কেন্দ্র করে। ভারতেও প্রণীত হয়েছে নতুন নতুন আইন, স্থাপিত হয়েছে পরিবেশ মন্ত্রক, গঠিত হয়েছে কেন্দ্রে ও রাজ্যে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ।

রাষ্ট্রে ও রাজ্যে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পরিবেশ অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিল আন্তর্জাতিক নানা চুক্তি ও সমতার সূত্রে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রেও তার অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন পড়েছিল। সাধারণ নাগরিকদের জন্যও নেওয়া হতে থাকে নানা কর্মসূচি— পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলা ও প্রসারের লক্ষ্যে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পশ্চিমের শিল্পোন্নত দেশগুলিতে বিশেষ করে অনুভূত হয় পরিবেশ সুরক্ষার প্রয়োজন। ১৯৭২-এর স্টকহোমের বিশ্বপরিবেশ সম্মিলন এবং ১৯৯২-এর রিও-র মহাসম্মিলন সে-সবেরই ফলশ্রুতি। জাতিপুঞ্জের ছত্রছায়ায় বিশ্বের অনুন্নত এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলিও এই কর্মকাণ্ডের অংশীদার হয়ে ওঠে।

১৯৯২-তে রিও পরিবেশ মহাসম্মিলনের (পেশাদারী নাম ছিল ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স অন এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড সাসটেনেবল ডেভলপমেন্ট) ঠিক একশো তিন বছর আগে রসায়নের শিক্ষক হিসেবে প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগ দিয়েছিলেন ড. প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তখন এদেশে কোনো স্তরেই কোনো ভাবে পরিবেশ চর্চার নামগন্ধ ছিল না। অবশ্য ইউরোপ-আমেরিকায় সেসময় নানারকম ক্লাব ও গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল, প্রকৃতিকে ঘিরে তাদের ছিল নানারকম শখ ও নেশার কর্মসূচি। প্রকৃতিকে সুরক্ষিত রাখার কথাও উঁকিঝুঁকি মারছিল।

পরিবেশ-সচেতনতার সেই আবছা উষায় প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে এদেশে প্রথম প্রকৃতি পরিবেশ এক নতুন তাৎপর্যে ধরা দিয়েছিল। আমরা আজ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী পালনের সূত্রে তাঁর বহুমুখী কর্মোদ্যমের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করছি ; নতুন নতুন কত দিকে যে তিনি স্বদেশবাসীকে পথের দিশা দিয়েছিলেন, তা অনুধাবন করতে গিয়ে বিস্মিত হচ্ছি, কিন্তু তিনি যে পরিবেশ ও প্রকৃতির ভাবনায় এবং তদনুযায়ী কর্ম ও আচরণেও একজন পথিকৃৎ, তা সচরাচর আমাদের দৃষ্টির আড়ালেই পড়ে থাকে।

পরিবেশ-কেন্দ্রিক বিজ্ঞান এবং অন্য নানাবিধ চর্চার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে বিগত মাত্র ৫০-৬০ বছরে। এবং সেইসব চর্চার ফলে নতুন আলোয় ধরা পড়েছে পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, ধরা পড়েছে তার প্রকৃতি-ধ্বংসী স্বরূপ। আর সেসব কাটিয়ে ওঠার জন্য শুরু হয়েছে নতুন পথের সন্ধান। শতবর্ষ আগে এসব চিন্তা ও চর্চার অস্তিত্ব ছিল না, সম্ভবও ছিল না। বরং ইউরোপ তখন শিল্পের, বিশেষত রসায়ন শিল্পের, কল্যাণী ভূমিকায় আপ্লুতই ছিল বলা যায়। লুই পাস্তুর, যোসেফ লিস্টার, জুস্টাস দ্য লিবিগ ইত্যাদি বিজ্ঞানীরা হয়ে উঠেছিলেন সমাজের ত্রাতা, সাধারণ মানুষের চোখের মণি।

এহেন সময়ে, সদ্য বিলেত ফেরৎ তরুণ অধ্যাপক, কলকাতার মতো জায়গায় প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদানের এক বছরের মধ্যেই ১৮৯০ সালে বন্ধুবান্ধবদের কয়েকজনের সঙ্গে গড়ে তুললেন 'নেচার ক্লাব'। এ প্রসঙ্গে *আত্মচরিতে* (পৃ. ৭১, ষষ্ঠ সং., ২০১০ : শৈব্যা, কলকাতা) লিখেছেন

> ... একদিন প্রাতভ্রমণের সময়ে আমি একটি "ভাম" (Indian Palm Civet) রাস্তার ধারে দেখিতে পাইলাম। বোধহয় শহরের প্রান্তভাগে কোন বাড়ীতে নিশীথ অভিযান করিতে গিয়া সে নিহত হইয়াছিল। আমি এই "নমুনাটি" সংগ্রহ করিয়া বিজয়গৌরবে বাড়ী লইয়া গেলাম এবং তৎক্ষণাৎ আমার ডাক্তার বন্ধুদ্বয়কে উহা ব্যবচ্ছেদ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলাম। আমরা একটি নেচার ক্লাবও খুলিলাম। ডাক্তার নীলরতন সরকার এবং ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য ব্যতীত রামব্রহ্ম সান্যাল (আলিপুর পশুশালার সুপারিনটেন্ডেন্ট), প্রিন্সিপাল হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এবং ডাঃ বিপিনবিহারী সরকার ঐ ক্লাবের সদস্য ছিলেন। আমরা নিয়মিতভাবে মাসে একবার করিয়া সভা করিতাম।....

কিরকম নক্ষত্রসমাবেশ ঘটেছিল সেই নেচার ক্লাবে, তা তো দেখাই যাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতির প্রতি তাঁর

(বা তাঁদের) আগ্রহ শুধুমাত্র কৌতূহল নিবৃত্তির পরীক্ষা-নিরীক্ষাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সেই আগ্রহের শিকড় ছিল আরও গভীরে। তাঁর নিজের কথায় শোনা যাক :

> প্রেসিডেন্সী কলেজে কাজ আরম্ভ করিবার কিছু দিন পর হইতেই বিজ্ঞান বিভাগে বাংলা সাহিত্যের দারিদ্র্য দেখিয়া আমার মন বিচলিত হয় এবং রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা এবং প্রাণীবিদ্যা সম্বন্ধে প্রাথমিক পুস্তিকা লিখিবার আমি সঙ্কল্প করি। স্বভাবতঃ প্রথমেই রসায়ন শাস্ত্র সম্বন্ধে পুস্তক লিখিতে আমি প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু কিছুদূর পর্যন্ত বইখানি লিখিয়া আমি উহা হইতে বিরত হইলাম। আমার মনে হইল প্রাকৃতিক বিষয় অধ্যয়নই বালক বালিকাদের চিত্ত বেশী আকর্ষণ করিবে এবং প্রাণীজগৎ ও উদ্ভিদজগৎ এই আলোচনার বিপুলক্ষেত্র।... এখানে সত্য ঘটনা গল্পের চেয়েও মনোমুগ্ধকর। বাংলা দেশ প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ। বৃক্ষলতা এখানে প্রাচুর্যের গৌরবে ভরপুর। ইংলন্ডে প্রকৃতি কঠোর রুক্ষ তুহিনাচ্ছন্ন, কিন্তু বাংলা দেশে শীতকালেও প্রকৃতি তাহার ঐশ্বর্যের মহিমায় বিকশিত হয়।... বাংলার নদীসমূহ বিচিত্র প্রকারের মৎস্যে পূর্ণ এবং বনজঙ্গলে বিচিত্র রকমের জীবজন্তুর বাস। এক কথায় সমস্ত বাংলা দেশটাই একটা বীক্ষণাগার বিশেষ। তরুণ বয়স্কদিগকে প্রাথমিক বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার একটা প্রধান উদ্দেশ্য, তাহাদের অন্তর্নিহিত পর্যবেক্ষণশক্তিকে উদ্বোধিত করা এবং বৃক্ষলতা ও জীবজন্তুর জীবন ইতিহাসের মধ্য দিয়ে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহাতে এই উদ্দেশ্য সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়।...
>
> (পৃ. ৭০ *আত্মচরিত*, ঐ)।

বস্তুত, প্রফুল্লচন্দ্রের চেতনার কেন্দ্রে সদা-জাগ্রত ছিল প্রকৃতি পরিবেশ। এখনকার বাংলাদেশের পূর্বতন যশোহর জেলার রাড়ুলি গ্রামের (বর্তমান খুলনা জেলায়) মাঠ-ঘাট-প্রান্তর বন-বাগান-কৃষিক্ষেত্র আর বাড়িতে বাবার লাইব্রেরি এগুলিই ছিল তাঁর প্রকৃত পাঠশালা। নয় বছর বয়স পর্যন্ত তাঁরই বাবার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গ্রাম্যস্কুলে তাঁর শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়। প্রিয় সঙ্গীসাথীদের মধ্যে দরিদ্র, অন্ত্যজ, স্বধর্মী ভিন্নধর্মী সবাই সমান ছিল। পরবর্তীকালে কলকাতায় গিয়ে হেয়ার স্কুলে ভর্তি হলেও শারীরিক অসুস্থতার কারণেই দীর্ঘ সময় কেটেছে দেয়ালঘেরা শ্রেণিকক্ষের বাইরে। তাই প্রকৃতি পরিবেশের সঙ্গে মানুষ বিশেষত মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষ, কর্মী মানুষ, কৃষক জেলে জোলা মুচি-মানুষ এঁরাও ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে দেশের প্রতীক। সেটা আরও পোক্ত হয়েছিল ইংলন্ড প্রবাসের মধ্য দিয়ে। দেশে ফিরে আসার আগে তিনি কিন্তু 'হাইল্যান্ডের দৃশ্যাবলী' দেখবার 'বহুদিনের বাসনা' পূর্ণ করতে ভোলেন নি। এবং হাইল্যান্ডে তিনি ভ্রমণ করেছিলেন পায়ে হেঁটে। প্রথমে স্টার্লিং পৌঁছে আতিথ্য নিয়েছিলেন এক স্থানীয় কৃষকের গৃহে। স্টার্লিং দুর্গ এবং ওয়ালেসের স্মৃতিস্তম্ভ ইত্যাদি দেখে লেক ক্যাট্রাইনে সাঁতার কেটে, ক্যালডোনিয়ান খালের তীর ধরে, ফোর্ট উইলিয়ামের একটি কুটিরে কয়েকদিন কাটিয়ে, বেন জেভিসের গিরিশৃঙ্গে উঠে চারদিকের 'অতুলনীয় মনোমুগ্ধকর' সব দৃশ্যাদি দেখে তিনি বিলাতের উত্তরাঞ্চলের প্রকৃতি পরিবেশ-মানুষের তাদের জীবন ও সংস্কৃতির রূপ রস গন্ধ আহরণ করে নিলেন। একদিনে একটানা আঠারো মাইল দূরত্ব অতিক্রমও করেছিলেন অক্লেশে।

শিক্ষকতা-জীবনে তিনি কখনও ভোলেন নি তাঁর মাটির সরসতাকে, মানুষের ঘামের ঘ্রাণকে। শিক্ষার গোড়াপত্তনে তাঁর ভাবনা চিন্তা ছিল রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনারই পরিপূরক। উভয়েই প্রকৃতি পরিবেশের কোলে শিক্ষার কথা বলেছেন। দেশ-বিদেশের বহু খ্যাতনামা মানুষ স্কুল কলেজ নয়, জীবনের পাঠশালাতেই শিক্ষালাভ করে মানবসভ্যতার অগ্রগতিতে চিরকালীন অবদান রেখে গেছেন। আব্রাহাম লিঙ্কন, ম্যাকসিম গোর্কি, মাইকেল ফ্যারাডে ইত্যাদি অনেক নামই করা যায়। মাটির পরিবেশেই তাঁরা 'শিক্ষা'লাভ করেছিলেন। এখনকার পশ্চিমবঙ্গ/ভারতের মতো উচ্চ-ন্যায়ালয়ের নির্দেশবাহিত হয়ে শিক্ষার্থীর মাথার ওপর বিষয় বোঝা হিসেবে 'পরিবেশ শিক্ষা' নেমে আসেনি। সে যে কেমন শিক্ষা সে কথা থাক এখন। তবে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের শিক্ষাকে যদি গুরুত্ব দিতে হয় দেশের 'পরিবেশ-শিক্ষা'র বর্তমান মাটিতে মাথা-পা-উঁচু অবস্থাকে উল্টে মাটিতে পা রেখে 'পরিবেশে' শিক্ষার স্বাভাবিকতায় নিয়ে যাবার কথা ভাবতেই হবে আমাদের। পরিবেশকে এখন বলা হয় মানব-সমাজ ও প্রকৃতির মধ্যে সেতু। জড় ও জীবনের সেতু হিসেবেও দেখা যায় পরিবেশকে। সেই অর্থে বিশেষ কোনো সমাজের ইতিহাসে বিজ্ঞানের অবস্থার অনুসন্ধানও পরিবেশচর্চা। বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র ভারতে সেই চর্চারও পথপ্রদর্শক। তাঁর *আ হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি* একদিকে আমাদের অতীত গৌরবের অংশীদার হবার সুযোগ করে দিয়েছে, অন্যদিকে ধারাবাহিক এই চর্চার মাধ্যমে নিজেদের ত্রুটি দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠারও পন্থা বাৎলে দিয়েছে। কিন্তু তাঁর সেই পরিশ্রম সার্থকতা লাভ করেনি। বিজ্ঞানে আমরা আমাদের নিজস্বতার বলিষ্ঠ স্বাক্ষর রাখতে পারিনি। কারণ সেই চর্চাটা আমরা ধরে রাখতে পারিনি।

ভারতের প্রথম ভারী রাসায়নিক শিল্প স্থাপনে, প্রফুল্লচন্দ্রের যে উদ্যোগ—যা 'বেঙ্গল কেমিক্যাল ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অনন্য নজির স্থাপন করেছিল, সেটির ক্ষেত্রেও তাঁর পরিবেশ সচেতনতার প্রভাব ছিল সুগভীর। 'বাংলার সর্বত্র প্রকৃতির যে অজস্র দান ছাড়াইয়া আছে, তাহাকে কিরূপে শিল্পের উপাদান রূপে ব্যবহার করা যায়? মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অনাহারক্লিষ্ট যুবকদের মুখে অন্ন যোগাইবার ববস্থা করা যায় কিরূপে?"—এই চিন্তা তাঁকে বিচলিত করেছিল শিক্ষক জীবনের গোড়াতেই।

বেঙ্গল কেমিক্যালের গড়ে ওঠা, বেড়ে ওঠা এবং সাফল্যের ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে আগাগোড়া তা পরিবেশ ভাবনায় সম্পৃক্ত ছিল। স্থানীয় কাঁচামাল, বর্জ্যকে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা, ভূমিপুত্রদের সাহায্যে, তাদের উদ্ভাবনীশক্তিকে কাজে লাগিয়ে এবং স্থানীয় বাজারের চাহিদা ও প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যে অবিচল থেকেছে বেঙ্গল কেমিক্যাল, প্রফুল্লচন্দ্র যতদিন জীবিত ও যুক্ত ছিলেন কোম্পানির সঙ্গে, ততদিন পর্যন্ত। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর সহজাত পরিবেশ চেতনায় ও বুদ্ধিতে, মাটি ও মানুষে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে, অনুশীলিত নিয়মানুবর্তিতায়, বেঙ্গল কেমিক্যালের জন্য এমনই সব নীতি পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন যেগুলিকে— আমাদের পরিভাষায় বলা যায় স্থিতিশীল শিল্প ও উন্নয়নের পথ। স্বদেশী ও স্বনির্ভরতার ভাবনায় উজ্জীবিত ও চালিত হয়ে কারখানার সর্বস্তরের কর্মীরা নানা উদ্ভাবনের অংশীদার হতে পেরেছিলেন। নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা-গবেষণা ও উদ্ভাবন ছিল নতুন নতুন পদ্ধতি ও প্রোডাক্টের পেছনে। এ ভাবেই বেঙ্গল কেমিক্যাল উদ্ভাবিত হতে পেরেছিল লোহার পাতের উপর সিসের প্রলেপ লাগানোর পদ্ধতি। আর সে কারণেই সম্ভব হয়েছিল সালফিউরিক

(এরপর ৫০ পাতায়

জ্ঞানোন্নতি ও ভারতের অধঃপতন

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

এ-বছর রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্ম সার্ধশত বর্ষ। রবীন্দ্রনাথ নিয়ে অনেক উদ্দীপনা কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্রকে আমরা প্রায় ভুলে গেছি। অতি কর্মঠ এই মানুষটির চিন্তাধারা আজও ভীষণ প্রাসঙ্গিক। আমরা তাঁকে স্মরণ করলাম তাঁরই একটি রচনার পুনরমুদ্রণ (*নব্য রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি* গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধ ''জ্ঞানোন্নতি ও ভারতের অধঃপতন''-এর প্রথমাংশ) এবং তাঁর বিষয়ে একটি রচনা প্রকাশ করে।

চিরপ্রচলিত সংস্কার মানব-হৃদয়ে এরূপ প্রবল আধিপত্য করিয়া থাকে যে কোনরূপ নূতন স্বাধীন চিন্তা সহজে উহার মধ্যে স্ফূর্তি পায় না। বংশপরম্পরাগত সংস্কারে আবদ্ধ হইয়া মানবাত্মা একরূপ জড়বৎ হইয়া পড়ে। পুরাকালের খ্যাতনামা মনস্বীগণের বাক্যের উপর সাধারণ লোকের ভক্তি ও বিশ্বাস এমন বদ্ধমূল যে, সহজে কেহ তাহার প্রতিকূলে কার্য করিতে সাহসী হয় না। শত সহস্র বৎসর পূর্বে যে সব ব্যবস্থা ও মত প্রচারিত হইয়াছিল, অদ্যাপি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সকলে তাহার অনুসরণ করিতেছে। অবশ্য মধ্যে মধ্যে কোন কোন স্বাধীনচেতা মহাত্মা ঐ সকল আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে চেষ্টা করিলেও পুরাতন মতের প্রতিপোষক (গোঁড়া) দিগের ভীষণ আন্দোলন তাহাদের সেই ক্ষীণ প্রতিবাদ সমাজে প্রচারিত হইতে পায় নাই।

সময়ে সময়ে জগতে এক একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। তাঁহারা অজ্ঞাত তিমিরে জন্মগ্রহণ করিয়াও স্বীয় আলোকসামান্য প্রতিভাবলে প্রকৃষ্ট পথ দেখিতে পান। পৃথিবী সৃষ্টির কেন্দ্রস্থলে, আর চন্দ্র সূর্যাদি গ্রহমণ্ডলী নিত্য ইহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে ইত্যাদি মত টলেমি ও পিথাগোরাসের সময় হইতে ইউরোপে প্রচলিত ও স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিল। কোপারনিকাস এই মতের প্রতিবাদ করিয়া এই পুস্তক লিখিয়াছিলেন; কিন্তু ছত্রিশ বৎসর পর্যন্ত তিনি তাহা জনসমাজে প্রচার করিতে সাহসী হন নাই। ইহার কারণ তখন খৃষ্ট জগতে বাইবেল অভ্রান্ত বলিয়া গৃহীত ছিল। কোপারনিকাসের মত বাইবেল বিরুদ্ধ; এবং যাঁহারা কোন নূতন মত প্রচার করিতে চেষ্টা করিতেন তাঁহাদের জীবন অনেক সময় বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠিত। সে সময়ে Court of inquisition নামক ধর্ম-আদালতের সম্মুখে নবমতের প্রচারকগণকে নানারূপ প্রশ্ন করা হইত। তথায় তাঁহারা স্বকীয় নূতন মত প্রত্যাহার করিতে অস্বীকার করিলে তাঁহাদিগকে অমানুষিক ভীষণ যন্ত্রণা দিয়া অবশেষে জীবন্ত দগ্ধ করা হইত। এই সকল কারণে কোপারনিকাস সভয়ে লিখিয়াছিলেন যে আমি এমন কথা বলিতেছি না যে আমার মত যথার্থ; তবে পৃথিবীর আহ্নিক গতি ইত্যাদি আলোচনা করিয়া বোধ হয় সৌরজগতের গতিবিধি সম্বন্ধে প্রাচীন মত অপেক্ষা আরও সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে। ইহার পরিণাম তিনি যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহাই হইয়াছিল; অর্থাৎ আদালতের বিচারে তাঁহার মত সম্পূর্ণ ধর্মবিগর্হিত ও শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া অগ্রাহ্য হইয়াছিল। যাহা হউক, কোপারনিকাস প্রাণে বাঁচিয়া গেলেন। ইহার ৯০ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৬৩২ খৃ. অব্দে গালিলেও কোপারনিকাসের মত সমর্থন করিয়া আর একখানি পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার শোচনীয় পরিণাম সর্ব্বজনবিদিত।

মহানুভব রজার বেকন (খৃ. ১২১৪-১২৮৪) নানাপ্রকার রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়াছিলেন। সে সময়ের তুলনায় তাঁহাকে অসামান্য লোক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। সাধারণতঃ তিনি wizard বা ঐন্দ্রজালিক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কারণ তখন যাঁহারা এই বিদ্যার চর্চা করিতেন লোকে তাহাদিগকে ''যাদুকর'' বলিত। এই ঐন্দ্রজালিক বা পৈশাচিক বিদ্যা আলোচনা করার জন্য তখন বেকনকে অক্সফোর্ডের একটি নিভৃত কক্ষে চতুর্দ্দশ বৎসর কারারুদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল। যাঁহারা তখন প্রাকৃত-তত্ত্ব বা পদার্থবিদ্যা আলোচনা করিয়া জ্ঞানান্বেষণে ব্যাপৃত থাকিতেন, তাঁহাদিগকে এই প্রকারে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত।

পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে যে, জল অতি পুরাকাল হইতে মৌলিক পদার্থ এবং পঞ্চভূতের মধ্যে অন্যতম বলিয়া সাধারণের ধারণা ছিল। পরে কাবেন্ডিস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ রাসায়নিক পণ্ডিতগণের পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে, জল মৌলিক পদার্থ নয়, সম্পূর্ণ যৌগিক পদার্থ এবং দুইটি অদৃশ্য বায়বীয় পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন। আধুনিক সমুদয় মৌলিক পদার্থ সম্বন্ধেও সকলের এইরূপ ধারণা থাকা আবশ্যক। আমরা যে সকল পদার্থকে এখন মৌলিক পদার্থ বলিয়া গণ্য করিতেছি, তাহাদের মৌলিকত্ব সম্বন্ধেও এইরূপ সংশয় সহজেই আসিয়া থাকে। অর্থাৎ কোনো মৌলিক পদার্থ হইতে যদি কোনোরূপ অভিনব প্রক্রিয়া দ্বারা ভবিষ্যতে আরও নূতন পদার্থ আবিষ্কৃত হয়, তখন তাহার মৌলিকত্ব লুপ্ত হইয়া তাহাকে যৌগিক পদার্থ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। রবার্ট

রয়েল তাঁহার ''সংশয়বাদী রাসায়নিক'' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে সমস্ত মৌলিক পদার্থের পূর্ণ, সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব, অর্থাৎ যে সকল পদার্থকে অদ্যাপি কোনরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা বিশ্লিষ্ট করিতে পারা যায় নাই, তাহাদিগকে আপাততঃ মৌলিক পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তিনি কোনও শাস্ত্রকে অভ্রান্ত বলিয়া মানেন নাই এবং চিরপ্রচলিত অনেক মতের বিরুদ্ধে খড়্গ উত্তোলন করিয়া ভাবী জ্ঞানোন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়াছেন।

আমাদের ভারতবর্ষ যে ব্রাহ্মণশাসিত এবং জাতিভেদ ও শাস্ত্রবাদগ্রস্ত হইয়া চিরকাল কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল, এমন নহে। প্রাচীন ভারতেও অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি যথেষ্ট বলবতী ছিল এবং স্বাধীন চিন্তাস্রোত অপ্রতিহত ভাবে প্রবাহিত হইয়াছিল। এমন কি, মহর্ষি কপিল ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকার করেন নাই। কেননা ইহা সহজে সপ্রমাণ হয় না। কপিল তথাপি বেদের দোহাই দিয়াছেন। যাহা হউক ষড়্দর্শন ও উপনিষদে বেদ অভ্রান্ত ও অপৌরুষেয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, সুতরাং সমগ্র হিন্দুজাতির মুখ বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু চার্ব্বাক মুনি শ্রুতিও অগ্রাহ্য করিয়া ঘোষণা করিলেন:—

''কতিপয় প্রতারক ধূর্ত্তেরা বেদ সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে স্বর্গ নরকাদি নানাপ্রকার অলৌকিক পদার্থ প্রদর্শন করত সকলকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে এবং তাহারা স্বয়ং ঐ সকল বেদবিধির অনুষ্ঠান করত জনসমাজে প্রবৃত্তি জন্মাইয়াছে এবং রাজাদিগকে যাগাদিতে প্রবৃত্ত করাইয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিপুল অর্থ লাভ করিয়া স্বীয় স্বীয় পরিজন প্রতিপালিত করিয়াছে। তাহাদিগের অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া, উত্তরকালীন লোকসকল ঐ সমস্ত বেদোক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করাতে, বহুকাল অবধি এই প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। বৃহস্পতি কহিয়াছেন অগ্নিহোত্র, বেদাধ্যয়ন, দণ্ডধারণ ভস্মগুণ্ঠন এই সমস্ত বুদ্ধিপৌরুষহীন ব্যক্তিদিগের উপজীবিকামাত্র। বেদে লিখিত আছে, পুত্রেষ্টিযাগ করিলে পুত্র জন্মে, কারীরীযাগ করিলে বৃষ্টি হয়, শ্যেনযাগ করিলে শত্রুনাশ হয়। তদনুসারে অনেকেই ঐ সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন, কিন্তু কোন ফলই দৃষ্ট হইতেছে না। একস্থানে বিধি আছে সূর্য্যোদয় হইলে অগ্নিহোত্র যাগ করিবে, অন্য স্থানে কহিতেছে সূর্য্যোদয়ে হোম করিবেক না, যে ব্যক্তি সূর্য্যোদয়ে হোম করে, তাহার প্রদত্ত আহুতি রাক্ষসের ভোগ্য হয়। এইরূপ বেদে অনেক বাক্যের পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং উন্মত্ত প্রলাপের ন্যায় এক কথার পুনঃপুনঃ উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়। যখন এই সমস্ত দোষ দেখা যাইতেছে, তখন কি প্রকারে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা যাইতে পারে? অতএব, স্বর্গ, অপবর্গ ও পারলৌকিক আত্মা সমস্তই মিথ্যা এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি-আশ্রমের কর্তব্য কর্ম্ম সকলও নিষ্ফল। ফলতঃ অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্ম্ম সকল অবোধ ও অক্ষম ব্যক্তিদিগের জীবনোপায়মাত্র।

ধূর্ত্তেরা ইহাও কহিয়া থাকে যে, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে যে জীবের ছেদন হইয়া থাকে সে স্বর্গলোক গমন করে। যদি ঐ ধূর্ত্তদিগের ইহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকে, তবে তাহারা যজ্ঞেতে আপন আপন পিতা মাতা প্রভৃতির মস্তকচ্ছেদন না করে কেন? তাহা হইলে অনায়াসে পিতামাতার স্বর্গের নিমিত্ত শ্রাদ্ধাদি করিয়া বৃথা কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। আর শ্রাদ্ধ করিলে যদি মৃত ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, তবে কোন ব্যক্তি বিদেশে গমন করিলে তাহাকে পাথেয় দিবার প্রয়োজন কি? বাটীতে তাহার উদ্দেশে কোন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেই তাহার তৃপ্তি জন্মিতে পারে। অপিচ, এই স্থানে শ্রাদ্ধ করিলে যদি স্বর্গাস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, তবে অঙ্গনে শ্রাদ্ধ করিয়া প্রসাদোপরিস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি না হয় কেন? যাহাতে কিঞ্চিদুচ্চস্থিতের তৃপ্তি না হয় তবে তদ্দারা অত্যুচ্চ স্বর্গাস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? অতএব মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে যে সমস্ত প্রেতকৃত্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা ব্রাহ্মণদিগের উপজীবিকামাত্র, বস্তুতঃ কোন ফলোপধায়ক নহে।'' (সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ--- জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননকৃত অনুবাদ)। □

প্রফুল্লচন্দ্র ও পরিবেশ

(৪৮ পাতার পর)

অ্যাসিডের বাণিজ্যিক উৎপাদন। মেডিকেটেড তুলোর প্যাকিং পদ্ধতি ও যন্ত্র, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রও তৈরি হয়েছিল কারখানার ভেতরেই গবেষণা ও উদ্ভাবন-এর সূত্রে। বর্জ্য পদার্থ যেমন ফেলে দেওয়া লোহা, পশুর হাড়, স্থানীয় গাছ-গাছড়া ইত্যাদি কাঁচামাল উৎপাদিত পণ্য, রূপান্তরিত হয়ে সরবরাহ করতে পেরেছিল ঘরে ঘরে নিত্যব্যবহার্য ওষুধ-ভেষজ-প্রসাধনী, কৃষির জন্য সার, জল-শোষণের ফটকিরি, হাসপাতাল-স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গবেষণার জন্য অ্যালকোহল, জীবাণু সংক্রমণ থেকে সুরক্ষার ফিনিওল ইত্যাদি।

নিজেদের উপযোগী শিল্পের জন্য যে উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানুষের প্রয়োজন সেদিকেও ছিল তাঁর প্রখর দৃষ্টি ও প্রয়াস। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত রসায়ন বিভাগের প্রতিষ্ঠায় তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগ তো ঐতিহাসিকই বলা যায়।

মোটকথা প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর জীবনের কর্মে ও মননে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিপদক্ষেপে সমাজ ও পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধ থেকেছেন। সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহের মতই তাঁর মমত্ব স্বতঃউৎসারিত। তিনি শুধু বিজ্ঞানের শিক্ষক, গবেষক এবং অধীত অনুশীলিত বিদ্যার শিল্পরূপ দেবার কাণ্ডারি ছিলেন না। মানুষ ও পরিবেশকে সর্বদা মনে রেখে সৃজনশীল থাকার জন্য যেসব দিকে চর্চা করা দরকার তার প্রায় সবদিকে তিনি চালিয়েছিলেন তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টি। পশ্চিমী-বিজ্ঞানের নিরিখে তিনি ব্যতিক্রমী বিজ্ঞানীর তালিকাভুক্ত না-ই হতে পারেন, আমাদের দেশের, দেশের মানুষের, পরিবেশের নিরিখে তিনিই বিজ্ঞানী শিরোমণিদের অন্যতম।

আমরা প্রফুল্লচন্দ্রদের পুজো করেছি যতটা, ততটা চর্চা করিনি। তাঁকে ও তাঁর সময়কে বোঝার চেষ্টা করিনি। আর তাই অনায়াসে আমদানি করা কাঁচামাল, আমদানি করা প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি দিয়ে স্পর্শকাতর পরিবেশে শিল্প চাপিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হই না। পরিবেশ ও মানুষের সর্বনাশ ঘটিয়ে যে শিল্পের উৎপাদিত পণ্য মূলত বিদেশের বাজারেই বিকোবে। আবার ঘটা করে সেই ধ্বংসাত্মক শিল্পের নামের সঙ্গেও জুড়ে দিতে পারি প্রফুল্লচন্দ্রের নাম!

আধুনিক স্থিতিশীল শিল্প ও উন্নয়নের ভাবনায় প্রফুল্লচন্দ্র অত্যন্তই প্রাসঙ্গিক। এবং রবীন্দ্রনাথও। তাঁকে মনে রেখে, তাঁদেরকে মনে রেখে, মানুষ ওপরিবেশের জন্য, আমাদের নিজেদের বাঁচার জন্য, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সমস্ত ক্রিয়াকলাপের পরিবেশ-ভিত্তিকে সুস্থ ও উৎপাদনশীল রাখার জন্য নতুন করে চর্চা শুরু করা দরকার। তবেই যদি আমরা পারি শিক্ষায় গবেষণায়-শিল্পে, সমাজ সংস্কৃতিতে হেঁটমুণ্ড ঊর্দ্ধপদ এগোবার অস্বাভাবিক কসরৎ থেকে বিরত হয়ে মাটিতে পা রেখে মাথা উঁচু করে চলতে শিখতে। □

ফুকুশিমা ইতিহাসে সবচেয়ে বড় শিল্প বিপর্যয়

প্রদীপ দত্ত

ফুকুশিমা দাইচি পরমাণু চুক্তির বিপর্যয়ের আগে জাপানে প্রায় পঞ্চাশটি পরমাণু চুল্লি চালু ছিল। জাপানে মোট চুল্লির সংখ্যা ৫৪টি। এখন চালু রয়েছে মাত্র ১৭টি। মেরামতির জন্যও কয়েকটি চুল্লি বন্ধ ছিল। জনরোষের ফলে আঞ্চলিক সরকার সেসব চালু করার অনুমতি দিচ্ছে না। এখন সে দেশে শতকরা ১৫ ভাগ বিদ্যুতের ঘাটতি চলছে। বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়িতার মাধ্যমে তা মেটানোর চেষ্টা চলছে।

আসাহি মি শিমুরন পত্রিকার এক জনমত সমীক্ষায় শতকরা ৭৪ ভাগ মানুষ পরমাণু বিদ্যুতের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন। তার আগে ওয়াশিংটনের পিউ রিসার্চ সেন্টারের সমীক্ষায় একজনও পরমাণু বিদ্যুতের প্রসার সমর্থন করেননি।

জার্মানি জানিয়েছে, ২০২২ সালের মধ্যে ধাপে ধাপে সবকটি চুল্লি বন্ধ করে দেওয়া হবে। এখনই সে দেশের সাতটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া আরও ছ'টি চুল্লি মেরামতি ও সংস্কারের জন্য বন্ধ রয়েছে। অর্থাৎ ১৭টি চুল্লির মধ্যে এখন চালু রয়েছে মাত্র ৪টি। শতকরা ২৩ ভাগ বিদ্যুৎ জোগাত যে পরমাণু চুল্লি প্রায় তা ছাড়াই তাদের কিভাবে চলছে— এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। লক্ষ করুন ১৭টির মধ্যে মাত্র ৪টি চালু রেখেই কিন্তু জার্মানি সামলাচ্ছে। সে দেশে তেমন বিদ্যুৎ ঘাটতির কথা উঠছে না।

ওদিকে ১২ জুন ইতালিতে গণভোটে ৯৫ ভাগ মানুষ পরমাণু বিদ্যুতের বিষয়ে রায় দিয়েছেন। সে দেশে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্যোগ বাতিল হয়েছে। কিন্তু ১৯৮৭ সালে গণভোটের মাধ্যমে স্থির হয়েছিল ইতালিতে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে না। কিন্তু গত কয়েক বছরে ইতালির প্রধানমন্ত্রী সিলভিও বারলুসকনির নেতৃত্বে নতুন করে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ শুরু হয়। কিন্তু ফুকুশিমা বিপর্যয়ের পর পরমাণু বিদ্যুৎ প্রসারের উদ্যোগে পাকাপাকি ভাবে ছেদ পড়ল।

ইতালির প্রধান দৈনিক পত্রিকা *L'Espresso* এ বছরের ১৮ মার্চ এক প্রবন্ধে বেশ কয়েকটি মার্কিন কূটনৈতিক তারবার্তা প্রকাশ করে। তা থেকে বোঝা যায় ইতালির ভবিষ্যৎ শক্তি শিল্পে ঘুষের প্রভাব কত বেশি। উইকিলিকস সূত্রে পাওয়া ওই নথিতে দেখা গেছে, ২০০5 সাল থেকে চার বছর ধরে মার্কিন প্রচার শুরু হয়েছিল যাতে রাশিয়া থেকে গ্যাস আমদানি কমিয়ে ইতালি নতুন করে পরমাণু বিদ্যুৎ কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই উদ্দেশে ইতালির নানা কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রে আমেরিকা-ফরাসী পরমাণু সংস্থা ইডিএ ও আরেভার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে সফল হয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী বারলুসকনি চাইছিলেন, ইতালি পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পথে ফিরে আসুক। চেরনোবিল দুর্ঘটনার পরের বছর, ১৯৮৭ সালে গণভোটের মাধ্যমে সে দেশের চারটি নির্মীয়মান পরমাণু চুল্লির কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ২০০৭ সালে ফের ইতালি ৪টি পরমাণু চুল্লি স্থাপনের জন্য ফ্রান্সের শরণাপন্ন হয়। কথা ছিল প্রথমটির নির্মাণ ২০২০ সালর মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।

ইতালিতে প্রাকৃতিক সম্পদ প্রায় নেই। তাদের শতকরা ৮৬ ভাগ বিদ্যুৎ আমদানি করতে হয়। তা সত্ত্বেও তারা বিদ্যুৎ চুল্লি স্থাপনের উদ্যোগ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বারলুসকনি বলেছেন, ইতালি নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনের ওপর জোর দেবে।

সুইজারল্যান্ডের শতকরা ৩৯ ভাগ বিদ্যুৎই পরমাণু চুল্লি থেকেই উৎপাদিত হয়। অথচ এ বছরের ২৫ মে সে দেশের ফেডারেল কাউন্সিল পরমাণু বিদ্যুৎ ধাপে ধাপে বন্ধ করে দেবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেখানে শক্তির খরচ কমানো, শক্তি গবেষণায় গুরুত্ব দেওয়া, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও নবীকরণযোগ্য শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নানা ধরণের বিদ্যুৎ সরবরাহে জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। শক্তি মন্ত্রীর মতে, পরমাণু বিদ্যুৎ ভবিষ্যতের প্রযুক্তি নয়। তাছাড়া পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন নিরাপদ রাখতে দিন দিন খরচ বাড়ছে।

পার্লামেন্ট সদস্যদের বেশির ভাগ তাদের আগের অবস্থান বদলে এখন পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিরোধিতা করছেন। এর মূল কারণ, আগামী শরতে ভোট। জাপানের পরমাণু বিপর্যয়ের পর সুইজারল্যান্ডের ভোটারদের মধ্যে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, দেশের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ বিদ্যুতের দাম বাড়লেও পরমাণু বিদ্যুৎ থেকে দূরে থাকতে চান বলে জানিয়েছেন। এক-তৃতীয়াংশ মানুষ পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন দ্রুত বন্ধ করে দেবার পক্ষে।

গত মে মাসে পরমাণু বিদ্যুতের বিরুদ্ধে এক বিক্ষোভে ২০ হাজার মানুষ জড়ো হয়েছিলেন। নানান স্থানে বিক্ষিপ্ত প্রতিবাদও চলছে। বার্ন-এ পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদক বিকেডব্লু-র হেডকোয়ার্টারের উল্টো দিকে এপ্রিল মাস থেকে দেড় মাসের বেশি ধর্নায় বসেছিলেন পরমাণু বিরোধীরা।

ফুকুশিমা বিপর্যয়ের আগে ঠিক ছিল ২০২৫ সালের মধ্যে ১৬০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার তিনটি পরমাণু চুল্লি স্থাপনের জন্য ২০১৩ সালে সুইজারল্যান্ডে গণভোট নেওয়া হবে। শক্তি ও পরিকাঠামো মন্ত্রক নতুন শক্তি আইন অনুযায়ী বাধ্যতামূলক আলোচনা প্রক্রিয়া শুরু হবে। ঠিক ছিল তা থেকে শেষে গণভোট নেওয়া হবে। সুইজারল্যান্ডে সমুদ্রের উপকূল নেই, তাই সুনামির সম্ভাবনাও নেই। তবে পাহাড়ের উপর বিশাল ড্যাম ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা, ভূমিকম্প ও হিউম্যান এররের সম্ভাবনা রয়েছে।

ফেডারেল কাউন্সিল ৫টি চালু চুল্লি ধাপে ধাপে

বাতিল করা এবং ভবিষ্যতের শক্তির জোগান নিয়ে নতুন সমীক্ষার কথা বলে। (শক্তি ও পরিকাঠামো মন্ত্রী ডরিস লিউনার্ড অন্তত একটি নতুন চুল্লি স্থাপনের সমর্থক ছিলেন)। এর আগে ১৯৮৪ সাল থেকে পরমাণু বিদ্যুৎ নিয়ে তিনবার গণভোট নেওয়া হয়েছে। কোনো ক্ষেত্রে পরিষ্কার সিদ্ধান্তে আসা যায়নি। তবে ১৯৮৬ সালে চেরনোবিল দুর্ঘটনার চার বছর পর ১৯৯০-এর ভোটে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্থিতাবস্থা জারী করা হয়েছিল।

গত কয়েক বছর ধরে সুইস গ্রিনপার্টি এক নতুন উদ্যোগ শুরু করেছিল। যদি তারা ক্ষমতায় আসে সেক্ষেত্রে নতুন পরমাণু চুল্লি নির্মাণ বন্ধ করে দেবে, পুরনো চুল্লির মেয়াদকাল ৪০ বছরের চেয়ে বাড়াবে না। এবং ২০২৪ সালের মধ্যে ধাপে ধাপে সব চুল্লি বন্ধ করে দেবে। সোসালিস্ট পার্টিও পরমাণু চুল্লির বিরোধিতা শুরু করেছিল। সাম্প্রতিক কালে বেশির ভাগ সংবাদপত্র ও রক্ষণবাদী রাজনীতিকরা পরমাণু শক্তির বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন ফুকুশিমা বিপর্যয়ের আগে তা ভাবা যেত না। ফুকুশিমা বিপর্যয়ের দু'সপ্তাহ পরে মতামত সমীক্ষায় জানা গেছে শতকরা ৮৭ ভাগ নাগরিক পরমাণু চুল্লি ধাপে ধাপে বন্ধ করে দেওয়ার পক্ষে।

ফেডারেল কাউন্সিলের নতুন শক্তি পরিকল্পনা এরই মধ্যে আলোচনার জন্য পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে পেশ করা হয়েছিল। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে খসড়া আইন তৈরি করে পার্লামেন্টে পেশ করা হয়েছে। নতুন পরিকল্পনায় ২০৫০ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়িতা ও দক্ষতা বাড়িয়ে বিদ্যুতের ব্যবহার শতকরা পঞ্চাশভাগ কমিয়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে নবীকরণযোগ্য শক্তিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ছোট্ট দেশ সুইজারল্যান্ড জল বিদ্যুৎ বা বায়ু কি সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের পক্ষে অনুপযুক্ত। পাহাড়ের ওপর বাঁধ তৈরি করতে গেলে সে দেশে আপত্তি ওঠে। তাই ন্যাশনাল কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, নতুন আসন তৈরি করে শক্তি উৎপাদনের জন্য বিলম্ব দূর করা হবে।

ভৌগোলিক অবস্থানের বিচারে চিন জাপানের খুবই কাছের দেশ। বিপুল সংখ্যক চিনা নাগরিক কর্মসূত্রে জাপানে থাকেন। তাই অসংখ্য চিনা নাগরিক পরমাণু সংকটের দিকে উদ্বিগ্ন হয়ে নজর রেখেছেন।

১৬ মার্চ চিন সরকার জাপানের পরমাণু সংকট ও নিজেদের পরমাণু পরিকল্পনা নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের স্টেট কাউন্সিল মিটিং ডেকেছিল। সেখানে পরমাণু বিদ্যুৎ নিয়ে কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রথম, নতুন চুল্লি স্থাপনের পরিকল্পনা সরকার মুলতুবি রাখবে, দ্বিতীয়, যেসব চুল্লি তৈরির কাজ চলছে সেখানে নিরাপত্তার ঝুঁকির কথা নতুন করে বিবেচনা করা হবে। নিরাপত্তার ত্রুটি থাকলে নির্মাণের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হবে। তৃতীয়ত, যেসব চুল্লি চালু হয়েছে তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হবে।

সরকারের সিদ্ধান্ত, পরমাণু নিরাপত্তাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে। চিন পরমাণু নিরাপত্তা পরিকল্পনা তৈরি করবে এবং মধ্যবর্তী ও দীর্ঘকালীন পরমাণু উন্নয়নের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করবে। যেসব ক্ষেত্রে প্রাথমিক কাজ হয়ে গেছে সেই চুল্লি স্থাপনসহ সব নতুন পরমাণু পরিকল্পনাই মুলতুবি থাকবে। সংবাদমাধ্যমকে জাপানের পরমাণু সংকটের খবর ছাপানোর ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। এই প্রথম পরমাণু বিদ্যুতের সমস্যা ও ঝুঁকি নিয়ে বিস্তর আলোচনা চলছে। পরমাণু বিশেষজ্ঞদের টেলিভিশনের আলোচনায় মতামত দিতে ডাকা হচ্ছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তারা পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনের সমর্থক। কিন্তু এই উপলক্ষে সাধারণ মানুষের বিপুল উদ্বেগও ধরা পড়েছে। দেখা গেছে চিনা নাগরিকদের মধ্যে পরমাণু শক্তির প্রবল বিরোধিতা রয়েছে।

চিনা ভাষায় দৈনিক পত্রিকা *সাদার্ন*, *মেট্রোপলিটন ডেইলি* চিনের চালু নির্মীয়মান ও পরিকল্পিত পরমাণু চুল্লির মানচিত্র প্রকাশ করেছে। সাধারণ মানুষ অনেক পরমাণু চুল্লির অবস্থান ও নির্মাণের কথা এই প্রথম জানতে পারলেন। দ্বিভাষিক ওয়েবসাইট 'চায়না ডায়ালগ'-এ চিনের পরিবেশ ও উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করা হয়। সেখানে 'চায়নাদু নিউক্লিয়ার ফিউচার' শিরোনামে চিনের পরমাণু বিদ্যুৎ নিয়ে একের পর এক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে। সেখানে চিনের পরমাণু নীতি ও তার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 'গ্রিনআর্থ ভলান্টিয়ার্স' সংগঠন সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করেছে পরমাণু নিরাপত্তার কথা নিয়ে। ঝাও ইয়ামিন ১৬ মার্চ সেখানে চিনের উন্নয়ন নিয়ে বক্তব্য রাখেন। শ্রোতা ও সাংবাদিকের সংখ্যা ছিল বিপুল। তারা চিনের পরমাণু পরিকল্পনা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে একের পর এক প্রশ্ন রাখেন। ২৫ মার্চ হেইনরিখ বোল ফাউন্ডেশন বেজিং-এ সেমিনারের আয়োজন করে। সন্ধ্যায় মোমবাতি জ্বালিয়ে ওই দুর্ঘটনা স্মরণ করা হয়। অবশ্য এই কর্মসূচিতে যারা অংশ নিয়েছিলেন পরে সেই ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্য ও সামাজিক যোগাযোগ নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জেরা করে।

লায়োনিং প্রদেশের হোনগিহানের পরমাণু কেন্দ্রের নীচে রয়েছে তান-লু ফল্ট লাইন, যা সরকারি নথি বা সরকারি প্রচার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়নি। ওই কষ্টের কথা প্রথম জানা যায় ডালিয়ানের পরমাণু শক্তি বিরোধী কর্মীদের কাছে।

জল বিদ্যুতের প্রবক্তারা চিনের পরমাণু বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষকে মার্কিন পরমাণু প্রযুক্তি বিক্রির ফাঁদে পা দেবার কথা তুলেছেন। ফুকুশিমা সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে জল বিদ্যুতের জন্য বেশি বিনিয়োগ ও আকর্ষণীয় নীতি তৈরির কথা বলেছেন।

নতুন পরমাণু চুল্লি নির্মাণে মার্কিন প্রশাসনের শক্তির উদ্যোগ, আকর্ষণীয় সরকারি ভর্তুকি ও ছাড় এবং প্রচারের ফলে কয়েক বছরে তা মার্কিন জনসাধারণের কিছুটা সমর্থন পেয়েছিল। কিন্তু ফুকুশিমা বিপর্যয়ের পর আবার মার্কিন জনতা নতুন নির্মাণ ও করদাতাদের অর্থে পরমাণু শিল্পকে সাহায্য করার বিপক্ষে। চালু চুল্লি নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে।

*এবিসি নিউজ*ও *ওয়াশিংটন পোস্ট* পত্রিকা ২০ এপ্রিল, ২০১১, এক জনমত সমীক্ষার ফল প্রকাশ করে। দেখা গেছে শতকরা ৬৪ ভাগ নতুন চুল্লি নির্মাণের বিপক্ষে। পক্ষে মাত্র ৩৩ ভাগ। শতকরা ৪৭ ভাগ পরমাণু বিদ্যুতের তীব্র বিরোধী। ২০ ভাগ পরমাণু চুল্লি স্থাপনের তীব্র সমর্থক। রিপাবলিকান ডেমোক্রাট বা নির্দল— সব পক্ষের বড় অংশই পরমাণু বিদ্যুতের বিপক্ষে তার আগে অন্য এক জনমত সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল, শতকরা ৭৫ ভাগ মানুষ করদাতাদের অর্থে নতুন চুল্লির জন্য লোন গ্যারান্টির বিরুদ্ধে। এত বিরুদ্ধতার পরও প্রশাসন এ নিয়ে তাদের মতামত বদলাতে রাজি নয়। মার্চ মাসের মাঝামাঝি মার্কিন নিউক্লিয়ার রেগুলেটরি কমিশন (এনআরসি) যখন ফুকুশিমা চুল্লি থেকে ৫০ মাইল (৮০ কিলোমিটার) ব্যসার্দ্ধের মধ্যে যে সব মার্কিন সেনা ও নাগরিক ছিলেন তাদের সরে যাবার পরামর্শ দিচ্ছে। একই সময়ে প্রেসিডেন্ট ওবামা পরিচ্ছন্ন শক্তির উৎস হিসেবে নতুন পরমাণু চুল্লি নির্মাণের জন্য আরও ৩৬ বিলিয়ন ডলার (৩৬০০ কোটি টাকা) লোন গ্যারান্টি দেবার কথা বলেছিলেন।

আমেরিকায় ফুকুশিমা চুল্লির মতো জেনারেল ইলেকট্রিকের মার্ক ওয়ান নক্সার ২৩টি চুল্লি চালু

রয়েছে, যার মধ্যে ২২টির মেয়াদকাল শেষ হয়ে যাবার পর সেগুলো আরও ২০ বছর চালু রাখার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। কংগ্রেসের শুনানিতে একের পর এক কংগ্রেস সদস্য বলেছেন—মার্কিন চুল্লি নিরাপদ, সেখানে বিপর্যয় ঘটবে না।

ফুকুশিমা পরমাণু বিপর্যয়ের পর এন আর সি আমেরিকার সবচেয়ে বিতর্কিত ভার্মন্ট প্রদেশের ভার্মন্ট ইয়াঙ্কি চুল্লির মেয়াদ ২০ বছর বাড়িয়ে দেয়। অথচ ভার্মন্ট প্রশাসন আগামী বছর এই চুল্লি বন্ধ করে দেবে বলে জানিয়েছে। ২০১২ সালে তার মেয়াদকাল শেষ হবে। এই চুল্লিটি জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানির মার্ক ওয়ান, ঠিক ফুকুশিমা চুল্লির মতো। ওই পরমাণু কেন্দ্র বন্ধ করতে সেখানে আইনি লড়াই শুরু হয়েছে।

সেনেটে ফুকুশিমা পরবর্তী প্রথম কাজ হবে এমন এক বিল পাশ করানো যার মাধ্যমে ছোটো মডিউলার পরমাণু চুল্লি উন্নয়নে সাহায্য করা হবে। সরকার সেক্ষেত্রে চুল্লির নকশা তৈরির খরচের অর্দ্ধেক বহন করবে। একে বলা হচ্ছে মার্কিন নেক্সট জেনারেশন নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট (এনজিএনপি)। এখন তা নানা বাধার মুখোমুখি হচ্ছে। একাজে ডিপার্টমেন্ট অফ এনার্জি (ডিওই) খরচের একাংশ বহন করার জন্য প্রাইভেট বিনিয়োগ এখনো খুঁজে পায়নি। ২০০৫-এর এনার্জি পলিসি অ্যাক্টের মাধ্যমে এনজিএনপি কর্মসূচি শুরু হয়েছিল। সেই আইনে বলা হয়েছে তাপ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে, গ্যাস শীতক চুল্লি তৈরি করতে এনজিএনপি প্রকল্পের খরচের অর্দ্ধেক বহন করবে প্রাইভেট বিনিয়োগকারী।

এনজিএনপি জোটের মতে, আইন অনুযায়ী ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে যে ডেমনস্ট্রেশন প্ল্যান্ট তৈরি করার কথা অর্থের ঘাটতিতে তা অথৈ জলে পড়েছে। এনজিএনপি জোট হলো উচ্চ তাপমাত্রায় চুল্লি বাণিজ্যিকীকরণের জন্য চুল্লির উন্নয়নের কাজে যারা যুক্ত, পেট্রোকেমিক্যাল কোম্পানি ও পরমাণু বিদ্যুৎ পরিষেবার মতো সম্ভাব্য চুল্লি ব্যবহারকারীদের নিয়ে গঠিত জোট। ডিওই-র মতে ওই সময়সীমা মানা সম্ভব নয়। কারণ প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান দিল না বলে নক্সা ও লাইসেন্স দেওয়ার বিষয় পর্যালোচনার কাজ ঠিক ঠিক ভাবে এগোয় নি।

অন্যদিকে এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সি আমেরিকায় ফুকুশিমা তেজস্ক্রিয় বিকিরণ জড়িয়ে পড়ার ওপর নজরদারি বন্ধ করেছে, যদিও তারপরও হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে ও ক্যালিফোর্নিয়ায় দুটোর বেশি তেজস্ক্রিয়তার সন্ধান পাওয়া গেছে। ওবামা প্রশাসন মুখে যা-ই বলুক, এরই মধ্যে ফুকুশিমা বিপর্যয়ের প্রভাব সেদেশের সাধারণ মানুষ ও রাজনৈতিক নেতাদের ওপর পড়তে শুরু করেছে।

এনআরজি এনার্জি দক্ষিণ টেক্সাসে দুটি চুল্লি স্থাপনের পরিকল্পনা থেকে সরে এসেছে। এই প্রকল্পের অর্থ জোগানোর কথা ছিল মার্কিন ডিওই ও জাপান ব্যাংক ও ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশনের (জেবিআইসি)। জেবিআইসি-র এখন সেই ক্ষমতা নেই। তাছাড়া জাপান সরকার এখন আর পরমাণু চুল্লি নির্মাণে আগ্রহী নয়। এন আর জি-র অন্য পার্টনার তোশিবা ওই প্রকল্প চালু রাখার চেষ্টা চালিয়ে গেলেও তারা বিদেশি কোম্পানি বলে সে কাজের লাইসেন্স পাবে না। কাজেই লোন গ্যারান্টির সুবিধা তারা পাবে না। নিজেদের খরচেই তাদের নির্মাণের কাজ করতে হবে।

মেরিল্যান্ড ইউনিস্টার নিউক্লিয়ার্স ক্যালভার্ট ক্লিফ-থ্রি প্রকল্প বাতিল করতে চলেছে। মেরিল্যান্ড ইউনিস্টারের পার্টনার কনস্টেলেশন এনার্জি গতবছর ওই প্রকল্প থেকে সরে এসেছে এবং তাদের শেয়ার ইলেকট্রিসাইট দ্য ফ্রান্সকে (ইডিএফ) বিক্রি করেছে। তারাই এখন ইউনিস্টারের শতকরা ১০০ ভাগের মালিক। এপ্রিল মাসে এনআরসি জানিয়েছে, মার্কিন অ্যাটমিক এনার্জি অ্যাক্ট অনুযায়ী মার্কিন পরমাণু প্রকল্পের মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণ—কোনোটারই অধিকার নেই।

ফুকুশিমা পরবর্তীকালে আমেরিকার মেরিল্যান্ড ইউনিস্টারের পক্ষে মার্কিন পার্টনার খুঁজে পাওয়া ভার। বিশেষ করে এক্সেলন কনস্টেলেশন এনার্জির সঙ্গে তার মিশে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। এক্সেলন জানিয়েছে ক্যালভার্ট ক্লিফ-থ্রি প্রকল্পে প্রকল্পে তাদের কোনো আগ্রহ নেই।

ফুকুশিমার বিপর্যয়ের পর মার্কিন পরমাণু চুল্লি নিরাপদ কিনা এনআরসি তিন মাস ধরে তার পর্যালোচনা চালিয়েছে। এই অল্প সময়ের পর্যালোচনায় কম রদবদল করা হলেও ফের ছ'মাসের পর্যালোচনা শুরু হয়েছে। পুরো কাজটাই এনআরসি নিজেরাই করছে। সাধারণ মানুষ বেশি বেশি সংখ্যায় এই পর্যালোচনায় অংশগ্রহণ করছেন। তাই অনেকেরই ধারণা এই দ্বিতীয় পর্যালোচনা অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটাবে। কয়েকটি চুল্লি পাকাপাকি ভাবে বন্ধ হবে এবং নতুন চুল্লি নির্মাণের লাইসেন্স পেতেও দেরি হবে।

পরমাণু প্রকল্পের জন্য ঋণ হিসেব ৩৬ বিলিয়ন ডলার অনুমোদনের জন্য ওবামার অনুরোধ কংগ্রেস ২০১০ সালেও মানেনি। এ বছরও সে সম্ভাবনা আরও কম। কারণ ফুকুশিমা বিপর্যয়ের আতঙ্ক এবং বেশি কিছু কংগ্রেস সদস্যের মধ্যে অতিরিক্ত রাষ্ট্রীয়করণের বিরোধিতার মনোভাব।

আমেরিকার এক্সেলন কর্পোরেশন বারাক ওবামার নির্বাচনী প্রচার খরচের বড় অংশ জুগিয়েছিল। তখন ওবামা ইলিয়নসের সেনেটর ছিলেন। এক্সেলন তাই ২ লক্ষ ৬৯ হাজার ডলার দিয়েছে। প্রতিদানে ওবামা এক্সেলনের সিইও জন রোয়েকে পরমাণুর ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণের দিক নির্দেশের জন্য রিবন কমিশনে নিয়োগ করেছেন। অনেক বছর ধরে অনেক চেষ্টার পরও সেদেশে পরমাণু বিদ্যুতের প্রসার না ঘটলেও প্রশাসন এখনো হাল ছাড়েনি। তবে এখন আমেরিকার শতকরা ৭৫ জন নাগরিকের বিদ্যুৎ হিসেবে প্রথম পছন্দ সৌর বিদ্যুৎ এটাই আশার কথা।

তবে ফুকুশিমা বিপর্যয়ের পর ভারত কিন্তু দমেনি। গত কয়েক মাস ধরে ভারত কিছুটা থমকে থাকলেও, হরিপুরে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের আশায় রাজ্য সরকার জল ঢেলে দিলেও, মনে রাখতে হবে গত মার্চ মাসেই মহারাষ্ট্রের জইতাপুরে পরমাণু প্রকল্প বিরোধী আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে এক মৎস্যজীবী মারা গিয়েছেন। ব্যয়-সাপেক্ষ পরমাণু বিদ্যুতের তিনগুণ খরচে (মেগাওয়াট প্রতি ২১ কোটি টাকা) সেখানে ফরাসি কোম্পানি আরেভা-র চুল্লি স্থাপনের পরিকল্পনা বহাল রয়েছে। দেশের নানা স্থানে আরও চুল্লি স্থাপনের পরিকল্পনা অটুট রয়েছে। এরই মধ্যে কোডানকুলামের স্থানীয় বাসিন্দারা সেখানে নতুন করে দুটি পরমাণু চুল্লি স্থাপনের বিরোধিতায় অনশনে বসেছেন।

ভারতের সামনে এখন কঠিন লড়াই। কেন্দ্রীয় সরকার লোকসভায় জমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন বিল পাশ করাতে চলেছে। একবার তা পাশ হলে সরকার যেখানে যা চাইবে তাই করবে। মানুষের আপত্তি শুনবে না। তাই ভারতের মানুষের সামনে এখন কঠিন লড়াই।□

বিশ্বমূলের সন্ধানে যুগে যুগে

অজয় চক্রবর্তী

ডিমোক্রিটাস তাঁর ‘পরমাণুবাদ’-এর ভিত্তিতে হেরাক্লিটাস এবং পারমিনিদেসের আপাত-বিরোধী মতবাদের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। ডিমোক্রিটাসের মতে পরমাণুগুলি অবিভাজ্য এবং অপরিবর্তনীয়। পরমাণুর গতি এবং স্থানান্তরই সমস্ত জাগতিক পরিবর্তনের কারণ। কোনো পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই পদার্থের পরমাণুর পরিবর্তন ঘটে না। কাজেই, সমস্ত পরিবর্তনই আপাত পরিবর্তন। জড়-জগতের স্বরূপ অনুধাবনের ক্ষেত্রে ডিমোক্রিটাসের মতবাদ ছিল আতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।
— সম্পাদক

জ্যোতিষ্কদের জগতেই নিখুঁত গাণিতিক নিয়ম প্রত্যক্ষ করা যায়। প্লেটোর মতে জ্যোতিষ্কদের কক্ষপথ বৃত্তাকার কেননা বৃত্তই সবচেয়ে আদর্শ জ্যামিতিক আকার। প্লেটোর এই মতবাদে অনুপ্রাণিত হয়ে পরবর্তীকালে ইউডোক্সস (Eudoxos) প্রমুখ জ্যোতিবিজ্ঞানীরা আদর্শ বৃত্তাকার গতি থেকে আপাত বিচ্যুতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বহুসংখ্যক বৃত্তাকার গতির সমন্বয়ের কল্পনা করেছিলেন। এই প্রচেষ্টায় যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো জ্যোতিষ্কদের গতির যথার্থ ব্যাখ্যা দেবার উদ্দেশ্যে একদিকে যেমন নিখুঁত জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলো, অন্যদিকে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যায় সম্ভাব্য প্রকল্প গঠনের ঐতিহ্য তৈরি হলো। ধীরে ধীরে অবশ্য বোঝা গেল যে, আদর্শ বৃত্তীয় গতি-সংক্রান্ত প্রকল্পটি ত্রুটিপূর্ণ। তা সত্ত্বেও জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানান পর্যবেক্ষণলব্ধ উপাত্ত পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের পথ প্রশস্ত করেছে। এই দৃষ্টান্ত থেকে আরও বোঝা যায় যে, গ্রিক চিন্তায় বিজ্ঞান ও গাণিতিক বিচার-বিবেচনার যে সমন্বয় ঘটেছিল তা পরবর্তীকালে ভৌতবিজ্ঞানের গবেষণায় সুদূরপ্রসারী ভূমিকা নিয়েছিল।

মৌলিক পদার্থ সম্পর্কে প্লেটো

পরিশেষে মৌলিক পদার্থ সম্পর্কে প্লেটোর ধারণা প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলতে হবে। এমপিডক্লিজের মতো প্লেটোও স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, বিশ্বের সমস্ত পদার্থ অগ্নি, বায়ু, জল এবং মৃত্তিকা— এই চারটি মূল উপাদানে গঠিত। প্লেটো এই মৌল উপাদানগুলির ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য কণাগুলির আকৃতি সম্পর্কে তাঁর মতবাদ ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে, অগ্নির ক্ষুদ্রতম কণার আকৃতি চতুস্তলক, বায়ুর কণার আকৃতি অষ্টতলক, জলের কণার আকৃতি বিংশতলক এবং মৃত্তিকার কণার আকৃতি ঘনকাকার। কোন্ ভিত্তিতে প্লেটো মৌলকণাগুলির গঠন সম্পর্কে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তা সুস্পষ্ট নয়। কণাগুলির আকৃতি বস্তুতই প্লেটো-কল্পিত জ্যামিতিক আকৃতির অনুরূপ কিনা তা যাচাই করে নেবার কোনো উপায় নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্লেটোর জ্যামিতিক চিন্তা যতটা ফলপ্রসূ হয়েছিল, পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণাগুলির জ্যামিতিক আকৃতি সম্পর্কে প্লেটোর ধারণা ততটা ফলপ্রসূ হয়নি। এর কারণ সহজেই বোঝা যায়। জ্যোতিষ্কদের কক্ষপথ আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারি। কাজেই, এ-ব্যাপারে তাত্ত্বিক ধারণার সঙ্গে পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে। কিন্তু মৌলিক কণার গঠন সংক্রান্ত মতবাদের ক্ষেত্রে তত্ত্বের সঙ্গে পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যের এরূপ যোগাযোগ অনুপস্থিত। বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক এবং ভৌত আচরণে আমরা ওইসব পদার্থের বিভিন্ন ধর্ম প্রত্যক্ষ করি। এসব ধর্মের সঙ্গে মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণাগুলির আকৃতির বোধ করি কোনো সম্পর্কও আছে। কিন্তু এই সম্পর্ক তেমন প্রত্যক্ষ নয়। প্রতিনিয়ত আমরা যে-সব প্রাকৃতিক ঘটনা দেখি মৌলিক কণাগুলির জ্যামিতিক আকৃতির ভিত্তিতে তাদের ব্যাখ্যা করা যায় না।

পরবর্তীকালে মৌলিক পদার্থ এবং তাদের পরমাণু সম্পর্কে প্লেটোর ধারণার বিশেষ কোনো সমর্থন মেলে নি। তবে যে মূল ধারণার ভিত্তিতে প্লেটোর মৌলিক পদার্থের তত্ত্বটি গড়ে উঠেছিল তার সম্পর্কে এ কথা বলা যায় না। রেনেসাঁস (Renaissance) বা পুনর্জাগরণের সময় বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধানে গাণিতিক পদ্ধতির সফল প্রয়োগে বিজ্ঞানের যে দ্রুত উন্নতি হয়েছিল তা ঘটেছিল ঠিক সেই সময় যখন দর্শনের জগতে প্লেটোনীয় মতবাদের পুনরাবির্ভাব ঘটেছিল।

প্লেটোর মতবাদ নিয়ে আলোচনার পর যার প্রসঙ্গে আমাদের আলোচনা করতে হবে তিনি হলেন অ্যারিস্টটল, যার দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক মতবাদ বহুযুগ ধরে বৈজ্ঞানিক চিন্তাজগৎকে প্রভাবিত করেছিল। প্লেটো খুবই বড়ো মাপের দার্শনিক ছিলেন সন্দেহ নেই। গণিতচর্চার উন্নতিতে তাঁর দর্শন যতই ফলপ্রসূ হয়ে থাক, বৈজ্ঞানিক ধারণার উন্নতির ক্ষেত্রে অ্যারিস্টটল যতটা গুরুত্বপূর্ণ প্লেটোর ভূমিকা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কেননা,

অজড়ই ছিল প্লেটোর দার্শনিক অনুধ্যানের প্রধান বিষয়। প্লেটোর চিন্তায় জড়ের স্থান তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। অ্যারিস্টটলের দর্শনে এর বিপরীত ব্যাপারই লক্ষ করা যায়।

অ্যা রি স্ট ট ল

উত্তর গ্রিসের স্টাগিরা শহরে ৩৮৪ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে অ্যারিস্টটলের জন্ম হয়। তাঁর বাবা নিকোমাকুস ছিলেন মেসেডোনিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় অ্যামিন্টাসের চিকিৎসক। মেসেডোনিয়ার রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁদের পরিবারের এই যোগাযোগ অ্যারিস্টলের জীবনের নানান ঘটনা প্রবাহের ধারা নিয়ন্ত্রণ করেছিল। চিকিৎসকের পুত্র বলে এটাই স্বাভাবিক ছিল যে তিনিও তাঁর বাবার পেশাই বেছে নেবেন। অ্যারিস্টটলের বাবা কেবল একজন সুচিকিৎসকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন দক্ষ বিজ্ঞানী। অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে কী ভাবে জীবজগৎ সম্পর্কে নানান তথ্য এবং জ্ঞান আহরণ করতে হয় নিকোমাকুস তাঁর পুত্র অ্যারিস্টটলকে তা শিখিয়েছিলেন। অ্যারিস্টটলের পিতা তাঁর মনে যে অনুসন্ধান-স্পৃহা জাগিয়েছিলেন তা চিরকাল বজায় ছিল। অ্যারিস্টটল প্রকৃতির বহুবিধ বিষয়ে নানান অনুসন্ধান চালিয়েছেন—যেমন, উদ্ভিদ-জগৎ, প্রাণিজগৎ, শিলা, মেঘ, আবহাওয়া। অল্প বয়স থেকে অ্যারিস্টটল উদ্ভিদদেহে এবং প্রাণিদেহে কাঁটাছেড়া করে তাদের সম্পর্কে নানান মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছেন। ওই বয়সেই রোগীদের ওপর শল্যচিকিৎসার সময় তিনি তাঁর বাবার সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন। অ্যারিস্টটলের বাবা তাঁর ছেলের মধ্যে জীবনবিজ্ঞানে আগ্রহ এবং দক্ষতা লক্ষ করে অনুমান করেছিলেন যে, ছেলেও ভবিষ্যতে একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক হবেন। জ্ঞানের সুষম বিকাশের জন্য মানবিক বিদ্যারও প্রাথমিক জ্ঞান থাকা একান্ত দরকার হয়। তাই রোগী দেখার সময় বাবার সঙ্গে থাকা এবং তাকে সহায়তা করা ছাড়াও অ্যারিস্টটলকে স্কুলে যেতে হতো হোমার ও অন্যান্য কবিদের লেখার সঙ্গে পরিচিত হতে। সেইসঙ্গে সংগীত, নৃত্য ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে শিক্ষা নিতে। শিক্ষাকে সে-সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান মনে করা হতো। কিন্তু সে-সময় রাষ্ট্রীয় স্কুল ছিল না। ছাত্রদের অভিভাবকদেরই শিক্ষার সমস্ত ব্যয় বহন করতে হতো। তাই, সে-সময় দরিদ্র ছেলেমেয়েরা এবং ক্রীতদাসেরা আদৌ স্কুলে পড়তে পারত না। অ্যারিস্টটলের পিতা ছিলেন অর্থবান তাই অ্যারিস্টটলের সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা লাভ করা সম্ভব হয়েছিল। তখনকার দিনের শিক্ষাব্যবস্থা এখনকার মতো ছিল না। তখন ক্লাস হতো মুক্ত আকাশের নীচে। প্রকৃতির সান্নিধ্যে বসে। পুথিপত্রেরও তেমন প্রচলন ছিল না। বিদ্যা তখন ছিল গুরুমুখী। শিক্ষকের কাছে শুনে, তাকে নানান প্রশ্ন করে ছাত্ররা শিক্ষা লাভ করত। অবশ্য লিখতে পড়তেও তারা শিখত। প্রথম জীবনের প্রবণতা দেখে মনে হয়েছিল অ্যারিস্টটল তাঁর পিতার পেশাই গ্রহণ করবেন এবং চিকিৎসক হিসেবে সুদক্ষ হয়ে উঠবেন। যদি তাই হতো তবে তিনি হয়তো আর এক হিপোক্রিটাস হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি লাভ করতেন। কিন্তু তা হয়নি। বালক বয়সেই অ্যারিস্টটল তাঁর বাবা-মাকে হারালেন। যে-সব কঠিন ব্যাধির কোনো সুচিকিৎসা সে-সময় ছিল না তেমন কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েই তারা মারা যান। পিতৃমাতৃ-হীন হলেও অ্যারিস্টটলের আর্থিক সঙ্গতি ছিল। পিতার বিষয় সম্পত্তি থেকে তাঁর ভালো আয় ছিল। এছাড়া স্নেহশীল অভিভাবকও তাঁর ছিল। তাই বাবা-মা মারা যাবার পরেও তিনি পড়াশুনো চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। আঠারো বছর বয়সে অ্যারিস্টটল এথেন্সে যান এবং সেখানে প্লেটোর অ্যাকাডেমিতে ছাত্র হিসেবে যোগ দেন। অ্যারিস্টটল যখন প্লেটোর অ্যাকাডেমিতে যোগ দেন তার বিশ বছর আগে প্লেটো তাঁর অ্যাকাডেমির প্রতিষ্ঠা করেন, প্লেটোর অ্যাকাডেমিটি ছিল বর্তমান কালের বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো। গ্রিসের নানান স্থান থেকে ছাত্রছাত্রীরা এই অ্যাকাডেমিতে পড়তে আসত। এই অ্যাকাডেমিতে দর্শন, অঙ্ক, জ্যোতির্বিজ্ঞান, সংগীতশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি পড়ানো হতো। অ্যারিস্টটল যখন প্লেটোর অ্যাকাডেমিতে যোগ দেন তখন এটাই প্রত্যাশিত ছিল যে, তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রের জ্ঞানের পরিধি বাড়ানোর জন্যই এতে যোগ দিয়েছিলেন। জীবনধারণের জন্য যদি তাকে অর্থোপার্জন করতে হতো তবে হয়তো তিনি চিকিৎসাকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করতেন। যেহেতু তাঁর অর্থের অভাব ছিল না, তাই জীবনের উনিশ বছর তিনি প্লেটোর অ্যাকাডেমিতে কাটিয়েছিলেন— প্রথমে ছাত্র হিসেবে এবং পরে শিক্ষক হিসেবে।

প্লেটোর শিষ্য হলেও প্লেটোর দর্শনের সঙ্গে অ্যারিস্টটলের দর্শনের মৌলিক পার্থক্য ছিল। ইতালীয় চিত্রকর রাফায়েল তার 'স্কুল অফ এথেন্স' ছবিতে সুস্পষ্ট ভাবে প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের পার্থক্য এঁকেছেন নিপুণ হাতে। তাঁর ছবিতে অ্যারিস্টটল পার্থিব বিষয়ে চিন্তামগ্ন আর প্লেটোর অঙ্গুলি-নির্দেশ স্বর্গের দিকে। অ্যারিস্টটলের দর্শন বিচার করলে দেখা যাবে যে, তিনি পার্থিব বস্তু এবং ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। প্লেটোর মতে, জাগতিক বস্তু জ্ঞানের বিষয় হবার উপযোগী নয়। কিন্তু অ্যারিস্টটল প্লেটোর এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি।

অ্যারিস্টলের জ্ঞানের পরিধি ছিল বিশাল। তিনি তার সমসাময়িক কালে বিজ্ঞানের সমস্ত শাখাতেই সুপণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁর দার্শনিক মননে বিজ্ঞানের সমস্ত শাখার জ্ঞানই চিন্তাসূত্রে গ্রথিত হয়েছিল। তিনি তাঁর মতবাদকে এত দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে, এই মতবাদ বহু শতাব্দী ধরে বৈজ্ঞানিক মতবাদ গঠনের ক্ষেত্রে কাঠামোর মতো ব্যবহৃত হয়েছে। পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশের ধারণা সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের প্রভাব ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর কারণ অ্যারিস্টটলই সেই ব্যক্তি যিনি ডিমোক্রিটাসের পরমাণুবাদের উন্নয়নের পথে অনতিক্রমনীয় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। প্লেটোর জড়ত্ববাদ-বিরোধী ডিমোক্রিটাসের পরমাণুবাদের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী ছিল। তথাপি প্লেটো সরাসরি ডিমোক্রিটাসের পরমাণুবাদকে আক্রমণ করেন নি। ডিমোক্রিটাসের ভাবনার সঙ্গে প্লেটোর ভাবনার পার্থক্য এত বেশি যে, প্লেটো সরাসরি ডিমোক্রিটাসের মতবাদকে আক্রমণ করার কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নি। ভৌত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্লেটো কোনো মতবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন নি। অ্যারিস্টটল প্রকৃতি সম্পর্কে যে মতবাদ গঠন করেছিলেন তার সাহায্যে তিনি ডিমোক্রিটাসের মতবাদ উত্থাপন করে তাকে আক্রমণ করেছেন। এই কারণে অ্যারিস্টটলের লেখা থেকে ডিমোক্রিটাসের মতবাদ সম্পর্কে জানা যায়। অ্যারিস্টটলের লেখা ডিমোক্রিটাসের মতবাদের নির্ভরযোগ্য উৎস, কেননা ডিমোক্রিটাসের নিজের কোনো লেখা পাওয়া যায় না।

প্লেটোর মতো অ্যারিস্টটলও প্রধানত তিনি ডিমোক্রিটাসের পরমাণুবাদের দার্শনিক ভিত্তির বিরুদ্ধে আক্রমণ করেন, সরাসরি পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণার ধারণার বিরুদ্ধে নয়। প্রকৃতপক্ষে, পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা সম্পর্কে অ্যারিস্টটলেরও একটি স্বতন্ত্র তত্ত্ব ছিল, কিন্তু তিনি এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন নি। অবশ্য, পরবর্তীকালে অ্যারিস্টটলের অনুগামীরা তার ক্ষুদ্রতম কণার ধারণার পরিবর্তন

করেন। তবে, ডিমোক্রিটাসের তত্ত্বের মতো অ্যারিস্টটলের তত্ত্বে ক্ষুদ্রতম কণার ধারণা কখনও মুখ্য ভূমিকা নিতে পারে নি। ফলে বেশ কিছুকাল বিজ্ঞানের ইতিহাসে পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা সংক্রান্ত ধারণা গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছিল। বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য আমরা অ্যারিস্টটলের দর্শনের মূল কথাগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করব, কেননা অ্যারিস্টটলের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট না হলে বিশ্বের উপাদান সম্পর্কে তাঁর ধারণা কী ছিল তা বোঝা যাবে না।

কোনো দার্শনিককে বুঝতে হলে দুটি বিষয় আমাদের অনুধাবন করতে হয়। প্রথম জানতে হয় তাঁর পূর্বসূরীদের, যাদের মতামতের ভিত্তিতে তাঁর দর্শন গড়ে ওঠে এবং দ্বিতীয়ত বুঝতে হয় তাঁর বিরুদ্ধমতাবলম্বী দার্শনিকদের, যাদের মতবাদ খণ্ডন করে তিনি তাঁর দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করেন। অ্যারিস্টটলের ক্ষেত্রে এই দুই ভূমিকাই পালন করেন প্লেটো। প্লেটোই অ্যারিস্টটলের প্রধানতম পূর্বসূরী। আবার প্লেটোই তাঁর প্রধান বিরোধী যার দর্শনের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। প্লেটো ছিলেন অ্যারিস্টটলের গুরু। কাজেই, অ্যারিস্টটল প্লেটোর অনুসৃত পথেই তাঁর যাত্রা শুরু করেন। কিন্তু সেই সঙ্গে একটি স্বতন্ত্র মতবাদ গড়ে তুলে তিনি প্লেটোর ভাববাদকে বর্জন করেছিলেন। অ্যারিস্টটলের মতে, জগৎ একটি এবং তা হলো ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার জগৎ। এই জগৎই আবার আমাদের চিন্তনের জগৎ। কাজেই, অ্যারিস্টটল সরাসরি পারমিনিদিসের সংকটের বা সমস্যার মুখোমুখি হলেন। অ্যারিস্টটল অভিজ্ঞতাবাদী (empiricist) ছিলেন বলে দৃশ্যমান জগতের সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিবর্তনই বিভ্রম বা মায়া— একথা মানতে রাজি ছিলেন না। পরিবর্তন সংক্রান্ত সমস্যার কী সমাধান অ্যারিস্টটল দিয়েছিলেন সেই আলোচনায় প্রবেশ করার আগে আমাদের বুঝতে হবে, জ্ঞান-আহরণ প্রক্রিয়ায় ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে তা দেখবার জন্য অ্যারিস্টটল কীভাবে প্লেটোর ভাববাদের পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। অ্যারিস্টটল গভীর ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের সমস্ত জ্ঞানের ভিত্তি হলো ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা। এজন্য তাঁর পূর্বসূরী এবং সমসাময়িক দার্শনিকদের পরীক্ষালব্ধ তথ্যাদিকে তিনি তাঁর গ্রন্থাদিতে স্থান দিয়েছিলেন। প্লেটোর সঙ্গে তাঁর মৌলিক পার্থক্য ছিল এই যে, অ্যারিস্টটলের মতে অভিজ্ঞতাই মানুষের জ্ঞানের উৎসস্বরূপ। বিমূর্ত ধারণার জ্ঞান সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। অ্যারিস্টটলের মতবাদ অনুসারে বাস্তব বা মূর্ত বস্তুর অভিজ্ঞতা থেকেই বিমূর্ত ভাবনার সৃষ্টি হতে পারে। বিমূর্ত ভাবনা জন্মগত নয়, এদের বাস্তব-জীবন-নিরপেক্ষ অস্তিত্বও নেই। সর্বজনীন কল্পন (concept) হিসেবে কেবলমাত্র মানুষের মনেই এদের অস্তিত্ব আছে। ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার সাহায্যে বাস্তব বা মূর্ত জগতের বিষয় সম্পর্কে বিমূর্ত ধারণা গড়ে তোলার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অ্যারিস্টটল বলেছেন যে, একই জাতের বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে একটি সাধারণ সত্তা থাকে। এক জাতের বস্তুগুলির পেছনে একটি সাধারণ পরিকল্পনা লক্ষ করা যায় যা মানুষের মনে একটি সর্বজনীন কল্পন গড়ে তুলতে সাহায্য করে। বস্তুর যা কিছু স্বাতন্ত্র্য মণ্ডিত, যা কিছু মূর্ত তাদের বাদ দিয়ে যা সব বস্তুতেই বিদ্যমান কেবল তারাই সর্বজনীন কল্পন গড়ে তোলে। এই অর্থে অ্যারিস্টটল প্লেটোর সামান্য ধারণা গ্রহণ করেছিলেন। প্লেটোর সঙ্গে এ-ব্যাপারে তিনি একমত ছিলেন যে, বিজ্ঞানের কাজ হলো বিশুদ্ধ সামান্য ধারণা গঠন করা, শাশ্বত সত্য আবিষ্কার করা, কিন্তু মূর্ত বস্তুতেই এদের খুঁজতে হবে। কাজেই, সামান্য ধারণা 'গোরু' কেবল মানুষের মনে বিমূর্ত ভাবনা বা আকার (idea) হিসেবে বিদ্যমান থাকে, কিন্তু এই বিমূর্ত ভাবনা মূল পরিকল্পনা হিসেবে সমস্ত গোরুর মধ্যেই দেখা যায়। অর্থাৎ, সব গোরুর মধ্যে সামান্য গোরুর অস্তিত্ব আছে। তবে সামান্য গোরু বিশেষ বিশেষ গোরু থেকে স্বতন্ত্র হয়ে স্বাধীন ভাবে থাকতে পারে না। কিন্তু প্লেটো মনে করতেন যে, বিশেষ বিশেষ গোরু ছাড়াও এক সামান্য গোরুর অস্তিত্ব আছে। এখানেই প্লেটোর মতবাদ স্ববিরোধী। প্লেটো বলতেন, সামান্যই বাস্তব, বিশেষ হচ্ছে অলীক। কিন্তু আবার সামান্যকেই তিনি বিশেষের স্তরে নামিয়ে এনেছিলেন।

অ্যারিস্টটলের দর্শনে পরিবর্তনের সম্ভাবনা

ইন্দ্রিয়লব্ধ জগতের বাস্তবতা নিশ্চিত করে তিনি পারমিনিদিসের মতবাদের মুখোমুখি হলেন। অভিজ্ঞতায় আমরা সত্তার বহুত্ব দেখতে পাই। এই বহুত্ব কীভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? দ্বিতীয়ত, অসম্পূর্ণ সত্তার অস্তিত্বই বা কীভাবে সম্ভবপর হয়? এ প্রশ্ন উঠছে, কেননা এটা স্পষ্ট যে, সমস্ত বস্তুতেই সামান্য ধারণা বা ভাবের পূর্ণ প্রকাশ দেখা যায় না। পরিশেষে, পরিবর্তন কীভাবে সম্ভবপর হয়? অ্যারিস্টটল কেবলমাত্র অভিজ্ঞতালব্ধ বহুত্ব, অসম্পূর্ণতা এবং পরিবর্তনশীলতার কথা বলে পারমিনিদিসের অনুধ্যানকে এড়িয়ে যান নি। সমস্ত সত্তাই বুদ্ধিগম্য— পারমিনিদিসের এই মূল নীতিও তিনি বিস্মৃত হন নি। অ্যারিস্টটল অনুধাবন করতে চেয়েছিলেন কোন্ যুক্তিতে পারমিনিদিস সত্তার বহুত্ব, অসম্পূর্ণতা এবং পরিবর্তনশীলতার বাস্তবতা অস্বীকার করেছিলেন। পারমিনিদিসের মতবাদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রধান আপত্তি সম্পর্কে অ্যারিস্টটল বলেছিলেন, 'পারমিনিদিসের যুক্তি ভ্রান্ত ছিল কেননা তিনি সত্তাকে কেবলমাত্র একটি অর্থে ধরেছিলেন, যদিও এর একাধিক অর্থ আছে।' পারমিনিদিস বাস্তব সত্তা এবং তার আনুষঙ্গিক আপতিক সত্তার মধ্যে কোনো পার্থক্য করেন নি। তাই তিনি ভ্রান্ত। একটি সত্তায় থাকে বস্তুর প্রকৃত অস্তিত্ব, তাদের নিজস্ব সত্তা— যেমন, মানুষ, গোরু, ঘোড়া, জ্যোতিষ্ক ইত্যাদি। কিন্তু এর সাথে আছে বাস্তব সত্তার নানান গুণাবলী— যেমন তাদের আকার, আকৃতি, ধর্ম ইত্যাদি। এই আপতিক সত্তাগুলির অস্তিত্ব নেই, একথা বলা যায় না। কিন্তু বাস্তব সত্তা এবং আপতিক সত্তা অভিন্ন নয়। বাস্তব সত্তা বস্তুর মধ্যেই নিহিত থাকে, কিন্তু আপতিক সত্তা নিহিত থাকে ওই বস্তুর বাইরের অন্য কোনো কিছুর ওপর। যেমন— কোনো বস্তুর আকার নির্ভর করে অন্য কোনো নির্দিষ্ট আকারের কোনো মানদণ্ডের ওপর, কোনো বস্তুর বর্ণ নির্ভর করে দর্শনের বর্ণসচেতনতার ওপর ইত্যাদি। কাজেই, অ্যারিস্টটলের মতে বাস্তব সত্তা এবং আপতিক সত্তার পার্থক্য অবশ্যই করতে হবে। প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে যে, এই পার্থক্যের কথা বললেও অ্যারিস্টটল একথা বলতে চান নি যে, বহুসংখ্যক সত্তা আছে ; অর্থাৎ, ডিমোক্রিটাস-কল্পিত পরমাণুর মতো বহুসংখ্যক বিভিন্ন সত্তা আছে। যদি অ্যারিস্টটলের ধারণার সঙ্গে ডিমোক্রিটাসের ধারণার কোনো যোগসূত্র খুঁজতে হয় তবে ডিমোক্রিটাসের সত্তা এবং অসত্তার ধারণার নির্দেশ করতে হয়। ডিমোক্রিটাসের পরমাণুবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে একথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, ডিমোক্রিটাস বলেছেন : 'সত্তার যেমন অস্তিত্ব আছে, অসত্তারও তেমনি অস্তিত্ব আছে।' স্পষ্টতই এ উক্তি স্ববিরোধী, কেননা যার অস্তিত্ব

নেই তাকেই আমরা অসত্তা আখ্যা দিই। তবে, মনে হয় ডিমোক্রিটাস এখানে বলতে চেয়েছেন যে, সত্তার দুটি অর্থ আছে— পূর্ণতা এবং শূন্যতা। ডিমোক্রিটাসের উক্তিটি এ অর্থে ধরলে পারমিনিদিসের মতবাদ সম্পর্কে ডিমোক্রিটাসের সমালোচনা এবং অ্যারিস্টটলের সমালোচনা একই পথে যায়। যখন অ্যারিস্টটল পারমিনিদিসের সমালোচনা করেন এবং বলেন যে, সত্তার একাধিক অর্থ আছে তখনও তিনি সত্তার বহুত্ব আছে কিনা এ প্রশ্ন তোলেন না। বহুত্ব সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে অ্যারিস্টটল পরে আলোচনা করেছেন। বর্তমান প্রসঙ্গে তিনি কেবল এটাই দেখতে চান যে, পারমিনিদিস যাকে সত্তা বলেছেন তার বিভিন্ন অর্থ আছে— এই বিভিন্ন অর্থ বাস্তব সত্তার বিভিন্ন গুণাবলী নির্দেশ করে। অ্যারিস্টটল মনে করেন যে, প্রতিটি ধারণার পেছনে থাকে বাস্তব সত্তারই একটি বিশেষ ধর্ম। যদি এই ধর্মাবলীর পার্থক্যের ভিত্তিতে সত্তার পার্থক্য না করা হয় তবে পারমিনিদিসের সিদ্ধান্তকে সঙ্গত বলে মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে এ যুক্তি অসঙ্গত কেননা সত্তা রিয়ালিটির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়— এই স্বীকার্যই এর ভিত্তি। রিয়্যালিটি বোঝাতে সত্তার কোনো একার্থক ধারণা প্রয়োগ করা সম্ভব নয়, কারণ সত্তার বিভিন্ন দিক আছে।

অ্যারিস্টটলের মতে সত্তার অন্য দুটি পার্থক্যও গুরুত্বপূর্ণ। সত্তাকে তিনি দু'ভাগে ভাগ করেছেন— প্রচ্ছন্ন সত্তা (potential being) এবং প্রকৃত সত্তা (actual being)। 'বটগাছের বীজ একটি বটগাছ' এবং 'বটগাছের বীজ বটগাছ নয়'— এই দুটি উক্তিই সমান যুক্তিপূর্ণ। বটের বীজ বটগাছ হয়, এবং বলা বাহুল্য, বটগাছই হয়। কোনো পাথর কিংবা অন্য কোনো কিছু থেকেই বটগাছ হয় না। কাজেই, কেবলমাত্র সত্তা এবং অসত্তার পার্থক্য বিচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাই যথেষ্ট নয়। এই কারণে অ্যারিস্টটল দু'রকম সত্তার কথা বলেছেন— শক্যতাসম্পন্ন সত্তা (being-in-potency) এবং পূর্ণতাসম্পন্ন সত্তা (being-in-perfection)। কাজেই, আমরা যদি বটের বীজকে বটগাছ বলি তবে তা সত্য হবে যদি আমরা বটের বীজকে শক্যতাসম্পন্ন বটগাছ হিসেবে বুঝি, কিন্তু উক্তিটি মিথ্যা হবে যদি আমরা বটের বীজ বলতে পূর্ণতাসম্পন্ন বটগাছ বুঝি।

সুতরাং, শক্যতাসম্পন্ন সত্তা এবং অসত্তা এক নয়। শক্যতাসম্পন্ন সত্তা অসত্তাও নয়, আবার পূর্ণ সত্তাও নয়। সত্তা এবং অসত্তার এই পার্থক্যের ভিত্তিতেই অ্যারিস্টটল পরিবর্তনের বিশ্লেষণ করেন এবং দেখান যে, এই বিশ্লেষণের ফলে পরিবর্তন বুদ্ধিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে। পারমিনিদিস যে পরিবর্তনের বাস্তবতাকে অস্বীকার করেছিলেন এবং বলেছিলেন পরিবর্তন বুদ্ধির অগম্য— তার একটি কারণ হলো অসত্তা থেকে সত্তার আবির্ভাব হতে পারে না এবং দ্বিতীয় কারণ হলো, যা আছে তার আর সৃষ্টি হতে পারে না।

অ্যারিস্টটল পারমিনিদিসের এ উক্তি মেনে নিয়েছিলেন যে, পরম অসত্তা থেকে কোনো সত্তার আবির্ভাব হতে পারে না। কিন্তু পরিবর্তন অসম্ভব— একথা অ্যারিস্টটল মেনে নেন নি। কেননা, প্রচ্ছন্ন সত্তা থেকে সত্তার আবির্ভাব হতে পারে; যেমন, বটের বীজ থেকে বটগাছের; ওকের বীজ থেকে ওকগাছের সৃষ্টি হতে পারে। এই সম্ভূতি পরম অসত্তা থেকে সত্তার সৃষ্টি নয়। অ্যারিস্টটলের বিচারে সম্ভূতি এবং পরিবর্তন হলো শক্যতাসম্পন্ন সত্তা থেকে পূর্ণতাসম্পন্ন সত্তায় রূপান্তর। এ রূপান্তর শক্যতা থেকে পূর্ণতায় বিকাশ। এ পরিবর্তন বুদ্ধিগম্য।

সমস্ত রকমের পরিবর্তন অবশ্য এক রকমের নয়। অ্যারিস্টটল কীভাবে বাস্তবিক (sustantial) সত্তার সঙ্গে আপতিক (accidental) সত্তার পার্থক্য করেছিলেন সে-কথা আলোচনা করেছি। অ্যারিস্টটলের ওই ধারণার ভিত্তিতে দু'রকমের পরিবর্তনের সম্ভাবনার কথা বলা যায়— একটি হলো বাস্তবিক পরিবর্তন এবং অন্যটি হলো আপতিক পরিবর্তন। বাস্তবিক পরিবর্তনের একটি দৃষ্টান্ত হলো কোনো প্রাণীর মৃত্যু। মৃত্যুর পর প্রাণীর অস্তিত্ব থাকে না। যা থাকে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু— যাকে বোধকরি বলা যায় নানান রাসায়নিক যৌগের সংমিশ্রণ। এবার আপতিক পরিবর্তনের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। যখন কোনো প্রাণী ছোটো থেকে বড়ো হতে থাকে তখন প্রাণী হিসেবে এর পরিবর্তন হয় না। কেবল ওই প্রাণীর একটি আপতিক পরিবর্তন হয়। অ্যারিস্টটল দু'ধরনের পরিবর্তন পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিবেচনা করেছেন। তিনি কেবল একথা বলেই সন্তুষ্ট হন নি যে, পরিবর্তন আসলে শক্যতাসম্পন্ন সত্তা থেকে পূর্ণসত্তায় রূপান্তর কিংবা কোনো সত্তার কোনো আপতিক পরিবর্তন। এসব পরিবর্তনের সময় প্রকৃতপক্ষে কী ঘটে অ্যারিস্টটল তাও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

প্রথমে মাটি থেকে মূর্তি তৈরি করার কথা ধরা যাক। এই পরিবর্তন স্পষ্টতই একটি আপতিক পরিবর্তন কেননা মূর্তির আকারেও মাটি মাটিই থাকে। এক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ে পার্থক্য বিবেচনা করতে হয়। প্রথমটি হলো প্রাথমিক অবস্থা (পরিবর্তনপূর্ব অবস্থা), দ্বিতীয়টি হলো অন্তিম অবস্থা (পরিবর্তনোত্তর অবস্থা) এবং তৃতীয়টি হলো যার পরিবর্তন ঘটল সেই বিষয়। এক্ষেত্রে প্রাথমিক অবস্থা হলো মাটির আদি অবস্থা, অন্তিম অবস্থা হলো মাটির মূর্তিতে রূপান্তরিত অবস্থা এবং অবস্থার পরিবর্তনের অধীন পদার্থটি হলো মাটি। আদি অবস্থায় মাটির মধ্যে মূর্তিতে রূপান্তরিত হবার শক্যতা (potency) আছে। কাজেই, শক্যতাসম্পন্ন সত্তা থেকে পূর্ণতাসম্পন্ন সত্তায় রূপান্তর — পরিবর্তনের এই মৌলিক শর্ত এখানে পালিত হচ্ছে। এখন, প্রতিটি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এমন কোনো বিষয় অবশ্যই থাকবে যার পরিবর্তন ঘটে এবং যা আদি অবস্থার সঙ্গে চূড়ান্ত অবস্থার যোগসূত্র রূপে থাকে। অন্যথা পরিবর্তনের প্রশ্ন উঠত না, ধ্বংসের পর নতুন ভাবে সৃষ্টির প্রশ্ন উঠত। এক্ষেত্রে যোগসূত্র হলো মাটি। এই পদার্থটি অপরিবর্তিত থাকে। কাজেই, উক্ত পরিবর্তনে পদার্থগত কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। এই উক্তি থেকে অ্যারিস্টটলের অভিমত সম্পর্কে ভুল বোঝার সম্ভাবনা থেকে যায়। এই ভ্রান্তি এড়ানোর জন্য মনে রাখতে হবে হবে, অ্যারিস্টটলের চিন্তায় কোনো বস্তুর আকার বা রূপ এবং তার উপাদান অচ্ছেদ্য ভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। পদার্থের যেমন আকার বা রূপ আবশ্যক তেমনি আবশ্যক তার উপাদান। চিন্তায় এদের পৃথক করা গেলেও এদের স্বতন্ত্র অবস্থায় পাওয়া যায় না। অ্যারিস্টটলের মতে, সব দ্রব্যই রূপ এবং উপাদানের সমাবেশ। এই বিচারে আদি অবস্থার মাটি এবং মূর্তিতে পরিবর্তিত অবস্থার মাটি উপাদানগত ভাবে 'স্থায়ী' হলেও আকারগত পার্থক্যের দরুণ ওই মাটি এক নয়, কেননা আকার এবং উপাদান পরস্পর নিরপেক্ষ নয়। যখন কোনো দ্রব্যের বহিরাকারের পরিবর্তন হয় তখন ওই পরিবর্তন ওই দ্রব্যের একটি গঠনগত পরিবর্তন সূচিত করে। এতে পরোক্ষ ভাবে দ্রব্যের পরিবর্তনও সূচিত হয়। কথাটা এভাবেও বলা যায় : 'মাটির উপাদানগত পরিবর্তন না হলেও রূপগত পরিবর্তনের দরুণ মাটির পরিবর্তন ঘটে'। □

(এরপর আগামী সংখ্যায়

চেনা দেশ অচেনা মানুষ

মহানির্বাণ উপাধ্যায়

বইপত্র বা খবরের কাগজের পাতা থেকে বিদেশ সম্পর্কে আমাদের একটা ধ্যান-ধারণা গড়ে ওঠে এবং এই ধ্যান-ধারণার উপর ভিত্তি করেই এক একটা দেশ সম্পর্কে এক এক ধরণের ছবি আমাদের মনে গেঁথে যায়। চলচ্চিত্র, টিভি সহ বহু ধরণের পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে নানান দেশ সম্পর্কে আমাদের মনে গড়ে ওঠা এই সব ছবিগুলোই ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং আমরা ওই সব দেশ সম্পর্কে একবগ্গা ধারণা তথা বিশ্বাসে মগ্ন হয়ে যাই। মানুষজন নিয়েই তো একটা দেশ। আর সেই মানুষজন এবং তাদের ভাবনা, সংস্কৃতি চলমান পৃথিবীর অর্থনীতি এবং রাজনীতির প্রভাবে নিরন্তর বদলে চলেছে। ব্যক্তিমানুষের জীবনে নানান পরিবর্তন ঘটছে বলেই আমাদেরই অজান্তে পাল্টে যাচ্ছে মানুষের মুখ এবং তাদের ভাষা। এইসব নতুন প্রজন্মের চিন্তা-ভাবনায়, রুচিতে এবং ব্যবহারে আসছে নতুন বিন্যাস। তাই বিদেশের দেশগুলি সম্পর্কে আমাদের মনে গড়ে ওঠা একটি অবিমিশ্র ছবি অটুট থাকছে না বরং তা ভাঙছে এবং এই ভাঙাটাই স্বাভাবিক। এই আলাপচারিতায় বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মানুষ তথা তাদের পরিবেশ, পেশা ইত্যাদিকে ঘিরে অন্য একটা ছবি তুলে ধরার অন্তরঙ্গ চেষ্টা থাকবে। স ম্পা দ ক

গত দুদিন ধরে প্রায় একনাগাড়ে বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। মাঝে অল্প সময়ের জন্য থেমে ফের আবার নতুন উদ্যমে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। বিকেলের দিকে বাইরে একটু বেরোব ভাবছিলাম তা আর হলো না। প্রায় দুটো দিনই 'বারিধারা'-র এই হোটেলে কাটাতে হলো। বারিধারা বেড়ে ওঠা ঢাকায় গড়ে ওঠা এক পশ্ কলোনি। এখানে কানাডা, আমেরিকা সহ বেশ কয়েকটা দেশের এমব্যাসি রয়েছে ফলে সিকিউরিটির কড়াকড়ি যথেষ্ট। মনে মনে ভাবছি বাইরের এই ধারাবর্ষণের সঙ্গে 'বারিধারা' নামটার কি অদ্ভুত মিল রয়েছে। তবে বৃষ্টিটা যে সারা শহর জুড়েই হচ্ছে তা বলাই বাহুল্য। দেখতে পাচ্ছিলাম আমাদের হোটেলের সামনের রাস্তাটা জলে আধডোবা। এখন রমজান মাস। তাই বিকেলের পর সন্ধ্যার মুখোমুখি রাস্তা শুনশান হয়ে যায়। ইফ্‌তারের আগে সবাই নিজের বাড়িতে অথবা আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে ইফতারে মিলতে চেষ্টা করে। তখন দোকানপাট সব বন্ধ থাকে। মসজিদে নামাজ পড়া শুরু হওয়ার আগেই সবাই বাড়ি ঢুকে যেতে চায়। সারাদিনের উপোস শেষে (রোজা) একসঙ্গে মিলে ইফতার খাওয়ার মধ্যে একটা গভীর আত্মীয়তা, ভালোবাসা, ভালোলাগার বিষয় জড়িয়ে রয়েছে। আমি রোজা না রাখলেও গত কয়েকদিন নানান জায়গায় ইফতারে যোগ দিয়ে যাচ্ছি। কোথাও যেতে না চাইলেও খাওয়ার প্যাকেট পৌঁছে যাচ্ছে হোটেলের ঘরে। তাতে নানারকম ভাজাভুজি। তার মধ্যে আমিষ, নিরামিষ সবই রয়েছে। রয়েছে নানান রকমের মিষ্টিও। বিভিন্ন ধরণের ফল— তার মধ্যে খেজুর অবশ্যই থাকছে। ইফতারের প্যাকেট সাঁটিয়ে রাত্রে আর খাওয়ার ইচ্ছে হলো না। তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে ভাবলাম সকালে যদি বৃষ্টি থামে তবে আশপাশটা একবার পায়চারি করে আসব।

ভাগ্য ভালো, সকালে উঠে দেখলাম মেঘ কেটে গেছে, রাস্তা থেকে বৃষ্টির জলও নেমে গেছে। তাই তড়িঘড়ি কেড্‌সটা পায়ে গলিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। পূবের আকাশে সূর্য উঠি করছে কিন্তু সকালের মিষ্টি আমেজটা তখনো জড়িয়ে রয়েছে। রাস্তায় নেমে দেখলাম সকালে জগিং করার মানুষজনদের ভিড়। তারমধ্যে বেশকিছু সাদা চামড়ার মানুষজনও রয়েছে। এরা সম্ভবত বিভিন্ন দেশের এমব্যাসিতে কাজ করে। তাদের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে মিনিট দশেকের মধ্যে আমি পৌঁছে গেলাম লেকের ধারে।

ঢাকা শহরের বৈশিষ্ট্য হলো যে সারা শহরে ছড়িয়ে রয়েছে এরকম অনেক লেক। তাই টানা বৃষ্টি দু'তিন দিন ধরে চললেও রাস্তায় বা নিচু জায়গায় জমা জল নেমে যায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই। এছাড়া এই শহরে কিন্তু অন্য কোনো জলনিকাশি ব্যবস্থা নেই। শহরের অনেক দিঘি আবর্জনায় ভরে উঠলেও বারিধারার লেকটির রক্ষণাবেক্ষণের ভালো ব্যবস্থা করেছেন ঢাকার কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ। সম্ভবত নামীদামী মানুষজনেরা এই অঞ্চলে থাকেন বলেই লম্বা দিঘিটা সুন্দর করে সাজানো। গাড়ি চলার রাস্তার সঙ্গে লোহার বেড়া দিয়ে লেকটাকে তফাৎ করা হয়েছে। লেক্ আর রাস্তার মাঝের প্রায় পঞ্চাশ গজ চওড়া জমিতে রোপণ করা হয়েছে নানান ধরণের ফুলফলের গাছ সেগুলোরও সুন্দর করে দেখভালের ব্যবস্থা রয়েছে। লেকের ধার ঘেঁষে সিমেন্টের বাঁধানো সরু রাস্তা। বিশেষ করে সকাল সন্ধ্যেয় যারা বেড়াতে আসে তাদের জন্য এটা খুবই ভালো বন্দোবস্ত। দিঘিটা লম্বায় আধ কিলোমিটারের মতো হবে, আর চওড়ায় বেশি নয়, পাঁচশগজের মতো। বাঁধানো রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছি দেখি পথচারীদের দু'তিনজন বাগানের ভেতরের নিচু জায়গায় যেখানে অল্পস্বল্প জল জমে ছিল সেখানে কি যেন করছে। কাছে এগিয়ে এসে দেখি ঐ জমা জলে ছোটোছোটো অসংখ্য মাছ কিলবিল করছে। পথচারীদের একজন তো গায়ের গেঞ্জি

খুলে কাদামাখা মাছ ধরে তাতে জড়িয়ে ফেললেন। তা ওজনে আধকিলো বা তার বেশিই হবে। ঢাকায় এই কাঁচকি মাছের যথেষ্ট কদর আছে। ভাজা বা চচ্চড়ি খেতে দারুণ লাগে। 'আপনি তো অনেক কাঁচ্‌কি ধরেছেন দেখছি'— আমার ঠোঁট থেকে কথাটা বেরিয়ে যেতে ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ আর একটু রৌদ্র বাড়লে এগুলি মৈরা চচ্চড়ি হইয়া যাবো, প্রাণে সয় না— তাই এগুলান রক্ষা করতে নাইম্যা পড়লাম।'

ঢাকাই মানুষদের রসিকতা সর্বজনবিদিত। এদের রসিকতা নিয়ে অনেক গল্পকথা আছে। এসব যে মিথ্যে নয় ভদ্রলোকের কথা শুনে আর একবার মালুম হলো। ঢাকায় আরো যে সব জায়গায় বড় মাপের লেক রয়েছে তার মধ্যে ধানমুন্ডির লেকটার দুটো ধারই বেশ সুন্দর করে সাজানো। লম্বায় ধানমুন্ডির লেক আধ কিলোমিটার বা তার বেশিই হবে। লেকের ধারে গাছগাছালি ছাড়াও কিছু কিছু জায়গায় ছোটো ছোটো পার্কের জন্য জায়গা গড়ে তোলা হয়েছে যেখানে ছেলেমেয়েরা বিকেল হলে খেলা করতে হাজির হয়। লেকের ধার ঘেঁষে গড়ে তোলা হয়েছে একটা মুক্তমঞ্চ। সেখানে বিভিন্ন সময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিশেষ করে এইমঞ্চে নাটকের অভিনয় মাঝেমধ্যেই হয়ে থাকে। দেশের বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে হাজির হয় ঢাকায়। এছাড়া ঢাকা শহরে বহু নামী অনামী নাট্যগোষ্ঠী রয়েছে। সেদিক থেকে বিচার করলে কলকাতার থেকে ঢাকায় নাট্যচর্চার বহর বেশি বই কম হবে না। নাট্যকর্মী ও কর্মীগোষ্ঠীর সংখ্যার হিসেব করলে আমার ধারণা ঢাকা কলকাতাকে ছাড়িয়ে যাবে। ধানমুন্ডির লেকে বোট চলাচলেরও ব্যবস্থা রয়েছে। টিকিট কেটে প্যাডেল বোটে আধঘণ্টা বা এক ঘণ্টার জন্য ভাড়া করে মনের সুখে আঁকাবাঁকা দিঘিটায় ঘুরে বেড়ানো যায়। দিঘির দু'ধারটা ঘন সবুজ ঘাসে ঢাকা। আমার মনে হয়েছে ঢাকায় যত দিঘি রয়েছে তার সবগুলিকে যদি এইরকম ভাবে সাজিয়ে রাখা যেত তাহলে এটা একটি অনন্য শহর হিসেবে চিহ্নিত হতে পারত। পৃথিবীর অন্য কোনো শহরে এত দিঘি খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ আছে। সরকার চাইলে এইসব দিঘিগুলোকে একসঙ্গে জুড়ে দিয়ে ঢাকাকে একটি দিঘির শহর হিসেবে সাজিয়ে তুলে ট্যুরিস্টদের আকর্ষণ করা ছাড়াও জলপথে চলাচলের ব্যবস্থাও হয়তো করা যেত। এই সব দিঘিতে মাছের চাষ, নৌকা চলাচলের সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। ধানমুন্ডিতে দিঘির ধার ঘেঁষে রয়েছে মুজিব স্মৃতি ঘর। যেখানে মুজিব এবং তার পরিবারের মানুষজনকে গুলি করে মেরে ফেলেছিল মুজিববিরোধী সেনাবাহিনীর লোকেরা। মুজিবের স্মৃতিবিজড়িত সেই ঘর, ঘরের আসবাবপত্র এখানে সাজানো রয়েছে। যেভাবে মুজিবকে মেরে ফেলা হয়েছিল ঠিক সেভাবে মূর্তি গড়ে ঐ মুহূর্তটা ধরে রাখা হয়েছে এই মিউজিয়ামে। ঘরের দেওয়াল ও মেঝেতে রক্তের দাগ একইরকম ভাবে সংরক্ষণ করা আছে। দেশকে স্বাধীন করতে যিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তার এই পরিণতি দেখলে মনটা ভারী হয়ে যায়। শুধু মুজিব নয়, তার পরিবারের সমস্ত মানুষজনকে, যারা সেদিন এই বাড়িতে ছিলেন এমনকি পাঁচবছরের শিশুকেও গুলি করে হত্যা করেছিল দেশদ্রোহীরা।

স্বাধীনতা পাওয়ার পর পুরোনো ঢাকার চালচিত্র দ্রুত পাল্টাতে শুরু করে। পুরোনো শহরের পাশ থেকে গড়ে উঠতে থাকে নতুন নতুন শহরাঞ্চল। প্রথমে ধানমুন্ডি পরে বনানী, গুলশান তারপর বারিধার। এই জায়গাগুলোতে একটা সময় জুড়ে অনেক সুন্দর সুন্দর বাড়িঘর তৈরি করা হয়েছিল। এখন অবশ্য সারা ঢাকা শহর জুড়ে বহুতলা বাড়ি তৈরির একটা যেন প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। যেখানেই হাঁটা যাক না কেন, দেখা যাবে পুরোনো বাড়ি ভেঙে ফেলে নতুন বহুতল বাড়ি তৈরি করার হিড়িক। শহর বাড়ছে তো বাড়ছেই চারদিকে গড়ে উঠছে নতুন নতুন উপনগরী। গত কয়েকবছরে বনানী, বারিধারায় এক বা দু'তলা সব বাড়িঘর ভেঙে বহুতল বাড়ি তৈরি করার কারণে জায়গাটা ক্রমশ ঘিঞ্জি হয়ে উঠেছে। এবং রাস্তায় চলতে গিয়ে আমরা বুঝতে পারছিলাম যানজট কি অসম্ভব রকম বেড়ে গেছে। তৈরি হয়েছে আর এক আনকোরা নতুন শহর, যার নাম বসুন্ধরা। বসুন্ধরা আমাদের রাজারহাটের মতো নতুন গড়ে ওঠা উপনগরী। নতুন স্থাপত্যের ওপর ভিত্তি করে ঝকঝকে সব বাড়িঘর রাস্তাঘাট তৈরি করার গতি সেখানে জোরকদমে চলছে। আমাদের সঙ্গে আমাদের আর এক বন্ধু যিনি কয়েকবছর আগে এখানে এসেছিলেন তার কথা অনুযায়ী, ঢাকায় বিগত দশটা বছর পাল্লা দিয়ে বেড়ে উঠেছে বিশাল বিশাল মল, সারা শহর জুড়ে এখন ঝাঁকে ঝাঁকে মলের আধিপত্য। কলকাতার মতো হাতে গুনতি দু'চারটে নাম করা মল নয়—এখন ঢাকা শহরের যেখানেই যাওয়া যাক না কেন নানান মাপের নানান সাজের মল চোখ এড়াবে না। আমাদের সঙ্গের সেই বন্ধুর খুব ইচ্ছে হলো পুরোনো ঢাকার শাঁখারিপট্টিতে যাওয়ার— তার পুরনো স্মৃতিকে অনুসরণ করার আবেগ থেকে। তার ইচ্ছে পূরণ করতে আমরা শাঁখারিপট্টির দিকে বেরিয়েছিলাম সেদিন। এক সময়ের রমরমা শাঁখারিপট্টি আজ তার সম্ভ্রম আর জৌলুস যে হারিয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। এটা এখন পরিণত হয়েছে এক ঘিঞ্জি শহরতলিতে। একবার গাড়ি ঢোকালে ফিরে আসতে দম বেরিয়ে যায়। এত সরু সরু রাস্তা আর রাস্তার দু'ধারে গায়ে গায়ে লাগানো অসংখ্য দোকানঘর। দেখে মনে হবে পশ্চিমবঙ্গের কোনো এক মফস্‌সল শহরে যেন পৌঁছে গেছি। ঘণ্টা দুয়েক অনেক কসরৎ করার পর সেখান থেকে বেরিয়ে এসে আমরা ঠিক করলাম 'ঢাকেশ্বরী মন্দির' যাব। ঢাকেশ্বরীর মন্দিরের নামডাক, তার সঙ্গে ঢাকার পুরোনো জমিদারদের নিয়ে অনেক গল্প জড়িয়ে রয়েছে। সেখানে পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। প্রথমে রাস্তার জ্যামজট কাটিয়ে তারপর মন্দিরের নিশানা খুঁজে বার করতে অনেকটা সময় কেটে গেল। মন্দিরটা যে কোথায় সেটা জিজ্ঞেস করতে করতে আমরা নাকাল হয়ে শেষমেষ অবশ্য যখন সেখানে পৌঁছালাম তখন সূর্য পাটে বসেছে। মন্দির দেখে আমাদের মনটা এতটাই মুষড়ে গেল যে, আমাদের মুখ থেকে আর কথা সরছিল না। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের কারোরই আর কথা বলতে ভালো লাগছিল না। মন্দিরটা ভেঙে পড়তেই শুধু বাকি আছে। চতুর্দিকে নোংরা জঞ্জালে ভর্তি। মন্দিরের পাশের ছোটো ছোটো ঘরগুলোতে, সম্ভবত সেখানে পূজারীরা এককালে থাকতেন সেগুলো এখন ভিখারি, মস্তান বা ঐ ধরণের মানুষদের বেদখলে চলে গেছে। মন্দিরের চাতালে বিরাট বিরাট ফাটল, দেওয়ালে কালিঝুলি, দেখে তো এখানে নিয়মিত পুজোআর্চ্চা হয় বলে আমাদের কারোরই মনে হচ্ছিল না। আমরা মন্দিরের ভেতরে ঢুকতে গিয়ে দেখি সেখানে হঠাৎ এক পূজারী এসে উদয় হলেন। তিনি আমাদের জিজ্ঞেস করলেন আমরা পুজো দেব কিনা। যদি পুজো দেওয়ার ইচ্ছে থাকে তিনি আঙ্গুল দিয়ে আমাদের দোকান দেখিয়ে দিলেন, যেখান থেকে আমরা ফুল আর মিষ্টি কিনে আনতে পারি। আমরা নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছি। তিনি এই ফাঁকে অনেক কষ্টে ছোট্ট একটা প্রদীপ জ্বেলে প্রতিমার সামনে এনে বসালেন। প্রদীপ জ্বালালেও তার শিখা প্রায় নিভু নিভু, দেখে মনে হলো প্রদীপে

যথেষ্ট তেল নেই। পুরোহিত মশাই সেটা আরো একটু এগিয়ে দিয়ে প্রতিমার কাছে এনে বসালেন যাতে আমরা ঢাকেশ্বরী মূর্তিটা ভালো করে দেখতে পারি। প্রদীপের সেই আবছা আলোয় দেবীর মূর্তিটা তারপরও ভালোভাবে দেখা যাচ্ছিল না। বরং ঐ আলোআঁধারিতে মন্দিরের ভেতরটা কেমন যেন একটা গভীর বিষণ্ণতায় ভরে উঠল। কেঁপে কেঁপে ওঠা প্রদীপের আলোটা মনে হচ্ছিল যেন ডুকরে ডুকরে কাঁদছে তার পুরোনো দিনের জৌলুস আর বৈভবের কথা ভেবে। ঢাকার জমিদারগিন্নি ঢাকেশ্বরী মন্দিরে যখন পুজো দিতে আসতেন তখন আলোয় আলোকময় হয়ে উঠত মন্দির আর মন্দিরের আশেপাশের সমস্ত অঞ্চলটা। লোকে লোকারণ্য হয়ে যেত চারদিক। ঠাকুরের প্রসাদ পাওয়ার আশায় হাজির হতো হাজার হাজার লোক। সে-সব এখন শুধু ইতিহাসের কথা।

পরের দিন আমরা পরিকল্পনামাফিক চলে এসেছি সাভারে। সাভার ঢাকা থেকে ঘণ্টা দেড়েকের রাস্তা। সাভারে রয়েছে একটা বড় ক্যান্টনমেন্ট। রয়েছে গণস্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিচালনায় গণবিশ্ববিদ্যালয়। একদম নতুন ধাঁচে সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকাকে ও তাদের জ্ঞান অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিতে এক নতুন আঙ্গিকে তৈরি করা হয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়। শুধুমাত্র বিষয়গত ভাবে নয়, ছাত্রদের মননে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে যাতে দেশের সাধারণ মানুষ সম্পর্কে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও তাদের প্রতি দায়িত্বশীলতা জন্ম হতে পারে সেই উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়াও গড়ে তোলা হয়েছে 'গণচিকিৎসা বিজ্ঞান'। সেখানে ডাক্তারি শিক্ষাক্রম, গবেষণা ও চর্চা হয়। ছাত্ররা এখান ডাক্তারি পড়ে এবং স্নাতকোত্তর বিভাগও রয়েছে এখানে। দেশবিদেশের জ্ঞানীগুণীজনেরা এখানে পড়তে এবং পড়াতে আসেন। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে বিশ্বের ইতিহাসে কারণ তাদেরই নেতৃত্বে বাংলাদেশে যে ওষুধনীতি প্রণীত হয়েছিল সত্তরের দশকে সেই নীতি আজও পৃথিবীর সেরা ওষুধনীতি হিসেবে চিহ্নিত হয়। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র একটি এনজিও হলেও এদেরই তত্ত্বাবধানে শুরু হয়েছিল গণ ফার্মাসিটিউক্যাল যাতে দেশের মানুষেরা সস্তায় ওষুধ পেতে পারে সেই উদ্দেশ্যে।

সাভারে রয়েছে জাতীয় স্মৃতিসৌধ। ১৯৭১-এর বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে স্মরণ করে এই স্মৃতিসৌধ গড়া হয়েছিল। আর এই স্মৃতিসৌধটি একটি দেখার মতো বিষয়। এই সৌধের ভাস্কর্য এবং তাকে ঘিরে বিশাল একটা জায়গা যেভাবে পরিপাটি করে তৈরি করা হয়েছে তাতে যে কারোরই ভালো লাগার কথা। স্মৃতিসৌধের ভাস্কর্যের তারিফ অবশ্যই করতে হয়। তবে শুধু স্মৃতিসৌধ নয় তাকে ঘিরে বিশাল একটা পরিসর পরিকল্পনামাফিক সাজানো-গোছানো। স্মৃতিসৌধের জায়গাটা সমতলভূমি হলেও সেই সমতলভূমি কেটে কেটে তাতে বেশ কয়েকটা ধাপ তৈরি করা হয়েছে। বসানো হয়েছে রঙিন জলের ফোয়ারা, ছোট্ট একটা আয়তক্ষেত্রের আকারে জলাশয় তৈরি করা হয়েছে তাতে ভর্তি রয়েছে টলটলে নীলজল আর সেই জলের মধ্যে মাছেরা ঘোরাঘুরি করছে। সমস্ত জায়গা জুড়ে রয়েছে অসংখ্য গাছগাছালি। গোলাপের বাগানসহ আরো বহু ফুলের বাগান। ডানদিকের অনেকটা জায়গা জুড়ে লাগানো রয়েছে বিভিন্ন গাছ আর সেই গাছগুলোর তলায় ফলক লাগানো রয়েছে। ফলকে নাম লেখা রয়েছে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের যারা এই সব গাছ লাগিয়েছেন। পৃথিবীর বহু দেশের রাষ্ট্রনেতারা যারা এখানে এসেছিলেন তাঁরাই ঐ সব গাছ বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে স্মরণ করে লাগিয়েছেন। আমরা তার মধ্যে ভারতীয় রাষ্ট্রপ্রধানের লাগানো গাছটা খুঁজে দেখছিলাম। ওই জায়গায় আরো কয়েকজন দর্শক ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তাদের একজন জিজ্ঞেস করলেন 'আপনারা কি ইন্ডিয়া থেকে এসেছেন?' আমরা মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ। আমাদের এক বন্ধু উৎসাহের সঙ্গে আরো যোগ করলেন স্মৃতিসৌধের এই জায়গাটা কিন্তু দারুণ। এত বড় মাপের স্মৃতিসৌধ সচরাচর দেখা যায় না। এখানে এসে মনটা খুশিতে ভরে যায়। কয়েকঘণ্টা অনায়াসে কাটিয়ে দেওয়া যায় এখানে। ভদ্রলোক আমাদের কথা শুনে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনারা তো বেশ ভালো বাংলা কথা বলেন দেখছি। ইন্ডিয়ানরা তো বাংলা জানে না। আপনারা কি করে এত ভালো বাংলা কথা শিখলেন?''

—'কেন আমরা তো কলকাতার লোক। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা।'

---'কি যে বলেন''---তার চোখেমুখে অবিশ্বাসের ছাপ। 'ইন্ডিয়ানরা তো হিন্দিতে কথা বলে। আপনারা নিশ্চয়ই কষ্ট করে বাংলা শিখেছেন।'

প্রথমে আমাদের বিস্ময়, পরে রাগ আর শেষমেষ বিষণ্ণতায় মনটা ভরে গেল। দেখে তো মনে হলো ভদ্রলোক লেখাপড়া জানা। বয়স বেশি হবে না, মনে হয় চল্লিশের কোঠায়। তাহলে বাংলাদেশে কি ইতিহাস পড়ানো হয় না? নাকি তাতে দেশবিভাগ, বাংলা ভাগ ইত্যাদি পাঠ্যসূচির অন্তর্গত বিষয় নয়? এই ধরণের অভিজ্ঞতা আমাদের সাতদিনের ভ্রমণসূচিতে কিন্তু একাধিকবার ঘটেছে। এদেশের লোকেদের এ-ধরণের অজ্ঞতার কারণটা যে কি তা এখনও আমরা আবিষ্কার করতে পারিনি। স্কুলে না গেলেও তো এ বিষয়টা তাদের জানা উচিত। বিশেষ করে এই সেদিন যারা স্বাধীনতা পেয়েছে। বিকেল বেলায় ঢাকা ফিরে আসার রাস্তায় আর এক বিপত্তি। আমাদের জানা ছিল না, ঐ সময়টা কাপড়ের সেলাইয়ের কারখানাগুলোয় শিফ্‌ট বদলের সময়। সারা রাস্তা জুড়ে চলছে তখন অসংখ্য মহিলাদের ঢল। দেখে মনে হয় এদের বয়স কুড়ি থেকে ত্রিশের মধ্যে। কারো কারোর বয়স কুড়িরও কম হতে পারে। একদল বাড়ি ফিরে যাচ্ছে অন্যদল কারখানায় ঢোকার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন। আর সারা রাস্তা জুড়ে বাস, ট্রাক আর অটো রিক্সার গুঁতোগুঁতি। আমাদের গাড়ির চাকা প্রায় নড়েই না। ঢাকা থেকে সাভার প্রায় পুরো রাস্তার ধার জুড়েই রয়েছে জামাকাপড় তৈরির কারখানা। রাস্তার ধার ঘেঁষে ঘেঁষে সোজা উঠে গেছে পাঁচ-ছতলা বাড়িগুলো দেখতে অনেকটা দেশলাইয়ের বাক্সের মতো। বাড়িগুলোর জানালা বলতে কিছুই নেই। দেওয়ালের গায়ে একহাত বাই একহাত সাইজের কাঁচ লাগানো যেখান দিয়ে আলো ঢোকে ঘরে। কোল্ডস্টোরেজের থেকে এই বাড়িগুলোর শুধু এইটুকুই তফাৎ। বিদেশী নামীদামী কোম্পানিগুলো জাহাজ ভর্তি করে সেলাই মেশিন, সুতো, কাপড় সমস্ত কিছুই আমদানি করে এদেশে। তারপর সেগুলো থেকে রেডিমেড জামাপ্যান্ট ইত্যাদি তৈরি হয়ে পুরোটাই আবার রপ্তানি হয়ে যায় ইউরোপ, আমেরিকায়। শুধু সস্তায় শ্রম কেনা যায় বলেই এই কসরৎ করে কোম্পানিগুলো। তবে এর মাধ্যমে বাংলাদেশও উপকৃত হয় তা বলাইবাহুল্য। বাংলাদেশের সরকারের রাজস্বের প্রায় ত্রিশ থেকে চল্লিশ শতাংশ উঠে আসে বস্ত্রশিল্পের থেকে। আর এই শিল্পের দৌলতে বহু বাংলাদেশী কোটিপতি বনে গেছেন রাতারাতি। এই শিল্পে নিযুক্ত মহিলা শ্রমিকদের অবশ্য টানা আটঘণ্টা ছোট্ট ছোট্ট

খুপরিতে বসে পিঠ টানটান করে একদৃষ্টিতে কাজ করে যেতে হয়, নাম মাত্র পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। আমরা নিজেদের মধ্যে যখন এই সব কথাবার্তা বলছিলাম তখন মোস্তাফা, যে ঢাকা থেকে গাইড হিসেবে আমাদের সঙ্গে এসেছে সে-ও হঠাৎ ঢুকে পড়ল আলোচনায়। আসলে মোস্তাফা গাইডের কাজ করে না, সে কাজ করে একটা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায়, যাদের আমন্ত্রণে আমরা এবার বাংলাদেশ ঘুরতে এসেছিলাম। মোস্তাফা পেশায় কৃষি বিশেষজ্ঞ। তার সংগঠন বিদেশ থেকে বাংলাদেশে আমদানি করা বীজ— তা সে ধান, টম্যাটো, বরবটি ইত্যাদির জন্য কৃষি ব্যবস্থার উপর কি ধরণের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিকারক প্রভাব পড়ে; কৃষি তথা দেশের স্বনির্ভরতা কিভাবে নষ্ট হবে তা নিয়ে দেশজুড়ে প্রচার আন্দোলনে যুক্ত। সে আমাদের কথার ফাঁকে বলল, শুধু কম মজুরি নয়, এরা সপ্তাহে একটি দিনও ছুটি পর্যন্ত পায় না। যেদিন কাজ করে সেদিনের মাইনে পায়, এর বাইরে অন্য কোনো ধরণের সুযোগসুবিধা যেমন চিকিৎসাভাতা, পেনশন, গ্র্যাচুইটি ইত্যাদি কোনো কিছুই এরা পায় না। কিন্তু তারপরেও কিন্তু এই বয়নশিল্পের প্রসার বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এক বড় আশীর্বাদ। মোস্তাফার বক্তব্য হলো শুধু সরকারের রাজস্বের জন্য নয় এই মেয়েগুলোর জীবনেও এই কাজটা পাওয়া বা করার সুযোগটা তাদের জীবনে বিরাট পরিবর্তন এনে দিতে পেরেছে। আসলে আপনারা হয়তো জানেন না, এই কাজের সুযোগ আছে বলেই গ্রাম থেকে দলবেঁধে আসা মেয়েরা শহরে এসে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে। কাজের মজুরি তা সে যতই কম হোক না, এই সুযোগে যেন নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য রাস্তা তৈরি করে নিতে পারে মেয়েগুলো। এই কাজ করে তারা একটু স্বাধীনতার আস্বাদ পায়। জীবনটাকে নতুন করে দেখতে পারে, পরিবারের উপর নির্ভর না করে নিজের ভবিষ্যৎ গড়ার যে স্বপ্ন দেখতে পারে, সেটাই বা কম কি? এই সুযোগ তারা পেত না যদি না এই বয়নশিল্প বাংলাদেশে গড়ে উঠত। এও ঠিক এই সব কারখানায় টানা কাজ পেতে দালালকে ঘুষ দিতে হয়। তাদের খুশি রাখতে করতে হয় আরও অনেক কিছু। কিন্তু গ্রামের বাড়িতে মাথা গুঁজে সারাদিন ধরে হাড়ভাঙা কাজ সঙ্গে লাথিঝাঁটা সহ্য করা, তারপর অল্পবয়সে শাদি করে বাচ্চা বিয়োনো এই তো হলো গ্রামবাংলার মহিলাদের জীবন। তার থেকে তো শহরে সে এই কাজের সুবাদে সঙ্গীসাথীদের মধ্যে প্রাণখুলে কথা বলা, ঘুরে বেড়ানো যায়, গড়ে তুলতে পারে নিজের মতো বাঁচার একটা পরিসর। মোস্তাফা ফের শুরু করে, আসলে কোনো কিছুকে বিচার করতে গেলে তার প্রেক্ষিতকেই বাদ দিয়ে কি করা যায়? এখানে দেশবিদেশ থেকে আসা লোকজনেরা এই বিষয়টা ভুলে যায়। একজন গরিব বাংলাদেশী তরুণী বা মহিলা বিশেষত গ্রামে কি জীবন কাটায় এদেশের বাইরের লোকেরা তো তার খবর রাখে না? মেয়েদের এই শহরে চাকরি করতে আসার ব্যাপারে মোল্লারা শুধু বাধা দেয়নি ফতোয়াও জারি করেছিল একসময়। এখন ব্যাপারটা সয়ে গেছে। আপনি বিতর্ক তুলতে পারেন, আমি তবু বলব এই বয়ন শিল্প বাংলাদেশী মহিলাদের জীবনে এক অনন্য স্বাধীনতার স্বাদ এনে দিয়েছে— যা অন্য কোনো ধরণের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড তা সে মাইক্রোক্রেডিট, গ্রামীণ স্বাস্থ্যপ্রকল্প, মা ও শিশু স্বাস্থ্য ইত্যাদি নিয়ে যতই ঢাকঢোল পেটানো হোক না কেন, কোনো তুলনায় আসে না। এই যেভাবে মেয়েরা বাজারি অর্থনীতিতে ঢুকে পড়ল আর নিজের রোজগারেকে ভিত্তি করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতা অর্জন করল এইটা তো নারী উন্নয়নের প্রধান বিষয়। আমাদের আলোচনা বিতর্ক আরো কিছুক্ষণ এবিষয় নিয়ে গড়িয়ে চলল। এই আলোচনা বিতর্কের অবসরে আমাদের গাড়ি একটু ফাঁক পেয়ে গড়াতে শুরু করেছে দেখে আমরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

শেষপর্যন্ত ঢাকা শহরে যখন পৌঁছুলাম তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। আজই আবার পরিকল্পনামাফিক রাতের খাওয়াদাওয়া সেরে বাসে চেপে যাত্রা করব চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে। তারপর সেখান থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামর রাস্তা ধরে রাঙামাটিতে। পার্বত্য চট্টগ্রামে তিনটে জেলা রয়েছে। এগুলি হলো রাঙামাটি, খাগড়াছাড়ি আর বান্দরবন। আমরা যাব রাঙামাটিতে। বাকি দুটো জেলার থেকে রাঙামাটি নাকি তুলনায় উন্নত।

সক্কাল বেলা ঠিক সময়ে আমাদের বাস এসে পৌঁছুল চট্টগ্রামের প্রধান বাসস্ট্যান্ডে। সূর্য তখন উঠি উঠি করছে। ভলভো বাসে রাত্রির জার্নিটা ভালোই হলো। বলতে গেলে বাসে কোনো ঝাঁকুনি ছিল না। রাস্তার বেশির ভাগটাই ভালো। বাস থেকে নেমে চা খাওয়ার উদ্দেশ্যে একটা ভালো দোকান খোঁজার চেষ্টায় দু'পা হাঁটা দিয়েছি। এত সকালেও বাসস্ট্যান্ডের আশপাশের জায়গাটা বেশ সরগরম। হাঁকাহাঁকি চিৎকার চেঁচামেচি কোনো কিছুরই কমতি নেই। কয়েক মিনিট হাঁটার পর চোখে পড়ল একটা ভদ্রস্থ দোকান। কাছে এসে দেখি দোকানটাতে বেশ ভিড়। দোকানের কোনো টেবিল ফাঁকা নেই। তাই কাউন্টারের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। দ্বিতীয় কোনো দোকান খুঁজতে আমাদের আর ইচ্ছা করল না। এদিকে কাউন্টারে বসে থাকা লোকটা অনর্গল কথা বলা যাচ্ছে। কখনও কাস্টমার, কখনও দোকানের বেয়ারা, কখনও বা বাবুর্চির সঙ্গে বেশ জোরে জোরে, কখনও প্রায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে হুকুমদারি করে যাচ্ছে। কিন্তু কি আশ্চর্য আমি এত কথাবার্তা শুনছি কিন্তু বাক্যগুলো প্রায় কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার কি বুদ্ধি লোপ পেল, নাকি আমি এখনও ঘুমের ঘোরে রয়েছি। মাথায় একটা চাপ্পড় মেরে ভাবলাম ভুল কিছু শুনছি না তো? নাকি বাস জার্নিতে মাথার ভেতরটা গুলিয়ে গেছে। এবার আরও একটু বেশি মনঃসংযোগ করে তাদের কথাবার্তাগুলো ফের শুনবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার গভীর মনোযোগ বিশেষ কোনো উপকারে এল না। বড়জোর দশটা বাক্যের মধ্যে দুটো কি তিনটে বাক্য আমার বোধগম্য হলো। বাকিগুলো তার হাতমুখ নাড়ার কিংবা কথাবলার প্রেক্ষিত থেকে বুঝতে হয়তো পারছিলাম কিন্তু পুরো বাক্যের

□□ একজন গরিব বাংলাদেশী তরুণী বা মহিলা বিশেষত গ্রামে কি জীবন কাটায় এদেশের বাইরের লোকেরা তো তার খবর রাখে না? মেয়েদের এই শহরে চাকরি করতে আসার ব্যাপারে মোল্লারা শুধু বাধা দেয়নি ফতোয়াও জারি করেছিল একসময়। এখন ব্যাপারটা সয়ে গেছে।... ...এই বয়ন শিল্প বাংলাদেশী মহিলাদের জীবনে এক অনন্য স্বাধীনতার স্বাদ এনে দিয়েছে— যা অন্য কোনো ধরণের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড তা সে মাইক্রোক্রেডিট, গ্রামীণ স্বাস্থ্যপ্রকল্প, মা ও শিশু স্বাস্থ্য ইত্যাদি নিয়ে যতই ঢাকঢোল পেটানো হোক না কেন... ...।

দুটো-তিনটে শব্দ ছাড়া বাকিগুলো আমার অজানা। সত্যিকথা বলতে কি, তাঁদের এই কথাবার্তাকে আর যাই হোক বাংলা বলা যায় না। বাঙালি হিসেবে আমার যতটাই গর্ব ও বাংলা ভাষা বোঝার ক্ষেত্রে যেটুকুই অহংকার থাকুক না কেন, চিটাগাঙের বাঙালিদের কথাবার্তা বোঝার সক্ষমতা যে আমার নেই সেটা স্বীকার করে নেওয়াই ভালো। যাইহোক, কিছুক্ষণের মধ্যে টেবিল খালি হতেই আমরা ঝপাঝপ সেগুলো দখল করে নিলাম।

ইতিমধ্যে মোস্তাফা ভাই রাঙামাটি যাওয়ার সমস্ত বন্দোবস্ত করে ফেলেছেন। বাসে করে যেতে গেলে বেশ কয়েকঘণ্টা লাগবে। তাও প্রথম বাস ছাড়তে এখনো ঘণ্টা দুয়েক বাকি। তাই তিনি একটা জিপ ভাড়া করে আমাদের যাওয়াটা সহজ করে দিয়েছেন। ইতিমধ্যে মোস্তাফা ভাইয়ের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্কটা একটু একটু করে গড়ে উঠেছে। মোস্তাফাভাই ভীষণ অমায়িক মানুষ, সমস্তক্ষণই তিনি আমাদের কি করে সাহায্য করবেন তাই নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। আমরা যাতে কোনো ধরণের কষ্টে না পড়ি তার জন্য সবসময় সজাগ। তার এই আচরণে আমাদের মাঝেমধ্যেই অস্বস্তি হচ্ছিল। আমরা পশ্চিমবঙ্গের মানুষেরা এধরণের অতিথি-পরায়ণ মানুষ দেখতে অভ্যস্ত নই। তিনি আমাদের নামের সঙ্গে দাদা যোগ করে সম্বোধন করছিলেন। কাউকে বা শুধুই 'দাদা' এবং 'আপা'।

বাসস্ট্যান্ড ছাড়িয়ে ঘণ্টাখানেক চলার পরই রাস্তা ক্রমশ সরু ও ভাঙাচোরা হতে শুরু করল। আমরা সমতলভূমি ছাড়িয়ে পাহাড়ি এলাকায় ঢুকে পড়লাম। রাস্তার দু'ধারে উঁচুনিচু পাহাড়, জংলী গাছপালার ভিড় বেড়ে চলেছে। আশেপাশে কোনো জনবসতি চোখে পড়ছে না। রাস্তার থেকে দূরে দূরে শুধু দু'একটা বিচ্ছিন্ন ঘরের খড়ের চাল এখানে ওখানে উঁকিঝুঁকি মারছে। ঘণ্টা দেড়েক আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে চড়াই উতরাই পেরিয়ে আমরা একটা ছোট্ট বাস স্টপেজে এসে থামলাম। আমাদের সবাইয়ের তখন চায়ের তেষ্টা মেটানোর ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠেছে। চায়ের দোকানটায় ভিড়ভাট্টা তেমন নেই। আমরা চায়ের অর্ডার দিয়ে একটা বাঁশের মাচায় বসে আছি (এখানে বসার চেয়ার টেবিল সবই বাঁশের), হঠাৎ আমার মনে হলো রাস্তার ধারের হাটটা ঘুরে আসা যাক। বেশ ভালোই জমে উঠেছে হাট। বিক্রেতাদের বেশির ভাগই মহিলা আর খদ্দেরদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত সমান সমান হবে বলেই মনে হলো। হাটে নানান ধরণের জংলী ফুলফল, মেটে আলু বিক্রি হচ্ছে। বিক্রি হচ্ছে নরম বাঁশের গোঁড়া যাকে আমরা ব্যম্বু সুট বলি। প্রায় জলের দামে সেগুলো বিক্রি হচ্ছে। বেশ কয়েকজন নানান মাপের ওই ব্যম্বু সুট ঢেলে সাজিয়ে রেখেছে। ক্রেতাদের অনেকেই সেইসব দরদাম করে কিনছেন।

বাঁশের গোঁড়াগুলোর আকার-আকৃতির উপর নির্ভর করে দাম ঠিক হয়। ওজন করার বালাই নেই। এই অঞ্চলের আদিবাসীদের মূল অংশই হলো চাকমা ও মগ। এরা নানান ধরণের গাছের ফুলকে সব্জি হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। আমি অনেক কষ্টে এইসব নানান রং-এর ফুলগুলোর মধ্যে দু'ধরণের ফুল চিনতে পারলাম, তার একটা হলো আদা অন্যটা হলুদের ফুল। বাজারে এছাড়া রয়েছে শুকনো মাছ আর মাশরুম। চাকমাদের গায়ের রং ফরসা, নাক একটু চাপা হলেও নারী-পুরুষ সবাইকেই দেখতে বেশ সুন্দর। এদের অনেকেই বাংলায় কথা বলে এবং বাংলা বুঝতে পারে।

চা আর তার সঙ্গে আলুর চপ খেয়ে ফের আমরা জিপে উঠলাম এবং আরো ঘণ্টা দুয়েক যাওয়ার পর আমরা যখন গন্তব্যস্থলে পৌঁছুলাম তখন সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢুকে যাচ্ছে। মোস্তাফা ভাই আমাদের সবার জন্য সরকারি ট্যুরিস্ট লজে থাকার বন্দোবস্ত করেছেন। রাঙামাটির জেলা শহরে দু'চারটে হোটেল থাকলে সেগুলোতে রাত কাটানো বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার বলেই তিনি আমাদের জানিয়েছিলেন। এটা নামেই জেলা শহর। পশ্চিমবাংলার মফস্সল শহরের মতো একটু রাত বাড়লেই দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে যায়। তখন চারদিক শুনশান হয়ে পড়ে।

সমতলভূমি থেকে বেশ কয়েক হাজার ফুট উঁচুতে রয়েছি আমরা। এই আগস্ট মাসেও ঠাণ্ডা লাগছে। রাত বাড়তেই ঠাণ্ডা আরও বাড়ল, তাই আমরা রাতের খাওয়ার খেয়ে শুয়ে পড়া মনস্থ করলাম। রাতের মেনুতে মাছ ভাত আর সবজি ছিল। ড্যাম থেকে ধরা টাটকা রুইমাছের প্রমাণ সাইজের একটি পেটি খেতে বুঝলাম, অন্ধ্রের চাষ করা আর বিশাল ড্যামের জলে স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে ওঠা মাছের স্বাদের তফাৎ-এর জায়গাটা। সঙ্গে ছিল শুকনো মাছ, হলুদ গাছের ফুল আর বাঁশের নরম গোঁড়া দিয়ে তৈরি একটি রান্না। একবার খেলে জীবনে কোনোদিন ভোলা যাবে না। অসাধারণ টেস্ট্। রাত্রে ঘুমোতে গিয়ে টের পেলাম কেন বিছানায় তারা কম্বল দিয়ে রেখেছিল। কলকাতার ডিসেম্বরের ঠাণ্ডা তখন আমাদের পেয়ে বসেছে। জায়গাটা একরকম ছোট্ট প্রায় মফঃস্বল শহরের মতো হলেও এখানে বিদ্যুতের কোনো অভাব নেই। তার কারণ নদীতে বাঁধ দিয়ে যে বিশাল জলাধার তৈরি করা হয়েছে এবং তার থেকে যে জলবিদ্যুৎ তৈরি হয় তা রাঙামাটি তো বটেই চিটাগাঙেও সরবরাহ করা হয়। বিশাল জলাধারের পাশেই আমাদের ট্যুরিস্ট লজ। আগামীকাল সকালে ওখানে ঘুরতে যাওয়ার বন্দোবস্ত করে রেখেছেন মোস্তাফাভাই। কিন্তু হঠাৎই তাকে কাল সকালে বাড়ি চলে যেতে হবে। কারণ তার বাড়ি থেকে জলদি তলব এসেছে। বিষয়টা কি তা তিনি অবশ্য ভেঙে বললেন না। বারবার দুঃখপ্রকাশ করে তার বাড়িতে আমন্ত্রণ করে এবং আমাদের সঙ্গে ঘোরার জন্য তার একজন চাকমা সহকর্মীকে পরিচয় করিয়ে দিলেন সকালের ব্রেকফাস্ট টেবিলে। ভদ্রলোকের নাম প্রকৃতি চাকমা। ঝকঝকে চেহারা, শরীরে একটুও মেদ নেই। গায়ের রং চিনা বা জাপানিদের মতো। কিন্তু চোখমুখে মঙ্গোলিয়ান ছাপ নেই বললেই চলে। শুধু নাকটা সামান্য চাপা এই যা। দেখে বয়স বোঝা যায় না। কথাবার্তার ফাঁকে বুঝলাম তার বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গেছে কিন্তু দেখে মনে হবে পঁচিশ কিংবা বড়জোর ত্রিশ। আমরা ব্রেকফাস্ট শেষ করে বেরোতে বেরোতে ন'টা বেজে গেল। রাস্তায় বেরিয়ে দেখি বিরাট এক মিছিল। আমাদের জানা ছিল না আজ ৯ আগস্ট। আন্তর্জাতিক বিশ্ব আদিবাসী দিবস। চিটাগাঙের আদিবাসী জনগোষ্ঠী মানুষজনেরা তাদের আদিবাসী স্বীকৃতির দাবিতে রাস্তায় নেমেছে। ব্যানারে লেখা 'চট্টগ্রাম আদিবাসী ফোরাম'। আমরা কোনোক্রমে মিছিলটার পাশ কাটিয়ে একটু এগুতেই জলাধারের পাশে পৌঁছে গেলাম। বিশাল জলাধার এপার ওপার দেখা যায় না। সমুদ্রের মতো জলের ঢেউ পাড়ে এসে ধাক্কা মারছে। একটা স্পিড বোট ভাড়া করার ব্যবস্থা মোস্তাফাভাই চলে যাওয়ার আগেই করে রেখেছিলেন। আমরা সবাই তাতে চেপে বসলাম। মিনিট কুড়ি-পঁচিশ চলার পর ছোট্ট একটা দ্বীপের মতো জায়গায় পৌঁছুলাম আমরা। এই দ্বীপটার নাম পেটা টিংটিং। নামটা বেশ মজার। তাই আমরা প্রকৃতি চাকমাকে জিজ্ঞেস করলাম এটার মানে কি? প্রকৃতিবাবু যা বললেন তাতে এর মানে মোটামুটি দাঁড়ায়—'পেটপুজোর আনন্দ'। দ্বীপটা ছোট্ট। কোনো ঘরবাড়ি নেই গোটা দুই-তিন দোকান রয়েছে। সাধারণত টুরিস্টরা এই দ্বীপে পৌঁছুলে

□□ ষাটের দশকে বিশ্বব্যাংকের বদান্যতায় কিংবা চাপে যাই বলা হোক না কেন, পশ্চিম পাকিস্তানের তদানীন্তন সামরিক সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে নাকি এই জলাধার 'উপহার' দিয়েছিলেন। আর তার মাশুল গুনেছে এই অঞ্চলের আদিবাসীরা। এমন কি চাকমা রাজাও। তার রাজবাড়ি, রাজ্যপাট সমস্ত তলিয়ে গেছে জলের তলায়। প্রায় পঞ্চান্ন হাজার পরিবার ভিটেমাটি উচ্ছেদ হয়ে গেছে স্রেফ দু'দিনের নোটিশে। পৃথিবীর ইতিহাসে এধরণের ঘটনা দ্বিতীয় কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই অঞ্চলের মানুষদের থেকে বিরোধিতা আসতে পারে জানতে পেরে পুরো বিষয়টাই চেপে রেখেছিলেন সামরিক শাসকগোষ্ঠী ... ...।

তারা দোকানপাট খোলে। আমাদের দেখে দোকানের এক মহিলা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কি খেতে চাই। আমরা সবাই ব্রেকফাস্ট খেয়ে এসেছি তাই খাওয়ার তেমন ইচ্ছে ছিল না। তবু এসেছি যখন তখন কিছু একটা তো খেতে হয়। চায়ের সঙ্গে একধরণের বড়াভাজা দিয়ে শুরু করলাম। আমি ইতিমধ্যে প্রকৃতিবাবুর সঙ্গে এই জলাধার তৈরির গল্পে ঢুকে গেলাম। জানবার চেষ্টা করলাম আদিবাসীদের দাবিগুলো কী ধরণের। তিনি আমার দিকে একবার তাকিয়ে উল্টে আমাকে প্রশ্ন করলেন, আপনি তো কলকাতার মানুষ। শুনেছি কলকাতার মানুষজনেরা নাকি ভীষণ শিক্ষিত। সবকিছু জানে। সেখানে নাকি জ্ঞানের চর্চা হয় রাতদিন। তো আপনারা আমাদের কথা জানেন না? আমি ঝটিতি প্রশ্নে বেসামাল হয়ে একটু আমতা আমতা করে আদিবাসীদের অধিকার ইত্যাদি নিয়ে কিছু ভাসা ভাসা কথা আউড়ে যাচ্ছি দেখে তিনি আমাকে মাঝপথে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'চিংড়ি মাছের ভাজা খাবেন? এই জলাধারে দারুণ ভালো চিংড়ি পাওয়া যায়। চেষ্টা করে দেখতে পারেন। বাইরের ট্যুরিস্টরা কিন্তু সবাই এর প্রশংসা করে।' সে আর বলতে? আমি তো একপায়ে খাড়া, সঙ্গে আমার বন্ধুরাও। কোনো ব্যাটার-ফ্যাটারে ডোবানো নয়, স্রেফ তেলে হালকা করে ভাজা। একবাটি চিংড়ি ভাজা খেয়ে আমাদের মনপ্রাণ জুড়িয়ে গেল। তবু ওই একবাটি খেয়ে কি আশা মেটে? তাই তিনি আমাদের প্রত্যেকের জন্য ফের আর একবাটির অর্ডার পেশ করলেন। মাঝারি মাপের চিংড়ি জলাধারের জল থেকে ধরা হয়েছে সকালেই। একদম ফ্রেশ। স্বাদ, রং এবং গন্ধের তুলনা হয় না। এবার আমি একটু ধাতস্থ হয়ে নিজের অজ্ঞতার কথা স্বীকার করে যাকে ঐ বলে না সারেন্ডার করা,—তাই করলাম তার কাছে। আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল এই জলাধারের বিষয়টা জানার। তাই তাকে ফের পুরোনো আলোচনায় টেনে আনলাম।

ষাটের দশকে বিশ্বব্যাংকের বদান্যতায় কিংবা চাপে যাই বলা হোক না কেন, পশ্চিম পাকিস্তানের তদানীন্তন সামরিক সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে নাকি এই জলাধার 'উপহার' দিয়েছিলেন। আর তার মাশুল গুনেছে এই অঞ্চলের আদিবাসীরা। এমন কি চাকমা রাজাও। তার রাজবাড়ি, রাজ্যপাট সমস্ত তলিয়ে গেছে জলের তলায়। প্রায় পঞ্চান্ন হাজার পরিবার ভিটেমাটি উচ্ছেদ হয়ে গেছে স্রেফ দু'দিনের নোটিশে। পৃথিবীর ইতিহাসে এধরণের ঘটনা দ্বিতীয় কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই অঞ্চলের মানুষদের থেকে বিরোধিতা আসতে পারে জানতে পেরে পুরো বিষয়টাই চেপে রেখেছিলেন সামরিক শাসকগোষ্ঠী বাঁধ নির্মাণ শেষ হওয়া পর্যন্ত। শেষমেষ জানিয়েছিল জল ছাড়ার দুদিন আগে। ফলে আদিবাসী মানুষজনেরা ঘরবাড়ি ছেড়ে আসার সময় প্রায় কোনো কিছুই সঙ্গে নিয়ে আসতে পারেনি। রাতারাতি সর্বস্বান্ত হয়ে রাস্তার ভিখারিতে পরিণত হয়েছিলেন তারা। চাকমার রাজা পালিয়ে গিয়েছিলেন বিদেশে। এরপর এই অঞ্চলের আসিবাসীরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তারা দলবদ্ধ হয়ে পূব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সরব হয়। দীর্ঘ তিনটে দশক সরকারের সঙ্গে নানান সংঘর্ষে জড়িয়েছে তারা। আবার তাদের সঙ্গে সরকারের শান্তিচুক্তি ইত্যাদি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তবে সে-সব চুক্তি বাস্তবে কার্যকর হয়নি। কিন্তু আজও সেদেশে এই আদিবাসীরা তাদের স্বীকৃতি পায়নি। উল্টে সমতলের বাঙালিদের নিয়ে এসে তাদের উপনিবেশের পত্তন ঘটিয়েছে। সৈন্য পাঠিয়ে জোরজবরদস্তি করে শুধু জমি দখল নয়। চাকমা ও মগদের উপর সমস্ত ধরণের অত্যাচার, লুণ্ঠন, মহিলাদের ধর্ষণ করা সরকারি প্ররোচনায় ঘটেছে, এমনকি স্বাধীন বাংলাদেশেও তার পরিবর্তন ঘটেনি। একথা বলতে গিয়ে এই প্রথম দেখলাম প্রকৃতির চোখমুখের চেহারা পাল্টে যেতে। তার মুখের রং ক্রমশ লাল হচ্ছিল। বিশেষ করে মুজিবকে খুন করার পর যে সামরিক সরকার এদেশের মসনদে বসে তারাও পার্বত্য চিটাগাঙে হাজারে হাজারে সমতলের মানুষদের এনে বসতি গড়ে দিতে দ্বিধা করেনি। নিজের জমির উপর চাকমাদের আজও কোনো অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

১৯৪৭ সালে দেশভাগ হওয়ার সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে অ-আদিবাসীদের শতকরা হার ছিল ৩ শতাংশেরও কম। এখন এই অঞ্চলের আদিবাসী ও অ-আদিবাসীদের হার প্রায় সমান সমান। এও এক বিচিত্র ঘটনা যার দ্বিতীয় কোনো তুলনা সম্ভবত পৃথিবীর ইতিহাসে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমরা চিংড়ির সদ্ব্যবহার শেষে ছোট্ট দ্বীপটাকে পাক দিতে দিতে এইসব কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিলাম কিংবা বলা ভালো প্রকৃতিবাবুর মুখ থেকেই স্বাধীনতা-উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস শুনছিলাম। পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বাধীনতা লাভের ঘটনাতেও জড়িয়ে রয়েছে চরম অবিচার ও প্রতারণার ইতিহাস। ১৯৪৭-এ ধর্মকে ভিত্তি করে দেশভাগ করার সময় যে অঞ্চলের শতকরা ৯৭ শতাংশ ছিল আদিবাসী এবং অমুসলিম, র‍্যাডক্লিফ ও মাউন্টব্যাটনের বিচারে সেটা একটা খোঁচায় ঢুকে গেল পূর্ব পাকিস্তানে। অথচ এই আদিবাসীদের কেউই ইসলাম মতবাদে বিশ্বাসী নয়। এদের অনেকেই বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী। বাকিরা সেভাবে কোনো আধুনিক ধর্মের সঙ্গে যুক্ত নয়। প্রাচীন আচার-অনুষ্ঠান, দেবদেবীর পূর্জাআর্চ্চা করে থাকে। সবথেকে মজার ব্যাপার হলো স্বাধীন ভারতের পতাকা প্রথম দিল্লিতে নয়, এই পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটিতে তোলা হয়েছিল। কারণ তারা জানতেনই না এবং বিশ্বাসই করতে পারেন নি যে পার্বত্য চট্টগ্রাম পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত হবে। এইসব কথার ফাঁকে ফাঁকে আমরা ফের উঠে বসেছি বোটে। সকালের সূর্য তখন মধ্যগগনে। সূর্যের আলো জলের উপর পড়ে এমন চকচক করছে যে ওদিকে তাকানো যাচ্ছিল না। মাথার উপর দু'চারটে গাঙচিল উড়ে বেড়াচ্ছে। আমরা এসব দেখতে দেখতে কখন যে জেটিতে পৌঁছে গেছি খেয়াল করি নি। প্রকৃতিবাবু আমাদের

বলেছিলেন এখানে অনেক ট্যুরিস্ট সারারাতের জন্য নৌকো ভাড়া করে জলাধারে কাটায়। বিশেষত চাঁদনি রাতে। এখান থেকে উজান বেয়ে জলাধারের বাঁধের জায়গায় পৌঁছতে ঘণ্টা দুই বা আড়াই লেগে যাবে। তারপর মাঝরাতে কয়েক ঘণ্টা জলের উপর ভেসে থেকে, বাঁধের খোলা লকগেটের ভেতর আছড়ে পড়া জলের ধারা দেখতে দেখতে সময় যে কিভাবে কেটে যাবে ভাবতেই পারবেন না। নৌকোর মাঝিরাই মাছ ধরে রান্না করে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করবে। তাই খাওয়াদাওয়া বয়ে আনার ঝক্কি বইতে হবে না। কিন্তু আমাদের কপাল খারাপ কারণ পরের দিন সকালেই আমাদের চিটাগাঙে ফিরে যাওয়ার কথা তাই সারারাতের এই ভ্রমণসূচিটা নেওয়া গেল না।

পরিকল্পনামাফিক চিটাগাঙে পৌঁছে বাস ধরে আমরা যাব গোয়ালন্দে। বাংলাদেশে এসে স্টিমারে চেপে পদ্মা পেরিয়ে গোয়ালন্দের ঘাটে যাওয়ার সুযোগ ছাড়াটা ঠিক হবে না। তাই এবারের মতো রাঙামাটি ছাড়তে হলো আমাদের।

গোয়ালন্দে পদ্মা আর যমুনার সঙ্গমের জায়গাটা এত চওড়া যে সেটা নদী না সমুদ্র দ্বন্দ্ব আসবে মনে। এখন অবশ্য নদীতে জল অনেক তবে শীতের সময় নাকি মাঝনদীতে চড়া পড়ে যায়। বাংলাদেশীরা এর জন্য প্রায়শই ভারতকে দায়ী করে। দায়ী করে ফারাক্কাকে। স্টিমারে করে গোয়ালন্দর ঘাটে পৌঁছুতে ঘণ্টা দেড়েক সময় লাগল। স্টিমারে এই নদীপারাপারের ব্যাপারটা চলে আসছে বহু বছর ধরে। কারণ এখনও পদ্মা পেরুনোর জন্য কোনো ব্রিজ তৈরি হয়নি তাই স্টিমারই একমাত্র ভরসা। স্টিমারে করেই লরি, বাস, গাড়ি সব পারাপার হয় এখানে।

স্টিমারের দোতলায় খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে। রয়েছে খাওয়ার বাঁধা মেনু। ইলিশমাছের ঝোলভাত, সঙ্গে আলুভাজা বা অন্য কিছু একটা সবজি। গরম গরম টাটকা ইলিশের ঝোলভাতের স্বাদই আলাদা। দোতলায় কয়েকটা বেঞ্চ পাতা রয়েছে। একদল খেয়ে উঠে গেলে অন্যদল আবার সেটা দখল করে নেয়। আর স্টিমারে বসে পদ্মার জলে চোখ রেখে ইলিশের ঝোল ভাত খাওয়ার চল চলে আসছে যুগ যুগ ধরে, এখনও তার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। ঘাটে নেমে দেখি রাস্তার ধারের দোকানে ইলিশ মাছ বিক্রি হচ্ছে। এখানে ইলিশ মাছ ওজন দরে বিক্রি হয় না, আকার আয়তনের উপর নির্ভর করে এর দাম স্থির হয়। আর মাছগুলো তারা বাঁকিয়ে মাথা আর ল্যাজা এক জায়গায় এনে একটা প্রায় গোল আকৃতি দেয়।

মাছকে সাজিয়ে-গুছিয়ে ক্রেতার কাছে আকর্ষণীয় করার রকমসকম ও রীতিনীতি দেশকাল ভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। গোয়ালন্দের ঘাটে বাঁশের মাথায় ঝোলানো ইলিশের এই রূপ অন্য কোথাও দেখা যাবে না। যারা পূর্ব মেদিনীপুরের বাজারে কাঁকড়া বিক্রি হতে দেখেছেন, দেখে থাকবেন কাদায় মাখামাখি কাঁকড়াগুলো তারা এমন ভাবে সাজিয়ে রাখে যাতে সব থেকে বড় কাঁকড়াটা থাকে সবার উপরে, কিন্তু ক্রেতাকে তলায় কি কাঁকড়া আছে তা না জেনে না দেখে কিনতে হবে সবগুলো। অন্যদিকে যদি ব্যাঙ্ককের কিংবা কোরিয়ার সিওল কিংবা বুসানোর মাছের দোকানে যান দেখতে পাবেন, বিশাল বিশাল কাঁচের চৌবাচ্চায় বিভিন্ন ধরণের ও সাইজের জ্যান্ত মাছ, কাঁকড়া ভরে রাখা হয়েছে। ক্রেতা দেখে শুনে যেটা খুশি বেছে নিতে পারেন। তখন দোকানদার ছোট্ট একটা জাল দিয়ে সেটা তুলে এনে ওজন করে দেবে। চাইলে আপনি তাদেরকে কি ধরণের রান্না করতে হবে অর্ডার দিয়ে দিলে বিশ-পঁচিশ মিনিট পর গরম গরম রান্না করা মাছ আপনার টেবিলে এসে হাজির হবে। আমেরিকার সিয়াটেলে মাছের বাজারে কাঁকড়া কিনতে গেলে একটা নতুন দৃশ্য চোখে পড়বে। সে দেশে কাঁকড়া আধাসেদ্ধ অবস্থায় বিক্রি হয়। বরফের ভেতর ডোবানো থাকে কাঁকড়াগুলো। ক্রেতা এসে হয়তো বললেন, সাতটা কাঁকড়া চাই। অমনি একজন মুহূর্তের মধ্যে এক একটা কাঁকড়া তুলে নিয়ে বেশ জোরের সঙ্গে ছুড়ে দেবে তার থেকে পঁচিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে থাকা আর একজনের দিকে। পর পর ছোড়ার মধ্যে এক পলকেরও বেশি সময়ের ব্যবধান থাকে না। ওপাশের ব্যক্তি সেগুলো ধরে ঝপাঝপ পরিষ্কার করে এক একটা কাঁকড়া এক একটা প্যাকেটে পুরে ছুড়ে দেবে সেই একই কায়দায় আগের ব্যক্তির কাছে। সে সেগুলো একটা ছোট্ট বাক্সে পুরে ওজন করে তাতে ওজনের চিরকুটটা লাগিয়ে দিয়ে ক্রেতার হাতে তুলে দেবেন। এত দ্রুত ছোড়াছুড়ির কাজটা তারা যেভাবে করে দেখতে বেশ মজা লাগে। আমি বেশ কয়েকবার ওই বাজারে গেছি এবং একবারও দেখিনি ক্যাচ্ ফস্কাতে। ভারতীয় ক্রিকেটাররা ওখানে ট্রেনিং পেলে হয়তো ফিল্ডিংটা ভালো দিতে পারত।

মাছের দোকানে দাঁড়িয়ে থাকার মিনিট দুয়েকের মধ্যে কথামতো মোস্তাফা ভাই সেখানে হাজির। আমাদের সাদর অভ্যর্থনা করে নিয়ে এলেন তার বাড়িতে আর রাতের খাওয়াদাওয়ার ফিরিস্তির কথা না বলাই ভালো। খাওয়ার টেবিলে পরিচয় করিয়ে দিলেন ছেলে কামালের সঙ্গে। সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাবে আগামীকাল। কামাল আমার দিকে একবার তাকিয়ে 'ও আপনি ইন্ডিয়ান'— বলে মুখ ফিরিয়ে নিল। বুঝতে পারছিলাম তার চোখে মুখে একটা চাপা ক্ষোভ। আমি তবু হাসি হাসি মুখ করে জিজ্ঞেস করলাম— 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কি নিয়ে পড়বে?' 'ইতিহাস'—ছোট করে একটা উত্তর। বুঝতে পারছিলাম মোস্তাফাভাই ভীষণ অস্বস্তিতে পড়েছেন। তাকে বুঝতে না দিয়ে আমি অন্য প্রসঙ্গে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করি, ---'শুনেছি এখন বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীরা দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে কেরিয়ার বানানোর জন্য। কেউ যাচ্ছে কানাডায়, আমেরিকায়, নয়তো অস্ট্রেলিয়ায়। তোমার সেই রকম কোনো স্বপ্ন আছে কামাল?' 'দেশ'—এটা কি আমার দেশ নাকি? প্রায় ফেটে পড়ল কামাল। মোস্তাফা তাকে প্রায় জোর করেই টেনে নিয়ে গেল ঘরের ভেতর। তারপর প্রায় ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলতে শুরু করল, 'কে কি যে সব মাথায় ঢুকিয়েছে এদের। বিশ্বাস করবেন না, এই প্রজন্মের ছেলেছোকরাদের চেনা মুশকিল। এরা কেমন যেন ''রুটলেস'', দেশের মাটিতে এদের কোনো শিকড় নেই। দেশ, পরিবার কারোর জন্যেই কোনো টান নেই, কেমন যেন একবগ্গা।'

মোস্তাফার গলা জড়িয়ে আসছে, দেখলাম সে বেশ বিচলিত। আমি তাকে আশ্বস্ত করে বললাম, 'এই নিয়ে ভাববেন না। আমরা কমবেশি জানি এই প্রজন্মের একটা বৃহত্তম অংশ শুধু ভারতবিদ্বেষী নয়, কট্টর মতাবলম্বী এইসব যুবকেরা নিজের দেশকে মেনে নিতে পারে না, শ্রদ্ধা করা তো দূরের কথা। এদের মাথায় ঢোকানো হয়েছে বিদ্বেষ আর ঘৃণার বীজ, অত্যন্ত পরিকল্পিত ভাবে। তাই এদেরকে দোষ দিয়ে লাভ নেই।' দেশপ্রেমী মোস্তাফাভাই কিছুটা নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে ফের শুরু করলেন, 'কিছু মনে করবেন না, এরা যেন কেমনধারা—আমি আমার নিজের ছেলেকেও চিনতে পারি না, সত্যিকথা বলতে কি, মানতেও পারি না। আবার না মেনেই বা করি কি, নিজের ছেলেকে তো ঘর থেকে বার করে দিতে পারি না।'

এ এক দুঃসহ জ্বালা। □